KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮ সারকাস মার্কেট প্লেস, কলি- ১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 9/4 10/4 11/1 11/2	Year of Publication : Oct 1986 July - Sep 87 Feb 1988 June 1988
	Condition : Brittle / Good✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

৩৮

বিশেষ শারদীয় সংখ্যা

বিভাব

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

রহস্য ও গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাসের মিছিলে

আনন্দ-সংযোজন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শরদিন্দু অমনিবাস। ১ম খণ্ড। ৩৫·০০

শরদিন্দু অমনিবাস। ২য় খণ্ড। ৫৫·০০

সুকুমার সেনের

আছে তো হাতখানি। ১৪·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী। ১০·০০

বুদ্ধদেব গুহের

ওয়াই কিকি। ৮·০০

মনোহর মূলগাঁওকরের

শালিমার। ৭·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

বিপজ্জনক ১১। ১৬·০০

দেবল দেববর্মার

প্রেতশিলা। ১২·০০

আনন্দ বাগচী, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু,

সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেনের

পাঞ্চজন্য। ১০·০০

এ-ছাড়াও সত্যজিৎ রায়ের অজস্র বই।

বিস্তারিত পুস্তকতালিকার জন্য লিখুন।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

কবি ও বিবেকজীবী সমর সেনের স্মৃতিতে

স্মৃতি

সমর সেন

আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হ'য়ে এলাম
পার হ'য়ে এলাম,
মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর ;
স্মৃতির দিগন্তে নেমে এলো গভীর অন্ধকার,
আর এলোমেলো,
ভুলে যাওয়ার হাওয়া এলো ধূসর পথ বেয়ে :
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হ'য়ে এলাম, কত মুহূর্ত,
শ্রান্ত হয়ে এলো অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন,
তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।

An Outstanding Publication From Subarnarekha

The Truth Unites

Essays in Tribute to

SAMAR SEN

Edited by Ashok Mitra

Samar Sen is more than the powerful poet of the 1940s whose Writing has left an indelible imprint on modern Bengali poetry, more than the combative, iconoclastic editor of *Now* in the 1960s or of *Frontier* since 1968. He is also a symbol of hope in this world of shifting values—hope that personal integrity can survive and overcome social, political or economic vicissitudes. It is this spirit of Samar Sen that draws to him the varied following that is reflected in this felicitation volume.
Some of India's most reputed historians. economists, political scientists literary critics. jouralists have come together to present him this collection of essays. The themes are equally diverse : from studies of political and cultural movements to analysis of legacies of colonial education as well as the nature of creative experssion, from exploration of various facets of class struggle to different manifestations of capitalism. Many of the essays are scholarly, a few evocative.
The introductory note by the editor, Dr. Ashok Mitra, an academic and an activist, is as provocative as the man and his milieu it so perceptively sums up.
A volume of thought provoking essays on important issues relevant to the understanding of the current socio-political scene.

Contributors :

Ranajit Guha ☐ Amalendu Guha ☐ Partha Chatterjee
Sabyasachi Bhattacharya ☐ Amiya Kumar Bagchi
Sumanta Banerjee ☐ Nayan Chanda ☐ Paresh Chattopadhyay
Ranjit Sau ☐ Amit Bhaduri ☐ N. Krishnaji ☐ Nirmal K. Chandra
Lawrence Lifschultz ☐ G. P. Deshpande ☐ Malini Bhattacharya
Asok Mitra ☐ M. J. Akbar ☐ M. S. Prabhakara.

Dy 8vo Pp 16+316 Hardcover with jacket Rs. 180·00

SUBARNAREKHA
73 Mahatma Gandhi Road, Calcutta-700 009

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বিশেষ শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৪

সূচি

প্রবন্ধ

সাত কোটি - তিরিশ কোটির ইতিকথা 1 অশোক মিত্র
কবিতার অনুবাদ ও কবির উপেক্ষা 13 নিত্যপ্রিয় ঘোষ
সমর সেন : তেইশ আগস্ট স্মরণে 27 শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি 32 পিনাকী ভাদুড়ী

পুরাতনী

ক্যাবলের পত্র 38 সুকুমার রায়

ব্যক্তিগত নাট্যভাবনা

সুলতান রিজিয়া 43 কমলকুমার মজুমদার

গল্প ক্রোড়পত্র

নাচ ৩ জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য
অসংরক্ষণীয়া ২০ কল্যাণ মজুমদার
জনকরামের ত্রিশূল ৩২ কানাই কুণ্ডু
হাত ৪৫ আদিনাথ ভট্টাচার্য
তারা খসার সময় ৫৯ অশেষ চট্টোপাধ্যায়
আবহমানের ছবি ৮৬ কিন্নর রায়
তিনকড়ির মা ও বোন ৯৮ দিব্যেন্দু পালিত
পুরোহিতের হাতযড়ি ১০৭ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

দেবীপ্রসাদ মজুমদার। প্রদীপ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর

6 সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা 17

প্রচ্ছদ

শঙ্কর ঘোষ। অনুপ রায়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক 6 সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা 17 থেকে প্রকাশিত ও টেক্‌নোপ্রিন্ট, 7 সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলিকাতা 6 থেকে মুদ্রিত।

সমর সেন

১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬। অঙ্কের হিসাবে এক যুগ। মাত্র বারো বছর (পরের বিক্ষিপ্ত কয়েকটি অনুল্লেখ্য কবিতার কথা ধরছি না।) কবিতা লিখে সমর সেন বাংলা কবিতাকে আরো কয়েকযুগের ওপারে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মননের তবকে মোড়া তাঁর কবিতা লিরিকলোলুপ তৎকালীন প্রচলিত বাংলা-কবিতায় এক নির্মেদ, পরিহাসকুশল আপাত গদ্যের চকিতকবিত্ববিদ্যুৎ আরোপ করতে সক্ষম হয়েছিল।

সমর সেন কত বড় মাপের কবি ছিলেন? কবিত্বের পুনর্মূল্যায়নে তাঁকে আজ এতদিন পরে, ঠিক কোন্ অবস্থানে বসানো যাবে, তা নতুন করে দেখা বা দেখানো আমাদের অভিপ্রেত নয়। চল্লিশ বছরেরও অধিক সময় যাঁর কবিতার কলম ছিল নীরব। অনুরাগীদের কবিতা লেখার অনুরোধ যে ধরন মিতবাক মন্তব্যে তিনি সর্বদাই তুচ্ছ করতেন, আজ আমরা তা ভুলে যেতে চাই। এদেশের কবিরা একবার শুরু করলে কিছুতেই আর থামতে চান না। সমর সেন থেমেছিলেন। তবে অকালে, এটাই পরিতাপের।

কিন্তু, একটি কারণে তিনি আভূমিনত প্রণামের যোগ্য হয়ে থাকবেন। সত্তর-পরবর্তী টালমাটাল দিনগুলি যখন নির্বিচার কিশোর হত্যার অনপনেয় কলঙ্কে ডুবে-ছিল, তখন সাংবাদিক হিসাবে সমর সেনই প্রথম নির্ভীক প্রতিবাদের শিখাটি তুলে ধরেছিলেন। একদিকে কেন্দ্রের পারিবারিক রাজনীতি, অন্যদিকে কিছু রাজ্যনেতার পদলেহনপটুতা যখন তুঙ্গে, যখন পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রায় জড় পিণ্ডবৎ, তখন জ্যান্তধমনী একমাত্র সমর সেনই তাঁর অকুতোভয় লেখনীতে প্রতিনিয়ত আমাদের আয়নার সামনে দাঁড়াতে বাধ্য করতেন। এই সমকালসাহসী মানুষটির প্রতি আমাদের ঋণ তাই অপরিশোধ্য। নিঃসন্দেহে তিনি একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি ছিলেন সম্ভবত সবচেয়ে মহান বিবেকজীবী। তাঁর এই শেষের পরিচয়টি আমাদের আপ্লুত করে বেশি। বিভাবের এই কবিতাহীন শারদীয় সংখ্যাটি তাঁকেই উৎসর্গ করা হলো।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

সাত কোটি-তিরিশ কোটির ইতিকথা

অশোক মিত্র

যে-কোনো সংস্করণ 'আনন্দমঠ' পেড়ে দেখুন, ভবানন্দ স্বামী মাতৃবন্দনা করছেন, 'বন্দে মাতরম্', কিন্তু যে-জননীর বন্দনা করছেন, তিনি বঙ্গজননী। 'সপ্তকোটী-কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ করালে, / দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃত খর করবালে, / অবলা কেন মা এত বলে!' বঙ্কিমচন্দ্রের হিশেবে ভুল ছিল না, সরকারি চাকুরে ছিলেন তিনি, স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্ট ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। গোটা দেশে উনবিংশ দশকের অষ্টম-নবম শতকে বঙ্গভাষীদের সংখ্যা আনুমানিক সাত কোটি, 'বন্দে-মাতরম্' সংগীত রচনার মুহূর্তে তিনি তা পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' দেশমাতার বন্দনা, কিন্তু সেই দেশ বঙ্গদেশ।

সেই দেশ বঙ্গদেশ, কদাপি ভারতবর্ষ নয়। অবশ্য বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীতে বঙ্কিম-চন্দ্রের জাতি-সম্পর্কীয় চিন্তা বরাবরই একটু জট-পাকানো, বাঙালি জাতিসত্তা এবং ভারতবর্ষীয় জাতিসত্তা বহুক্ষেত্রে একাকার, যেমন হিন্দু সভ্যতা ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতাও তাঁর আলোচনার তেমন পৃথগীকৃত নয়। কিন্তু যেখানে স্পষ্ট লিখছেন 'সপ্তকোটী কণ্ঠ', 'দ্বিসপ্তকোটীভুজ', কোনো বিভ্রান্তিরই তো অবকাশ নেই, বাঙালিদের কথা বলছেন, বাঙলা মায়ের আরাধনা করা হচ্ছে, অতি মূর্ত আরাধনা : 'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।' 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে অন্তত, বঙ্কিমচন্দ্রের আরাধ্যা ভারতমাতা নন, নিতান্তই আমাদের একান্ত বঙ্গমাতা।

অথচ স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার পর কোনো-এক লগ্নে 'বন্দেমাতরম্'-এর মা পাল্টে গেলেন। এই শতকের গোড়ার এক-দুই দশকের নথিপত্র অনুসন্ধান ক'রে কোনো তরুণ গবেষক হয়তো অচিরে আমাদের জানাতে পারবেন, ঠিক কোন্ তারিখে কোন্ উপলক্ষ্যে 'বন্দেমাতরম্' গানের পাঠান্তর ঘটলো, 'সপ্তকোটী কণ্ঠ'-'দ্বিসপ্তকোটীভুজ' রাতারাতি 'ত্রিংশকোটী কণ্ঠ'-'দ্বিত্রিংশকোটীভুজ'তে পরিবসিত হলো। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সুর আরোপ ক'রে সরলা দেবীকে দিয়ে 'বন্দেমাতরম্' সেই যে গাইয়েছিলেন, জানতে কৌতূহল

হয় সাত কোটি কি তখনো সাত কোটিই ছিল, না ইতিমধ্যেই তা তিরিশ কোটিতে রূপান্তরিত। উপলক্ষ্যটি হয়তো ইতিহাসের গহ্বরে আরো-কিছুকাল লুকিয়েই থাকবে, কিন্তু বঙ্গজননীকে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতমাতা রূপে অভিষিক্ত করা হলো, তার অপ্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই সম্ভব। 'উদ্দেশ্য' কথাটি আমি কোনো রূঢ় অর্থে ব্যবহার করছি না, আদর্শ থেকেই উদ্দেশ্যের উদ্ভব। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বাংলাদেশে শুরু হয়ে ভারত সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত চেতনাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছে, সর্বত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তায়-ভাবনায় হঠাৎ জাতীয়তাবোধের ঘোর, জাতীয় কংগ্রেস প্রায় পুরোপুরি বাঙালিদের মুঠোয়, বাঙালি যুবক ফাঁসিকাঠে গলা বাড়াবার পূর্বক্ষণে অবিচলচিত্তে সহাস্যমুখে যে-মন্ত্র উচ্চারণ করেছে, 'বন্দেমাতরম্', তাকে ভারতীয় জাতিচেতনার প্রতিস্থ হিশেবে সর্বত্র মানিয়ে নিতে তেমন-কোনো বেগ পেতে হলো না। বাঙালির গান 'জাতীয়' সংগীত হিশেবে স্বীকৃতি পেল। বাঙালি নেতারা চরিতার্থ বোধ করলেন, যা ঘটলো তা-ও এক ধরনের সাম্রাজ্যবিস্তার, বাঙালি ভাবনা, বাঙালি আবেগের অনুগমনে ভারতীয় ভাবনা, ভারতীয় আবেগের অভিযাত্রা ঘোষিত হলো। ল্যান্সডাউন অথবা থিয়েটর রোডে সদ্য-মস্ত-বাড়ি-তোলা বাঙালি নেতাদের পক্ষে এর চেয়ে রোমাঞ্চকর আর কী হ'তে পারে?

এখন মনে হয় মস্ত ভুল করেছিলেন সেই সব নেতারা। তাঁদের কাছে যা জয়ঢাকের দুন্দুভি ব'লে মনে হয়েছিল, আসলে তা বিসর্জনের বাজনা। বাঙালির, অন্তত হিন্দু বাঙালির, জাতীয় সংগীতকে তাঁরা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ সঞ্চারের সাধনায় উপচার হিশেবে বিলিয়ে দিলেন। এই আত্মস্বার্থত্যাগের নিহিতার্থ সত্তর-আশি বছরের ব্যবধানে এখন আমাদের কাছে অতি মাত্রায় স্পষ্ট। কিছু-কিছু নেতার অবচেতনে যা ছিল বাঙালির সাম্রাজ্যবিস্তার, তা, এখন মনে হয়, বাঙালির জাতীয় আত্মসমর্পণের রূপক। আমাদের গান আপনাদের দিয়ে দিলাম, আমাদের আলাদা সত্তাও ভারতচেতনায় মিশিয়ে দিলাম আমরা, আপনারা গ্রহণ ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করুন: যদি, বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের পাঠ পরিবর্তনের এই ব্যাখ্যা পরিবেশিত হয়, সত্যের সত্যিই তেমন অপলাপ হবে না।

কেন এই কথা বলছি? বঙ্কিমচন্দ্রেই ফের ফিরে যাওয়া যাক। জাতি-ধর্ম-ভাষা-সমাজ-সম্প্রদায় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধের রচয়িতা তিনি, 'আনন্দমঠ'

উপন্যাসে যে-জাতীয় দর্শন তিনি ব্যক্ত করেছেন, তাকে উহ্য রাখলেও তাই তাঁর সামগ্রিক চিন্তার বিন্যাস সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে অসুবিধা নেই। 'বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব', 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'ভারত কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি', 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার', 'বাঙ্গালা শাসনের কল', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', 'বাঙ্গালা ভাষা': প্রত্যেকটি প্রবন্ধের ভাষার মুন্সীয়ানা মুগ্ধ করে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যকে আজ থেকে একশো বছর আগেই যে-পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তা তুলনা-রহিত। অতএব তাঁর বক্তব্যে যদি কোনো অসংলগ্নতা-স্ববিরোধিতা-শ্লথোক্তি চোখে পড়ে, ভাষাগত দৌর্বল্যকে তার জন্য দায়ী করা যাবে না, সমস্যা ভাবগত।

একটু আগে উল্লেখ করেছি, বঙ্কিমচন্দ্র জাতির সংজ্ঞানিরূপণের দায়িত্বের ধার-কাছ দিয়ে যাননি, বাঙালি জাতির কথা বলেছেন, আবার আর্য জাতির কথাও, হিন্দু জাতির কথাও প্রায় পাশাপাশি। সাঁওতাল জাতি, নাগা জাতি। মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া, গারো জাতি। বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কারেন, তালাইন প্রভৃতি জাতি। ত্রিপুরা রাজ্যে রাজবংশী, নওয়াতিয়া ইত্যাদি জাতি। বাংলার পশ্চিম দিকে খাড়িয়া, মুণ্ড, কোঁড়োয়া, ওঁরাও, বান্দর প্রভৃতি অনার্য জাতি। বঙ্কিমচন্দ্র এটাও বলেছেন, কোনো-কোনো জাতির ভিতর উপজাতি আছে, এবং প্রসঙ্গক্রমে তাদের কথাও বলা প্রয়োজন হবে, সেই ঘোষণা করেছেন, কিন্তু তেমন স্পষ্ট ক'রে তিনি নিজে অন্তত সে-সব প্রসঙ্গে প্রবেশ করেন-নি। তবে অনার্য জাতির আর্যীকরণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, যথা, যে-মুণ্ড জাতিভুক্ত, সে ঘটনাপরম্পরায় আর্য জাতিভুক্ত হ'তে পারে। কিন্তু এই দুই জাতীয় সত্তার পারস্পরিক স্তরগত সম্পর্ক বা সমস্যা নিয়ে তাঁর কোনো মন্তব্য নেই। আমাকে যা চমৎকৃত করে তা তাঁর নিম্নলিখিত ঘোষণা: 'ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য, দ্বিতীয় অনার্য হিন্দু, তৃতীয় আর্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান। চারিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকে।' পরস্পরের থেকে তারা পৃথক থাকে, তবু তারা এক জাতি, কারণ তারা বাঙালি, ভাষা ও আচরিক সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং তাঁর উক্তিতে আমরা এক নিঃশ্বাসে তিন-তিন প্রকৃতির জাতি খুঁজে পাচ্ছি: আর্য-অনার্য ইত্যাদি

রক্তের সাযুজ্যগত জাতি ; দ্বিতীয়, ধর্মীয় সূত্রে জাতি, যেমন মুসলমান ; এবং, সব শেষে, ভাষা-সংস্কৃতির বন্ধনযুক্ত জাতি; যেমন বাঙালি।

অনেক স্ববিরোধিতা-আড়ষ্টতায় জড়িয়ে পড়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এক জায়গায় বলছেন, অবশ্য সব ককেশীয় আর্য নয়, তবে সব আর্যই ককেশীয়, এবং সেই হেতুই তারা আলাদা জাতি। কিন্তু কিছু-কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁরাও এশিয়া মাইনরের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, ককেশীয়, এবং যাঁরা অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহ আবহমান কাল এড়িয়ে এসেছেন, তাঁরা কেন আর্য জাতি হিশেবে পরিগণিত হবেন না, এই প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন তিনি। অন্য মুস্কিলটি অবশ্য আরো অনেক বড়ো। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে জননীর সাত কোটি সন্তানের উল্লেখ, এই সাত কোটির মধ্যে অন্তত আড়াই কোটি, সংখ্যাতত্ত্বের হিশেবে ধরা পড়বে, মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু যে-সন্তানবিদ্রোহের মন্ত্রোচ্চারণ 'বন্দেমাতরম্,' তার লক্ষ্য মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসান্তে ইংরেজদের রাজ্য শাসনের ভার নিতে বাধ্য করানো। রন্ধ্রাশ্রিত প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপন করা যেতে পারে, হাকিম মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, ন্যায়-বিচার থেকে সজ্ঞানে তিনি পদস্খলিত হতেন না, যেহেতু বাঙালিদের চার ভাগ 'পরস্পর হইতে পৃথক থাকে', এবং অন্য তিন ভাগের লক্ষ্য চতুর্থ ভাগের দর্প খর্ব করা, তাঁর পক্ষে কি উচিত হতো না সাত কোটি থেকে আড়াই কোটি বাদ দিয়ে মাত্র সাড়ে চার কোটি কণ্ঠ এবং জোড়া-সাড়ে চার কোটি ভূজের উল্লেখে 'বন্দেমাতরম্' গানকে সংবৃত রাখা ?

কিন্তু আমার প্রধান সমস্যা অন্যত্র। বঙ্কিমচন্দ্র কোনো নিগড়ে বাঁধা পড়ছেন না, বাঙালির জাতীয়তা সম্বন্ধে যেমন তাঁর দ্বিধা নেই, ভারতীয় জাতীয়তাবোধ সম্পর্কেও নেই। কোথাও এটা বলছেন না, বাঙালি জাতি, ভারতীয় মহাজাতি। তাঁর পক্ষে বলা অসুবিধা ছিল। একটু সংকোচের সঙ্গে কথাগুলি উচ্চারণ করছি, প্রয়োজন দেখা দিয়েছে মনে হচ্ছে ব'লেই করছি। বঙ্কিমচন্দ্র, আর পাঁচজন সদ্য-ইংরেজি-শেখা ভারতবর্ষীয়দের মতো, জাতীয় চেতনার ব্যাপারে তাৎক্ষণিক জ্ঞানান্বেষণ করেছিলেন ইওরোপীয় পণ্ডিতদের রচনা পাঠ ক'রে। সাম্রাজ্যবাদের নিহিত কৌতুক এটা। বিদেশীরা এসে বুকে চেপে বসে। লুণ্ঠনে, অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। লুণ্ঠন-অত্যাচারের প্রয়োজনেই পরাভূত মানুষগুলিকে একটু-আধটু লেখাপড়া শেখায়, সেই সুযোগের সূত্র ধ'রে পরাধীন দেশের অধিবাসীরা ভিন্ দেশে কী ঘটছে-না ঘটছে তার খবর পেয়ে যায়, তাদের চেতনার মান ঊর্ধ্বমুখী হয়, আস্তে-

আস্তে তারা জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত হয়, সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। ইংরেজদের পাঠশালায়, ইংরেজদের আনা বই প'ড়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন জাতীয়তাবোধের কথা জানতে পারলো। প্রথম পর্যায়ে বিদেশী শাসকদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করার যথেষ্ট কারণ ছিল দেশের প্রজাকুলের। তাদের তখন অনেকটাই 'হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চলো সখা আমি তো পথ চিনি না'-গোছের অবস্থা। ইংরেজরা পথ চেনালেন, ইতিহাসের বিচারে খাল কেটে কুমির ডাকলেন। কিন্তু এরকম না হয়ে তো উপায় ছিল না, ইতিহাস তো তার নিয়ম-অনুযায়ী এগোবেই, প্রজ্ঞার সেই সারাৎসার বর্তমান শতকের এক বাঙালি কবির স্বভাবসূচক সংক্ষিপ্ত ঘোষণায় বিধৃত : 'কলোনীর দুর্বিপাকে ক্লীবের বিলাপ ; ইতিহাস ক্ষমাহীন, ক্রন্দনে কী লাভ।'

আমরা এগিয়ে এসেছি খানিকটা, বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে প্রত্যাবর্তন করতে হয় আরেকবার। জাতীয় চেতনা নিয়ে আলোড়ন-আলোচনার সমারোহ, বিলেত থেকে টাটকা বই আসছে প্রতিদিন। প্রশাসকরা অবসরমুহূর্তে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত-বিন্যস্ত বিভিন্ন ভাষাভাষী-সম্প্রদায়ভুক্ত-সংস্কৃতিধারক অধিবাসীদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য লিপিবদ্ধ করছেন। সে-সব প'ড়ে ভারতবর্ষের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় নিজেদের দেশ সম্পর্কে বহুবিধ জ্ঞান আহরণ করছেন। বলতে গেলে এই প্রথম দেশের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে তাঁদের। এবং এই পরিচয় থেকেই জাত্য-ভিমানের উন্মেষ-উদ্ভব। কী সেই জাতীয় চেতনা ? ভারতীয় জাতীয়তার সংজ্ঞা কী, সীমানা কী ? কোন্ সংস্থানে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের মানুষ তাঁদের আত্মাভিমান ব্যক্ত করবেন ?

হাতের কাছেই উত্তর ছিল। এক হিশেবে ইংরেজরাই পাইয়ে দিলেন : ভারত সাম্রাজ্য যতদূর পর্যন্ত প্রসারিত, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের সীমানাও ততদূর পর্যন্ত। কারা-কারা ভারতীয় ? ইংরেজ-শাসিত ভারত সাম্রাজ্যের যারা-যারা অধীভূত, তারাই ভারতীয়, তাদের মানসমণ্ডল জুড়েই ভারতীয় চেতনার প্রব্রজ্যা। ইংরেজরা ক্রমে-ক্রমে এই সাম্রাজ্য থেকে শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশ খসিয়ে দিলেন, পরে পাকিস্তান নাম দিয়ে আলাদা এক রাষ্ট্র গ'ড়ে তাকেও ভারতবর্ষ থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে দিলেন। ভারতবর্ষীয়রা সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহাই সংজ্ঞা হিশেবে বিনম্র মস্তকে গ্রহণ করে। ভারতীয় চেতনা অতএব ভারত সাম্রাজ্যসীমা-আশ্রিত চেতনা, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ ইংরেজদের থেকে পাওয়া, আমাদের গত

একশো-দেড়শো বছরের ভ্রান্তি-উৎকণ্ঠা-অপমান-আনন্দ-উল্লাস-উপলব্ধি-চরিতার্থতা আশাভঙ্গ সব-কিছুই সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে ধার করা ভাবনাচিন্তা অবলম্বন ক'রে।

কিন্তু ধার করতে গিয়েই মস্ত ভুল ক'রে ফেললেন আমাদের পূর্বসূরীরা। জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্ন তাঁদের চোখের অঞ্জন ছেয়ে। সেই রাষ্ট্রের হুবহু আদল তাঁরা খুঁজে পেলেন ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে, অনেকটা সেই বাংলা ছড়ার 'যার বড়ি যত উঁচু, তার বরের নাক তত উঁচু'-র মতো মানসিকতার শিকার হয়ে। জাতীয় সত্তা সম্পর্কে শিথিল ধ্যানধারণা : বাঙালি জাতি, ভারতবর্ষীয় জাতি, হিন্দু জাতি, আর্য জাতি, রাজবংশী জাতি, ভাসা-ভাসা শব্দ প্রয়োগ, যা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্তিত। ভারতীয় পণ্ডিতজনরা নিজেরাই স্পষ্ট জানেন না কী বলতে চাইছেন, ইংরেজদের বই প'ড়ে আহৃত জ্ঞানের তাঁরা ফলিত প্রয়োগ ঘটাতে চাইছেন, কিন্তু এলেবেলে হয়ে যাচ্ছে সব-কিছু, শেষ পর্যন্ত তাই সাম্রাজ্যের পরিধিকেই জাতির সীমানা-সংজ্ঞা হিশেবে মেনে নিলেন। অথচ, একটু ধৈর্য ধ'রে যদি থাকতেন মাত্র কয়েকটি দশক, সদ্য-শেখা চিন্তাগুলিকে যদি থিতু হ'তে দিতেন একটু, ইওরোপীয় ইতিহাস থেকেই অন্যতর শিক্ষা আহরণ করা তাঁদের পক্ষে মোটেই মুস্কিল ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বহু জায়গায় ইওরোপীয় সভ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন করেছেন ভারতীয় সভ্যতার। কিন্তু ইওরোপীয় সভ্যতা বহুজাতিক সভ্যতা। ইওরোপ একটি জাতি নয়, বড়ো জোর বলা চলে মহাজাতি, অনেকগুলির জাতীয় চেতনার উপনদী মিলে ইওরোপীয় চেতনা, অনেকগুলি সংস্কৃতির সংশ্লেষণ ইওরোপীয় সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষা, যে-ভাষাগুলির হয়তো একটি-দু'টি মূল উৎস, কিন্তু ভাষা হিশেবে তাদের আলাদা সত্তা উপেক্ষা করা অসম্ভব। যেমন উপেক্ষা করা অসম্ভব সে-সব ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু-বিচিত্র জাতীয় চেতনা-সত্তাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি ক'রেই বলছি, ইংরেজরা জাতি, ভাষাভিত্তিক জাতি, তাদের জাতিভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্রকে জড়িয়ে তাদের জাতীয় চেতনাবোধ। ইওরোপীয়রাও হয়তো এক অর্থে জাতি—মহা জাতি—কয়েকটি সার্বিক গুণসম্পন্ন সংস্কৃতির ধারক হিশেবে তাদের পৃথক ক'রে চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু ইওরোপ নামে কোনো আলাদা অখণ্ড রাষ্ট্র নেই, ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই ছিল না ; শার্লমান নাপলিয়ঁ একটির-পর-একটি রাজ্য জয় ক'রে প্রায় গোটা মহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে

সফল হয়েছিলেন, তবু সংযুক্ত একটি রাষ্ট্র স্থাপনের কথা কখনও ভাবেননি। ভাবেননি কারণ তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হতো। বিভিন্ন-বিচিত্র সংস্কার-আচার-কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিকে একটি অর্গলরুদ্ধ বৃত্তের শৃঙ্খলায় ফেলে হঠাৎ কোনো বহুজাতিক রাষ্ট্রগঠন ইতিহাসের স্বচ্ছন্দ নিয়মকলার মধ্যে পড়ে না। ইওরোপীয় ঐতিহ্যের বাস্তবতা সর্বস্বীকৃত, ইওরোপীয় চেতনার উল্লেখেও আমরা একটি বিশেষ প্রবাহকে অনায়াসে চিনে নিতে পারি। যেমন পারি ইওরোপীয় চিত্র-কলা-ইওরোপীয় ভাস্কর্য-ইওরোপীয় সংগীতকে। কিন্তু তা হ'লেও কোনো মহারথীই আজ পর্যন্ত সংযুক্ত, সামগ্রিক সার্বভৌমত্ব-কেন্দ্রবিন্দুতে-স্থিত, বহুজাতিক কোনো ইওরোপীয় রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। ইতিহাসের অতি-সাম্প্রতিক অধ্যায়ে একমাত্র সোভিয়েট ও চীন প্রজাতন্ত্রে এধরনের বহুভাষিক-বহুজাতিক রাষ্ট্র পরীক্ষা-উত্তীর্ণ, কিন্তু এই দুই দেশের সফল পরীক্ষার পটভূমিকায় যে-পরম ধৈর্যশীল কিছু-কিছু অঙ্গীকার উদ্‌যাপনের কাহিনী, তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে আপাতত অকল্পনীয়। ইওরোপে বেলজিয়াম, উত্তর আমেরিকা মহাদেশে কানাডা, মাত্র দুই জাতি-সংবলিত রাষ্ট্র সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। পশ্চিম ইওরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সময় থেকেই এক সম্মিলিত বহুজাতিক রাষ্ট্র স্থাপন নিয়ে জল্পনা-আলোচনা চলছে—সমাজতন্ত্রের বিজয়াভিযানজনিত আতঙ্ক এ-সমস্ত জল্পনার নিশ্চয়ই অন্যতম কারণ—, কিন্তু কথার উপর কেবলই কথা বুনে চলা হচ্ছে, নিজেদের আলাদা সত্তা বিসর্জন দিয়ে ঠিক কোনো ইওরোপীয় জাতিই বহুজাতিক রাষ্ট্রের গর্ভে নিজেকে মিলিয়ে দিতে প্রস্তুত নয়, অন্তত এখন পর্যন্ত নয়।

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষের কী অবস্থা ছিল ভাবুন। চার হাজার-পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় ঐতিহ্যের অবশ্য দোহাই পাড়া হতো দেশের সর্বত্র। এমনকি দাক্ষিণাত্যেও, ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রবহমান ধারা অব্যাহত ছিল, বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ জড়ানো সেই সংস্কৃতি, যার সঙ্গে আপ্লুত ভারতীয় সংগীত-স্থাপত্য-চিত্রকলা, পাশাপাশি একটি বিশেষ ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় দর্শন। কতটা নিকষ ভারতীয়-কতটা নিকষ হিন্দু এই ভারতীয় সংস্কৃতি, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক সম্ভব, কারণ অধিকাংশ আলোচনাতেই মুসলমান যুগোদ্ভূত সৃষ্টি-কর্ম-চিন্তা-ঘটনাবলী ফিরিস্তি থেকে বাদ দেওয়া হতো। তা হ'লেও ইওরোপীয় সভ্যতা যেমন আলাদা ক'রে বর্ণনা করা যায়, ভারতীয় সভ্যতা-ভারতীয় সংস্কৃতিও তেমনি মোটা দাগে চিহ্নিত করতে অসুবিধা ছিল না। তবে ইওরোপীয় ঐতিহ্যকে

স্পষ্ট চেনা যাওয়া সত্ত্বেও ইওরোপীয় রাষ্ট্র অবাস্তব প্রস্তাব ব'লে বরাবর বিবেচিত। অন্য পক্ষে, ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতীপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, যা ইওরোপে অকল্পনীয়, ভারতবর্ষে তা-ই নাকি অতি বাস্তব, বহুভাষাসংস্কৃতিভিত্তিক সাম্রাজ্য যদি হ'তে পারে, অনুরূপ বহুজাতিভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনও নাকি তা হ'লে সম্ভব।

ঘরোয়া কথাবার্তায় আমরা একটি কথা প্রায়ই ব্যবহার করি: 'গুলিয়ে ফেলা'। সন্দেহ হয়, আমাদের চিন্তানায়কেরা জাতিবিচার ব্যাপারটিকে ভীষণরকম গুলিয়ে ফেলেছিলেন। আমি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে কিছু উদাহরণ দাখিল করেছি; বিশ্বাস, সংস্কার, কিংবদন্তী, স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রমের পারম্পরিক দূরত্ব ঘুচে গেছে, ইংরেজদের আমদানি করা বই প'ড়ে জাতীয়তা প্রসঙ্গের সঙ্গে পরিচয়, স্বদেশী পণ্ডিতজন ও পণ্ডিতমন্যরা নতুন-পাওয়া ধ্যানধারণা তাঁদের অভিজ্ঞতার দর্শনে মুকুরিত কোনো প্রতিভাসের উপর আরোপ করতে উৎসুক। সাহেবরা আমাদের জুড়ে দিয়েছে, এই জোড়া অবস্থাই জাতীয়তাবোধ; সাহেবরা জোর করে জুড়ে নিয়ে যে-সমগ্র ভূখণ্ড গঠন করেছে, তা ভারত সাম্রাজ্য; বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে কী হবে, ভারত সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ সমান্তরাল রূপকল্প আমাদের জাতীয় চেতনা, ভারতীয় চেতনা; তা ছাড়া, সত্যিই তো, ভারতীয় সভ্যতা ব'লে বস্তুটি তো সেই কবে থেকেই আছে, সুতরাং তর্ক-জিজ্ঞাসা বাড়িয়ে দরকার নেই, 'বন্দেমাতরম্' ব'লে ঝুলে পড়া যাক, 'ভগবতী ভারতী' কিংবা 'ভারতলক্ষ্মী' ইত্যাদি শব্দের পুনঃপৌনিক উচ্চারণই আমাদের জাতীয় সত্তায় উত্তীর্ণ করবে।

অথচ, উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষের কী অবস্থা ছিল একবার ভাবুন। মধ্যযুগ থেকে তেমন-কিছু আমূল পরিবর্তন তো সংঘটিত হয়নি। বেশির ভাগ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দু'দশ ক্রোশের সীমারেখা অতিক্রম ক'রে যেত না, গোশকট, কিংবা নদীবাহী জলযান, যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন, বাধ্য হয়েই তাই সাধারণ গৃহস্থের দিনযাপনের পৃথিবী সংকীর্ণ দিগন্তে নিয়ন্ত্রিত; সামান্য নদী পেরিয়ে ভিন্‌দেশ থেকে গৃহবধূ আনতে হ'লেও অনুমতির জন্য গ্রামসভা আহ্বান করতে হতো। মাঝে-মাঝে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়তেন গ্রামবাসীরা। দু'তিন বছর সময় ব্যয় ক'রে, বহু ক্লেশকৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-প্রয়াগ ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণ সাঙ্গ ক'রে ফিরতেন। কিন্তু তাঁরা ক'জন, ইংল্যাণ্ডের মানুষও তো সেই মধ্যযুগে কখনো-সখনো বেরিয়ে প'ড়ে জেরুজালেম পর্যন্ত তীর্থ সেরে আসতেন। ভারতবর্ষের এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে আরেক অঞ্চলের মানুষের

সাক্ষাৎপরিচয়-আদানপ্রদান ছিল ক্বচিৎ-কদাচিৎ ঘটনা। যে-মানুষগুলির ভাষা আমাদের বোধের অগম্য, যাদের পরিচ্ছদ আমাদের থেকে ভিন্ন, যাদের আহার্য আমরা ঠিক মুখে দিতে পারি না, যে-মানুষগুলি আমাদের থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থিত, তারাও রামায়ণ-মহাভারত থেকে প্রেরণা-আনন্দ পায়, যেমন আমরা পাই, বেদ-উপনিষদ থেকে জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন আমরা করি, তাদের সংগীতে-ভাস্কর্যেও আমাদের ললিতকলার স্বাক্ষর, স্রেফ সেই কারণে, তাদের সঙ্গে আমরা অচ্ছেদ্য জাতীয়তাসূত্রে গ্রন্থিত, এই দাবি আতিশয্যদোষে দুষ্ট না হয়েই পারে না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাস্কন্ধ, সংগ্রামের-সংঘাতের-সহমর্মিতার অবগাহনে শুচিস্নাত, যে-জাতীয়তাবোধ, একান্ত ভাষাভিত্তিক যে-জাতিচেতনা, সাংস্কৃতিক-আচরিকসৌষম্য-নন্দিত যে-জাতিচেতনা, যার ধারক, তুলনাগতভাবে তা উপেক্ষিত রইলো, আমাদের পূর্বসূরীরা তড়িঘড়ি ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অভিসারে বেরিয়ে পড়লেন। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে 'সপ্ত কোটী' কেটে 'ত্রিংশ কোটী' বসানো হলো, 'দ্বিসপ্ত কোটী' কেটে 'দ্বিত্রিংশ কোটী'।

যা হলো তা খোদার উপর খোদকারি। যে-জাতীয় চেতনার অঙ্গীকার উনবিংশ শতকের পণ্ডিত মানুষেরা নিজেদের উপর চাপালেন, তা না বিজ্ঞানসম্মত, না ইতিহাসসম্মত। ইওরোপীয়রা বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে রাজি হননি, প্রতিবারই তাঁরা পিছিয়ে গেছেন, বহুভাষী-বহুজাতিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। কিন্তু যেহেতু ইংরেজদের কীর্তিমাহাত্ম্যে ভারতীয় উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তরা উনবিংশ শতকের মধ্যবয়সে মুগ্ধ, তাঁরা বহুজাতিক রাষ্ট্রের প্রস্তাব অবলীলায় মেনে নিলেন: ইংরেজরা যদি বহুজাতিক ব্যবস্থাকে প্রশাসনের নিগড়ে বাঁধতে পারে, আমরা, ভারতীয়রা, নিজেরাই বা তা হ'লে পারবো না কেন, অনেকটা এ-ধরনের যুক্তি। এই যুক্তির গোড়ায় গলদ: ইংরেজরা ডাণ্ডা মেরে প্রশাসন চালাতো, জাতীয়তাবাদীরা যে-শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষের প্রতিমা কল্পনা করলেন, সেই ভারতবর্ষ তো পরাধীনতার শৃংঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষ, যেখানে তো জোর খাটানো যাবে না কারো উপর, ডাণ্ডা ঘুরিয়ে টুঁটি চেপে ধ'রে তো কোনো নাগরিককে বাধ্যতামূলক জাতীয়তাবোধের ভদ্‌গত উপাসনায় নিযুক্ত করা যাবে না।

একশো বছর আগে আমাদের গুরুজনরা যে-মারাত্মক ভুল করেছিলেন, তার খেসারৎ দিতে হচ্ছে এখন আমাদের। সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, এই অনুজ্ঞা মেনে নিয়ে আমরা, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি মুহূর্তে, ভারত-

চেতনার চরণমূলে আমাদের সর্বস্বার্থ বিসর্জন দিয়েছি, যে-জাতীয়তাবোধ আমাদের পরিচিত অভ্যাসের মতো, তাকে অহরহ শাসন ক'রে আমদানি করা গ্রন্থ থেকে আহৃত অন্য-এক জাতীয়তাবোধকে বরণ ক'রে নিয়েছি। অস্বীকার করবার উপায় নেই, এই ভূখণ্ডের প্রত্যেকটি নাগরিকের দুই আলাদা সত্তা : ভারতীয় সত্তা, সেই সঙ্গে, পাশাপাশি, তামিল অথবা মালয়ালী অথবা তেলুগু অথবা গুজরাটি অথবা মারাঠি অথবা পাঞ্জাবি অথবা রাজস্থানী অথবা মহাকোশলী অথবা উড়িয়া অথবা বাঙালি অথবা অসমীয় সত্তা, কিন্তু প্রথম সত্তাটি প্রতি মুহূর্তে বন্দিত-অভ্যর্থিত হয়েছে, দ্বিতীয় সত্তা দুয়োরাণী, দুঃখই তার আবরণ, অবহেলা তার আভরণ। বঙ্গজননীকে উদ্দিষ্ট সংগীত আমরা ঠিকানা কেটে ভারতমাতার মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছি, ভারতবন্দনা করতে-করতে আমাদের বীর বন্দীরা আন্দামানে বছরের-পর-বছর কালাতিপাত করেছেন, শহীদরা ভারতলক্ষ্মীর শুভ স্তব করতে-করতে যূপকাষ্ঠের উদ্বন্ধনে আত্মোৎসর্গ করেছেন। এই একপেশে আরাধনাব্যবস্থায় ঘোরতর গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে। একমাত্র জাতীয় সমস্যার সমাধানের প্রয়াসে নিমগ্ন থাকো, ক্ষুদ্র গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ করো না, স্থানীয় সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার মতো মানসিক সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখো, অন্যথা তুমি তোমার অঙ্গীকার থেকে ব্রাত্য হবে : অঘোষিত, অলিখিত, অথচ অলঙ্ঘনীয় এ-ধরনের অনুশাসনের বেড়াজালে দশকের-পর-দশক ধ'রে দিন কাটছে কি কাটছে না আমাদের। ফল যা দাঁড়িয়েছে তা এখন সর্বসমক্ষে গোচরমান। দিল্লিই সব-কিছু, দিল্লির সরকারই সব-কিছু। আমরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সরকার গঠন করবো, কিন্তু দিল্লির পছন্দ না হ'লে সেই সরকার ভেঙে দেওয়া হবে। আমরা আমাদের মতো ক'রে ভূমিসংস্কার পর্যন্ত করতে পারবো না, জাতীয় সরকার নির্দেশ দেবেন কোন্ ধরনের ভূমিসংস্কার বিশুদ্ধ, অন্য-কোন্ ধরনের অগ্রহণীয়; সমগ্র অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত, এমনকি আমরা টাকা জমা রাখি যে-ব্যাংকে, সেই টাকা সেই ব্যাংক কীভাবে ব্যবহার করবে তা পর্যন্ত নিরূপণ করবে জাতীয় সরকার। আমাদের সন্তানেরা কোন্ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করবে, আমাদের রেডিও-টেলিভিশনে কী সংগীতচর্চা-নৃত্যকলা-অভিনয় হবে সমস্ত নির্ণীত হবে দিল্লিতে, যেখানে জাতীয় সরকার সংস্থিত। আজ থেকে একশো বছর আগে তখনো-পর্যন্ত-অবাস্তব যে-জাতীয়তাবোধের কাছে নিজেদের সমর্পণ ক'রে দিয়েছিলেন আমাদের পূর্বসূরীরা, তার বেসামাল প্রবাহ অনু-

সরণ ক'রে এই জাতীয় সরকারের আত্মপ্রকাশ, সুতরাং কোন্ ঠাঁইতে আমরা নালিশ জানাতে যাবো ?

অথচ, আশ্চর্য হয়, দু'দিকেই ক্ষতি হচ্ছে। প্রাণী-তথা-প্রকৃতি জগতে এটা হামেশাই ঘটে, যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তা-ও সইয়ে-সইয়ে, একটু-একটু ক'রে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিশোধন-পরিমার্জন ক'রে নিয়ে, পরিবেশের সঙ্গে ধাতস্থ করা হয়, কোনো নতুন প্রাণী অথবা উদ্ভিদের জন্ম হয়, সেই জন্মবৃত্তান্ত অতঃপর স্বতঃসিদ্ধতা। কিন্তু তাৎক্ষণিক চিন্তাপ্রসূত, এবং প্রধানত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত, ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা প্রথম থেকেই অসহিষ্ণুতার জাতক ; ১৯৪৯ সালে রচিত সংবিধান, এবং সেই সংবিধান যে-পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় গত সাঁইতিরিশ বছর ধ'রে প্রয়োগ করা হয়েছে, উভয়-ই উক্ত অসহিষ্ণুতার পরিচয় বহন করছে। সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তথা সম্পদ্ যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত, সেই সরকারের বিহারে-ব্যবহারে এক গর্বিত স্বৈরাচারের আভাস। এই স্বৈরাচার থেকে অন্য উপসর্গের আশঙ্কা আদৌ অমূলক নয় : যে-একনায়কত্ব নিছক বিদূষকমণ্ডলীর চাটুকারিতার নির্ভরে আশ্রিত, তা ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য।

তা ছাড়া, চাটুকারিতাও তো অতিভক্তি থেকে সঞ্জাত। জাতীয়তাবোধের আরাধনায় আমরা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারিনি। ভারতমাতা সমস্ত উপচার-মনোযোগ শুষে নিয়েছেন, পাড়ার দেবতারা কল্কে পাননি। কিন্তু ভারতমাতা তো বৈদেহী ব্যাপার, কোনো-এক পর্যায়ে ভক্তির বিভিন্ন উপচার অর্ঘ্য ঈষৎ দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে ভারতমাতার রক্তমাংসের প্রতিভূদের পদতলে নিবেদিত হবার অধ্যায় শুরু হয়েছে, নেতৃবৃন্দ কালক্রমে ঈশ্বরের আসনে পূজিত হ'তে অভ্যস্ত হয়েছেন, চাটুকারদের স্তুতি তাঁদের কাছে এখন পরম গ্রহণীয় স্বাভাবিক ব্যাপার ব'লে বিবেচিত : স্তুতি শ্রবণে তাঁদের ঈশ্বরদত্ত, জন্মগত অধিকার, সুতরাং, এটা আর এমন কী বেশি কথা, ভ্রষ্টাচারবৃত্তিতেও তাঁদের ঈশ্বরদত্ত অধিকার।

স্বভাবপ্রতিভায় জীয়ন্ত যে-জাতীয় চেতনা, ভাষাভিত্তিক, সমসংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবোধ, সেই সঙ্গে তা ধূল্যবলুণ্ঠিত। যা বিকশিত হবার, তা বিকশিত হ'তে পারছে না। যে-অধিকার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সমগোত্রীয়, নিজেদের ভাষায় বাধাহীন পেখম মেলবার অধিকার, তা পর্যন্ত খর্বিত। নির্দেশের জটিলতা, নিষেধের অযুত ব্যাকরণ। সম্ভবত প্রগাঢ় ইংরেজপ্রেমিক ব'লেই, আমরা একটু বেশি নিয়মতান্ত্রিক, ভয়ংকর ক্ষেপে না-গেলে অনুশাসনের গণ্ডির বাইরে যেতে, এখনো

পর্যন্ত, আমরা অনিচ্ছুক। কিন্তু এই প্রান্তে আমরা তৈরি নই ব'লে ইতিহাস তো আর ঠেকে থাকবে না। অন্যান্য অনেক অঞ্চলে যারা বিক্ষুব্ধ, অশান্ত, আমাদের মতো ভদ্রলোকজনিত আচরণে তাদের সায় নেই, তারা কালবৈশাখী ঝড়ের প্রসঙ্গ শুধু ভাবছে না, সেই ঝড়কে রূপ দিচ্ছে। ইতিহাসের প্রবহমানতা এটা, ঘাতের পিঠে প্রতিঘাত। ভারতবর্ষে আগামী কয়েক বছর অতএব উথালপাথাল অবস্থা যাবে।

কর্মফল ভোগ এড়ানো যায় না, কী কুক্ষণে কোন্ উৎসাহী বাঙালি 'বন্দে-মাতরম্' গানে আদি শব্দ কেটে নতুন শব্দ সংযোজন করেছিলেন, সেই অবিমৃষ্য-কারিতার পরিণাম আমাদের খণ্ডিত ললাটলিখন।

কবিতার অনুবাদ এবং কবির উপেক্ষা

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

মুদ্রণবিদ্যা শেখার জন্য সুকুমার রায় যখন ইংল্যাণ্ডে যান, লণ্ডনে মুদ্রণবিদ্যা অধ্যয়ন ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করাও ছিল তাঁর কাজের অঙ্গ। ১৯১২-১৩ সালে এই বিদেশবাসের সময় লণ্ডনের *Quest* পত্রিকায়, তিনি একটি রচনাও প্রকাশ করেন : **The Spirit of Rabindranath Tagore**। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজদের পরিচিত করার চাইতেও, তাঁর বড়ো উদ্দেশ্য ছিল, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পটভূমির সঙ্গে বিদেশীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

এই রচনাটি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ার কথা, কারণ রবীন্দ্রনাথও তখন লণ্ডনে। রচনাটির বৈশিষ্ট্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীয় রচনার অনুবাদ করছিলেন। 'কোয়েস্ট' পত্রিকায় সুকুমার রায়ের রচনাটি প্রকাশের আগে ***Gitanjali : Song Offerings*** বেরিয়ে গেছে। এই অনুবাদ গ্রন্থের দুটি কবিতা সুকুমার ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রবন্ধে। একটি, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' ; অপরটি 'মরণ যেদিন দিনের শেষে'। সুকুমার নিজে অনুবাদ করেছিলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি', প্রভাতসঙ্গীত থেকে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', উৎসর্গ থেকে 'সুদূর' আর 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে' এছাড়া, একটি কবিতাংশ, 'হৃদয় অরণ্য'।

১৯১৩ সালে লণ্ডনে বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থের জন্য কবিতা সংকলন করছিলেন। এপ্রিল মাসে ইয়েটসকে *The Gardener*-এর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন তিনি। এর একটি কবিতা, 'সুদূর'। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সুকুমার রায়ের অনুবাদটি নেন নি, স্বয়ং আবার অনুবাদ করেছেন। এই দুটি অনুবাদ পাশাপাশি লক্ষ্য করার মতো। সুকুমারের অনুবাদটি এই :

I am restless,
I am athirst for the Great Beyond.
Sitting at my window,

I listen for its tread upon the air, as the day wears on.
My life goes out in longing
For the thrill of its touch.
I am athirst for the Great Beyond.
O Beyond ! Vast Beyond !
How passionate comes thy clarion call.
I forget, alas ! that my hapless self,
Is self confined, with no wings to fly.
I am eager, wistful,
O Beyond, I am a stranger here.
Like hopeless hope never attained
Comes the whisper of thy unceasing call.
In thy message my listening heart
Has found its own, its inmost tongue,
O Beyond, I am a stranger here
O Beyond ! Vast Beyond !
How passionate comes thy clarion call.
I forget alas ! that my hapless self
Has no winged horse on a path unknown
I am distraught,
O Beyond, I am forlorn,
In the languid sunlit hours
In the murmur of leaves, in the dancing shadows,
What vision unfolds before my eyes
Of thee— in the wide blue sky ?
O Beyond ! Vast Beyond !
How passionate comes thy clarion call
I forget, alas ! that my hapless self
Lives in a house whose gates are closed.

রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির অনুবাদ করলেন :

I am restless. I am athirst for far-away things.
My soul goes out in a longing to touch the skirt of the dim distance.
O Great Beyond, O the keen call of thy flute !
I forget, I ever forget, that I have no wings to fly, that I am bound in this spot evermore.

I am eager and wakeful, I am a stranger in a strange land.
Thy breath comes to me whispering an impossible hope.
Thy tongue is known to my heart as its very own.
O far-to-seek, O the keen call of thy flute !
I forget, I ever forget, that I know not the way, that I have not the winged horse.

I am listless. I am a wanderer in my heart.
In the sunny haze of the languid hours, what vast vision of thine takes shape in the blue of the sky !
O farthest end, O the keen call of thy flute !
I forget, I ever forget, that the
gates are shut everywhere in the house where
I dwell alone.

কবিতাটি উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। তবে সুকুমার বা রবীন্দ্রনাথ যখন অনুবাদ করেন তখনও উৎসর্গ প্রকাশিত হয় নি। সেটা ছিল মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে, যেটার প্রকাশ হয় ১৯০৩ সালে। এই কবিতাটি ছিল বিশ্ব বিভাগের প্রবেশক কবিতা রূপে। এই কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনার সময়ই এই বিভাগের প্রবেশক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি লেখেন।

কবিতাটি এই :

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো, প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী।
আমি সুদূরের পিয়াসি।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাসরি।
আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো
কী কথা আমায় শুনাও সতত।
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী।
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর। তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ
সে কথা যে যাই পাসরি।
আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরুমর্মরে, ছায়ার খেলায়,
কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী
শয়নে উঠে গো আভাসি।
হে সুদূর, আমি উদাসী।

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাসরি।

সুকুমারের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। সুকুমার ১৯ জুন ১৯১২ লণ্ডনের উইলিয়াম পীয়ারসনের বাড়িতে, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে, সুদূর, পরশ-পাথর, সন্ধ্যা, কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ, ইত্যাদি অনুবাদ পড়েছিলেন (রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড)। এই কবিতাপাঠের আসরে Wisdom of the East-এর সম্পাদক Cranmer Byng (ক্র্যানমার বীঙ) বলেছিলেন সুকুমারকে যে তিনি এই অনুবাদ ছাপবেন।

পরের দিন অজিতকুমার চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন, লক্ষ্য করার বিষয়, সুকুমার রায়ের অনুবাদের কথার উল্লেখ করেন নি। তিনি অজিতকুমারের প্রশংসা শুনেছেন এবং ইয়েটস অজিতকুমারের অনুবাদ পছন্দ করবেন বলে রথেন-স্টাইন ভাবছেন, এই কথা অজিতকুমারকে জানাচ্ছেন। বীঙ যে সুকুমারের অনুবাদও পছন্দ করেছেন, সে কথা বললেন না, বরং জানালেন, বীঙ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহযোগিতায় স্বয়ং নিজেই অনুবাদ করতে চান।

এই চিঠি লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার নিজের অনুবাদ রথেন-স্টাইনকে দিয়েছেন, রথেনস্টাইন সেগুলো পাঠিয়েছেন ব্র্যাডলে, ব্রুক আর ইয়েটসকে। তাঁদের মতামত, এই ২০ জুন ১৯১২ তারিখে অজ্ঞাত। যখন পাওয়া যাবে, ৭ জুলাই ১৯১২, রথেনস্টাইনের বাড়িতে ঘরোয়া বৈঠকে রবীন্দ্র-নাথের স্বরচিত অনুবাদ পাঠের পর, তখন অজিতকুমার, সুকুমার, বা রোবি দত্ত, আনন্দ কুমারস্বামী, লোকেন পালিতদের অনুবাদের আর প্রয়োজন হবে না। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন অজিতকুমার এবং সেই অনুবাদের খাতা রথেনস্টাইনকে পাঠিয়েছিলেন। রথেনস্টাইনও তাঁর *Men and Memories*-এ এই কবিতার খাতার প্রাপ্তি স্বীকার করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন অজিতকুমারকে জানাচ্ছেন, তাঁর নিজের অনুবাদ ইয়েটস ইত্যাদি কবি-সমালোচকেরা অত্যন্ত প্রশংসা করছেন, তখন অজিতকুমার উল্লসিত হচ্ছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, তিনি স্বয়ং অনুবাদ করবেন জানলে এই কাজে কখনো হাত দিতেনই না।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে রথেনস্টাইনকে জানিয়েছিলেন, অনুবাদে কাব্যিকতা বা অন্ত্যমিল তাঁর পছন্দ নয়। মডার্ন রিভিউতে বা দি নেশনে, অজিতকুমারের যে অনুবাদ দেখা যায় (প্রথমটিতে, আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে) তাতে এই কাব্যিকতার ছোঁয়াচ এবং অন্ত্যমিল আছে। লোকেন পালিতের কবিতা-অনুবাদেও (মডার্ন রিভিউ-এ, নিষ্ফল কামনা, তারকার আত্মহত্যা কবিতার) অন্ত্যমিল আছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কবিতার অনুবাদ গ্রন্থগুলো একটার পর একটা প্রকাশ করতে থাকেন ১৯১২ থেকে, তখন অন্যের করা কোনো অনুবাদ নেন নি। গল্পের অনুবাদ যখন সংকলিত হচ্ছে, তখন অন্যের করা অনুবাদগুলো তিনি ব্যবহার করেছিলেন যদিও সংশোধন করে অথবা ম্যাকমিলানের রীডারের সংশোধনে। কিন্তু কবিতার মতো গল্পের অনুবাদে তিনি বেশি উৎসাহ বোধ করেননি। তাঁর তৃতীয় অনুবাদগ্রন্থ *The Crescent Moon*-এ অজিতকুমার-কুমারস্বামীর অনূদিত 'খোকা মাকে শুধায় ডেকে' আর 'তবে আমি যাই গো তবে যাই', রবীন্দ্রনাথ নূতন করে অনুবাদ করেন। পঞ্চম গ্রন্থে, *Lover's Gift and Crossing*-এ, নিয়েছিলেন লোকেন পালিতের করা 'বৃথা এ ক্রন্দন', তবে তাঁর নিজের অনুবাদ, কিন্তু তারকার আত্মহত্যা লোকেন পালিতের অনুবাদে নেন নি, নিজেও করেন নি। এই পঞ্চম গ্রন্থে নিয়েছিলেন অজিতকুমারের অনূদিত কবিতাটি, সব পেয়েছির দেশে, তবে তাঁর নিজের অনুবাদ। অজিতকুমারের অনুবাদটি *The Nation*-এ বেরিয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেনও, সবাই প্রশংসা করছেন।

মডার্ন রিভিউতে আর-একটি কবিতা বেরিয়েছিল, সমুদ্রের প্রতি। অনুবাদ করেছিলেন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, ফেব্রুয়ারি ১৯১২ সংখ্যায়। এটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো অনুবাদ গ্রন্থে স্থানও দেন নি, নতুন করে লেখেনও নি। ওই একই সংখ্যায় সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় সুদূর-এর অনুবাদও করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে পরে আসতে হবে। সুদূর স্থান পেয়েছিল দ্বিতীয় গ্রন্থে, *The Gardener*-এ, তবে কবির স্বীয় অনুবাদে। সেরকমই পরশপাথর, রবীন্দ্রনাথ নূতন অনুবাদ করে নিলেন ওই দ্বিতীয় গ্রন্থে। কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ কবিতাটিও রবীন্দ্রনাথ সুকুমারের অনুবাদ না নিয়ে নিজের অনুবাদ নিলেন চতুর্থ গ্রন্থ, *Fruit Gathering*-এ। সুকুমারের করা সন্ধ্যা কবিতাটি কোনো অনুবাদ গ্রন্থে নেন নি তিনি।

সুকুমার রায়ের চিঠিতে আমরা জেনেছিলাম সুকুমার অন্যান্য কবিতার মধ্যে

এই কবিতাগুলোর অনুবাদ শুনিয়েছিলেন পীয়ারসনের বাড়িতে। The Spirit of Rabindranath Tagore-এ এই কবিতাগুলো তিনি অনুবাদ করেছিলেন : হৃদয়ের গীতিধ্বনি (সন্ধ্যাসঙ্গীত), নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে, সেগুলোও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদগ্রন্থে নিলেন না, নিজেও করলেন না। একমাত্র সুদূর কবিতাটি নিয়েছিলেন।

সুদূর-এর দুই অনুবাদে পার্থক্যের ধরনগুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে।

ব্যাকুল বাঁশরির অনুবাদে সুকুমার করেছিলেন passionate clarion call, রবীন্দ্রনাথ keen call of the flute। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই ঠিক করেছিলেন। শঙ্খ-ধ্বনির সঙ্গে passionate সংগতিহীন, ব্যাকুল বাঁশরি আর্থিক অনুবাদে keen flute সংগত। দূর থেকে বাঁশিই ব্যাকুল হয়ে বাজে, শঙ্খ নয়। clarion call-এর সঙ্গে কর্তব্যবোধের অনুষঙ্গ আসে। যে অনুষঙ্গটির এই কবিতায় আসার কথা নয়।

'তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী' সুকুমার করেছিলেন for the thrill of its touch। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কবিতায় যেটা ছিল না সেই নতুন রূপকটা আনলেন, to touch the skirt of the dim distance। অন্য অনুবাদকের পক্ষে এই স্বাধীনতা নেওয়া অসম্ভব ছিল। তারি আশা চেয়ে থাকি সুকুমার খুব সুন্দরভাবে করেছিলেন I listen for its tread upon the air—কিন্তু 'দিন চলে যায়, আমি আনমনে, তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে' পুরো পঙ্‌ক্তিটিই বাহুল্যজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করেছেন, এই ত্যাগের স্বাধীনতাও অন্য অনুবাদকের নেই।

সুকুমারের self confined (আছি এক ঠাঁই) হলো bound in this spot, wistful (উৎসুক) হলো wakeful, hopeless hope (দুর্লভ দুরাশা) impossible hope। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানে সংহতি আনলেন

In thy message my listening heart
Has found its own, its inmost tongue (সুকুমার)
Thy tongue is known to my heart as its very own (রবীন্দ্রনাথ)
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয় / জেনেছে তাহার স্বভাষী (বাংলা)
Like hopeless hope never attained
Comes the whisper of thy unceasing call (সুকুমার)
Thy breath comes to me whispering an impossible
hope (রবীন্দ্রনাথ)

তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো
কী কথা আমায় শুনাও সতত (বাংলা)

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ যে সুকুমারের অনুবাদের চাইতে মার্জিত, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের *The Gardener* সম্পাদনা করেছিলেন ইয়েটস এবং স্টার্জ মুর। তবে তাঁরা যে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে সামান্যই হাত দিয়েছিলেন অনুমান করা যায়, গীতাঞ্জলির অনুবাদে ইয়েটসের মার্জনার ধরন দেখে।

সুদূর-এর একটি অনুবাদ বেরিয়েছিল ১৯১২ ফেব্রুয়ারির মডার্ন রিভিউতে। ক্ষিতিমোহন সেনের ধারণা (চতুরঙ্গ, নভেম্বর ১৯৮৪) কবিতাটির অনুবাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজির অনুবাদের পরিচয় গ্রন্থে বলেছেন, অনুবাদটি সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের। এই দ্বিধার কারণ হয়তো এই ; ওই ফেব্রুয়ারি সংখ্যাতেই সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের নামে আর-একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সমুদ্রের প্রতি। তারপর একটি সমান্তরাল রেখা। তারপর সুদূরের অনুবাদ। এর অর্থ এই হতে পারে, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, দুটি কবিতার অনুবাদ করেছেন, দুটো অনুবাদের মধ্যে তাই এই সমান্তরাল দেখা। রবীন্দ্রনাথ যদি নিজেই অনুবাদ করতেন, সেটা একটা বিশিষ্ট ঘটনা বলে পরিচিত হতো, কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন বলে এই ফেব্রুয়ারি ১৯১২-তে কেউই শোনেন নি। এর আগে রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতার অনুবাদ মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছে, তাদের অনুবাদকের নাম স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিল অজিতকুমার চক্রবর্তী ও আনন্দ কুমারস্বামী (মার্চ ১৯১১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আনন্দ কুমারস্বামী (এপ্রিল ১৯১১), লোকেন্দ্রনাথ পালিত (মে ১৯১১ এবং আগস্ট ১৯১১)। এর পরে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ। ১৯১২ এপ্রিল সংখ্যায় কণিকা থেকে ৮টি কবিতার অনুবাদ বেরিয়েছিল, এখানেও অনুবাদকের নাম নেই। ক্ষিতিমোহন সেন এগুলোও রবীন্দ্রনাথের করা মনে করেছেন। কিন্তু সংশয় থেকেই যায়। রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডের কবিসমাজের সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় নি। মডার্ন রিভিউর সেপ্টেম্বর ১৯১২ সংখ্যায় যখন The Infinite Love (অনন্ত প্রেম), The Small (হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা), I run as a muskdeer runs বেরিয়েছিল, তখন

রামানন্দ বিশেষ করে উল্লেখ করেছিলেন, এগুলোর অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সেইরকমই নভেম্বর ১৯১২ সংখ্যায় Inutile কবিতার অনুবাদকও যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেটা বিশেষ করে বলে দেওয়া হলো। অতএব, আমরা ধরে নিতে পারি, ফেব্রুয়ারি ১৯১২-তে প্রকাশিত সুদূরের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের নয়, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের।

The Gardener-এর পাঠের সঙ্গে মডার্ন রিভিউয়ের এই পাঠের বিস্ময়কর সাদৃশ্য। সুকুমার রায়ের পাঠ না নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের পাঠ নিয়েছিলেন, সেটা সত্যব্রতের পাঠ লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হবে।

I am restless
I am athirst for the far, far away.
The daylight wanes, I watch at the window,
Ah me, *my soul goes out in longing*
To touch the skirt of the vast dim distance.
I am athirst for the far far away.
Oh, the great Beyond, oh, the uttermost glimpse,
Oh, the keen call of thy clarion !
I forget, I ever forget
That I have no wings to fly,
That I am bound in this spot evermore.
I am eager and wakeful,
I am a stranger in a strange lone land, O thou
the distant far
Thy voice comes to me
Bitterly sweet as the desire walking *imposible hope,*
And *thy tongue is known to my heart*
As its very own.
I am far away from thee, O thou art of reach,
Oh, the great Beyond, Oh, the farthest end,
O the keen call of thy clarion !
I forget, I ever forget

That I know not the way
That I have not the winged steed.
I am listless
I am a wanderer in my heart, O thou far away !
In the sunny haze of the languid noon-tide *hours*
In the murmur of leaves, in the play of the fitful shadows,
What vision of thine takes shape in the blue expanse
of the sky !
O far-to-seek, I am ever a wanderer in my heart.
Oh, the Great Beyond, *oh the farthest end*
Oh, the keen call of thy clarion !
I forget, I ever forget
That the gates are all shut everywhere
In the house where I dwell all alone.

মডার্ন রিভিউয়ের পাঠে কবিতার নাম আছে, The far off। দি গার্ডেনারে কোনো কবিতারই নাম নেই, এই কবিতারও নেই। উদ্ধৃত মডার্ন রিভিউর পাঠ লক্ষ্য করলে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই যে গার্ডেনারের পাঠ তৈরি করার সময় মডার্ন রিভিউর পাঠের সাহায্য অবশ্যই নেওয়া হয়েছিল। পরিবর্তনের মধ্যে, মডার্ন রিভিউর পাঠ অনেক সংক্ষিপ্ত হলো গার্ডেনারের পাঠে। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসও পালটে গেছে, কিন্তু সাদৃশ্য এতই প্রবল যে মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথই মডার্ন রিভিউয়ের পাঠ তৈরি করেছিলেন এবং ইয়েটস ও স্টার্জ মুর সংক্ষেপ, পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের মার্জনা করেছিলেন। কিন্তু যাঁরাই ইয়েটসের মার্জনার ধরন দেখেছেন গীতাঞ্জলির সময়, তাঁরাই জানেন, এতটা মার্জনা ইয়েটস কখনোই করেন নি, সামান্য এদিক ওদিক করা ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ যদি নিজেই আবার সংশোধন করে থাকেন, তাহলে পরিবর্তনও বড়ো সামান্য নয়, নিজের পাঠের পরিবর্তন এতটাই বা তিনি কেন করবেন। ফলে সিদ্ধান্ত করতেই হয়, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের পাঠ রবীন্দ্রনাথ বহুলাংশে নিয়েছেন, এমন কি নতুন বাক্‌প্রতিমা সহ : the skirt of the dim distance।

মডার্ন রিভিউতে অন্যান্যদের করা যে সব অনুবাদ বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার

কোনোটিই নেন নি। সম্পূর্ণই নতুন করে অনুবাদ করেছিলেন। একমাত্র সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের এই সুদূর-এর অনুবাদ ছাড়া। সত্যব্রতের অনুবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অনুবাদের এতই সাদৃশ্য যে মনে হতেই পারে, রবীন্দ্রনাথের অন্তত: এই অনুবাদটির ক্ষেত্রে সত্যব্রতের নাম করা উচিত ছিল।

Gitanjali-এর প্রথম মুদ্রণ হয় ১ লা নভেম্বর ১৯১২, *The Gardener*-এর নভেম্বর ১৯১৩। সুকুমার যখন The Spirit of Rabindranath Tagore লেখেন তখন হাতের কাছে ইংরেজি গীতাঞ্জলি ছিল, কারণ সেই গ্রন্থ থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ উদ্ধৃত করছেন। সুদূর-এর অনুবাদ যখন তিনি ১৯১২ সালের ১৯ জুন পাঠ করছেন বা *Quest* পত্রিকায় ছাপাচ্ছেন, তখনও *The Gardener* প্রকাশিত হয় নি, ফলে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের কথা তিনি জানেন না। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, সুকুমার কি সত্যব্রতের অনুবাদের কথা জানতেন না? মডার্ন রিভিউতে অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আবার অনুবাদ করলেন, মনে করা যেতে পারে সত্যব্রতের অনুবাদ তাঁর পছন্দ হয় নি।

Gitanjali-এর ভূমিকায় ইয়েটস এক বাঙালি ডাক্তার (ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র) ছাড়া আরো কয়েকজন ভারতীয়ের কথা বলেছেন যাঁদের রবীন্দ্রানুরাগ তাঁকে বিস্মিত করেছিল। তাঁদের একজন বলেছিলেন, তাঁর স্বচক্ষে দেখা—ভোর তিনটের সময় কবি ধ্যানে স্তব্ধ থাকেন এবং ঈশ্বর চিন্তায় প্রায় দুঘণ্টা নিযুক্ত থাকেন। কবির পিতা মহর্ষিও অনেক সময় সারা দিনই এমন ধ্যানে মগ্ন থাকেন, একবার প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ মহর্ষি নৌকোয় যেতে যেতে ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন, ফলে মাঝিদের আট ঘণ্টা নৌকো থামিয়ে রাখতে হয়। সেই ভারতীয় ঠাকুর পরিবারের বিখ্যাত লোকদের কথা ইয়েটসকে জানিয়েছিলেন। কী করে দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের পায়ে কাঠবিড়ালি, কাঁধে পাখিরা এসে বসে, সেকথাও জানিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে সাহিত্য এবং সংগীত তাঁকে ঘিরে থাকত। নীটশে কেন বলতেন যে নৈতিক বা মননশীলতার সৌন্দর্য অনেক সময়েই শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেটা ইয়েটস এই সব ভারতীয়দের প্রবল রবীন্দ্রমুগ্ধতা দেখে বুঝতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রজীবনীকার আর্নেস্ট রীজও এমন একজন বাঙালির কথা বলেছিলেন। লণ্ডনে এক থিয়েটারে তিনি যখন একটি ভারতীয় নাটক দেখছিলেন তাঁর পাশে বসা অপরিচিত এক বাঙালি দর্শক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি ওই

নাট্যকারের অন্য কোনো রচনার সঙ্গে পরিচিত ? তার পর সেই বাঙালিটি সেই সব কবিতা আর গল্পের কথা বলতে শুরু করলেন, শিল্পের উত্তেজনার সঙ্গে, যে সব কথা শুনে কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। যেমন বলেছিলেন তেমনই দু-এক সপ্তাহ পরে এক রবিবার সন্ধ্যাবেলায় মূল বাংলায় লেখা একটি কবিতাগ্রন্থ নিয়ে এলেন সেই বাঙালিটি, তাদের কিছু অনুবাদের সঙ্গে। "তিনি যে সঙ্গে মুগ্ধতার সঙ্গে সেইগুলো আমাদের পড়ে শোনালেন সেই মুগ্ধতা আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হলো। কবির প্রতি এমন আনুগত্য আমাদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। এইরকম ছেলে-মানুষী ভক্তির মধ্যে এমন এক উচ্ছ্বাসের আবেগ ছিল যা আমাদের উপনিষদের সেই কথা মনে পড়িয়ে দেয়! যদি তুমি এমন বাণী কোনো শুকনো লাঠিকেও বলতে পারো, সেই লাঠিও পত্রে শাখায় পল্লবিত হয়ে উঠবে।"

১৯১৩ সালে লণ্ডনে যেসব রবীন্দ্রভক্ত বাঙালি ছাত্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র সুকুমার রায়েরই সন্ধান পাওয়া যায় যিনি সেইসময় রবীন্দ্রনাথের কবিতার তর্জমা করছিলেন। অজিতকুমার ১৯১১ সালেই ইংল্যাণ্ড থেকে বাঙলাদেশে ফিরে এসেছেন। কালীমোহন ঘোষও আছেন, তবে তাঁর রবীন্দ্ররচনার কোনো অনুবাদ দেখা যায় না। যেমন পাওয়া যায় না অন্য ভক্তদের, অরবিন্দমোহন বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। এঁদের কেউ কেউ, যেমন অরবিন্দমোহন বসু অনেক পরে বলাকা বা মহুয়ার বা অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ থেকে অনুবাদ করবেন, কিন্তু কবিতার অনুবাদ তখন একমাত্র সুকুমার রায়ই করেছেন। আর একজন ছাত্র, ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, রাজা অনুবাদ করছিলেন, তবে সেই সময় কবিতা অনুবাদ করেছেন বলে জানা যায় না। ১৯২৮ সালে তিনি অবশ্য ১৫টি কবিতা অনুবাদ করেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডে সুকুমার প্রচার করছিলেন, যার প্রমাণ *Quest*-এর এই প্রবন্ধ। পত্রিকায় প্রকাশ করার আগে সুকুমার এটা পাঠ করেন East and West Society-তে ২১ জুলাই ১৯১৩। রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত একটি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে সুকুমারের সেই বক্তৃতাসভায় ভালোই লোক হয়েছিল। *Quest*-এর সম্পাদক Mr. Mead সেই সভাতে ছিলেন এবং সেখান থেকেই প্রবন্ধটি সংগ্রহ করেন।

রীজ যে ভারতীয় নাটকের কথা বলেছেন, সেটা সম্ভবতঃ Royal Court Theatre-এ ডাকঘর, ১৮ জুলাই ১৯১২-তে অভিনীত। সুকুমার সেই নাটক

দেখতে গিয়েছিলেন। তবে প্রভাতকুমার জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবাস-কালে আরো দুটি রবীন্দ্রনাটক অভিনীত হয়েছিল লণ্ডনে। ৩০ জুলাই ১৯১২ রয়াল অ্যালবার্ট হলে হয়েছিল দালিয়া, জর্জ ক্যালডেরনের নাট্যরূপ অবলম্বনে : *The Maharani of Arakan*। ১০ মে ১৯১৩ তারিখে ডাকঘর মঞ্চস্থ হয় আইরিশ থিয়েটারে। রাজা অভিনীত হয়েছিল লিটল থিয়েটারে, প্রভাতকুমার তারিখ দেন নি।

যে নাটকেই রীজের সঙ্গে সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদকের দেখা হোক-না কেন, অনুমান করা যেতেই পারে তিনি সুকুমার রায়। কিন্তু সুকুমার রায়ের অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হন নি।

আরো একজন তরুণ অনুবাদকও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ উপেক্ষণ সহ্য করেছিলেন। তিনি রোবি দত্ত (১৮৮৩-১৯১৭)। হাটখোলার দত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। কেম্ব্রিজ থেকে ১৯০৬ সালে ট্রাইপস নিয়ে তিনি পাস করেন, মধ্যযুগ এবং আধুনিক ভাষায়। ব্যারিস্টারি পাস করে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি হাইকোর্টে অ্যাড-ভোকেট হন ১৯১০ সালে। ওই সালেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্ব এবং পরে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হন। ১৯০৯ সালে তিনি তাঁর বৃহৎ অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করেন *Echoes from East and West*। কেম্ব্রিজ থেকে প্রকাশিত এই কবিতার অনুবাদগ্রন্থ ইংরেজ পণ্ডিতমহলে আদৃত হয়েছিল। প্রাচীন এবং আধুনিক কবিদের কবিতার সংকলনে বাঙালি কবি ছিলেন চণ্ডীদাস, মধুসূদন, বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৩ সালে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় অ্যানড্রুজ মডার্ন রিভিউতে লিখেছিলেন, তিনি কেম্ব্রিজে ১৯১২ সালে প্রথম বইটি দেখেন। অ্যানড্রুজ বিস্মিত হয়েছিলেন যে ভারতে তিনি এই গ্রন্থের কোনো সমালোচনা বা উল্লেখ দেখেন নি। রোবি দত্তের অনুবাদগুলো, বিশেষ করে ভারতীয় কবিদের, অ্যানড্রুজের খুব ভালো লেগেছিল। দুটো ইংরেজি কবিতাসংগ্রহেও রোবি দত্তের অনুবাদের কয়েকটি স্থান পেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা আর গানগুলো রোবি দত্ত অনুবাদ করেছিলেন :

গোলাপকলি পড়িছে ঢলি (শৈশবসংগীত) : The rosebud

গান আরম্ভ (সন্ধ্যাসংগীত) : To the Muse

যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে (মায়ার খেলা) : Importunate

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ (সরোজিনী) : The Fair Martyrs

তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ (রবিচ্ছায়া) : The sworn hero
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা (কল্পনা) : A twilight serenade
মহাসিংহাসনে বসি (রবিচ্ছায়া) : The World-song
অনন্তসাগরমাঝে দাও তরী ভাসাইয়া (স্বপ্নময়ী) : Life's voyage
উর্বশী (চিত্রা) : Urvasi
অয়ি ভুবনমনোমোহিনী (কল্পনা) : A song of Ind
Flower on flower is leaning over : The Sense of Loneliness

এই অনুবাদগুলো যে রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হবে না তার প্রধান কারণ, অনুবাদের অন্ত্যমিল। রবীন্দ্রনাথ মাত্র একটি গানের অনুবাদে অন্ত্যমিল বজায় রেখেছিলেন, অলি বারবার ফিরে যায়, এবং সেটাও The Maharani of Arakan-এ সুর-সহযোগে গাওয়া হবে বলে। রোবি দত্তের অনূদিত কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কেবল দুটি কবিতা নিজে আবার অনুবাদ করেছিলেন, একটি উর্বশী যেটি স্থান পেয়েছিল *The Fugitive*-এ। আর, যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে'র অনুবাদও করেছিলেন, কিন্তু কোনো কাব্যগ্রন্থে নেন নি। তবে তিনি যে আদৌ রোবি দত্তের অনুবাদগুলো দেখেছিলেন তার কোনো উল্লেখ আমরা এই পর্যন্ত পাই নি।

এই সব অন্যান্য অনুবাদকের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ কেন পছন্দ করেন নি কখনো বলেন নি, তবে তাঁর নিজের করা অনুবাদের সঙ্গে এদের মূল পার্থক্য, রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দে অনুবাদ করেছিলেন, মূল কবিতা অনেক সংহত করেছিলেন, কাব্যিকতা বর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সেযুগে উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছিল, তবে কিছুকাল পরই উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে যায়, অধিকাংশ পাঠকের কাছে। অনুবাদতত্ত্বে আগ্রহী পাঠক এই সব অনুবাদ লক্ষ্য করতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। বাংলা-জানা টমসনের অনুবাদও লক্ষ্যের বিষয় হতে পারে, সেগুলোও রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেছিলেন।

সমর সেন : তেইশ আগস্ট স্মরণে

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

যে ঘরের সান্ধ্যকালীন বিখ্যাত আড্ডায় বারদুয়েক উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছি, কবি হবার সুবাদে নয়, সেই ঘরের মাঝখানে একটি ছোট খাটে তাঁর শবদেহ এনে শোয়ানো হয়েছে। ফর্সা, অত্যন্ত রোগা একটি দেহ। মাথা ও কপালটুকুই কেবল স্বাভাবিক। বিছানার সঙ্গে যেন মিশে আছে। বছর কয়েক আগে দেখা অসুস্থ আবু সয়ীদ আইয়ুবের মুখটি মনে পড়ল।

অনেকদিন ধরেই ভুগছিলেন সমর সেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে অবাক হই নি। দুঃখ হল শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য তৎপরতা দেখে। উপস্থিত শোকার্ত মানুষের সংখ্যাল্পতা দেখে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কাচ-ঘেরা কালো গাড়ি এসে তাঁকে নিয়ে গেল। শবদেহের পাশে অল্প কিছু ফুল ছিল, লাল ও শাদা ফুল, তাঁর নাতনির প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। ভাবছিলাম, আর একটু অপেক্ষা করলে হয়তো অনেকে এসে পড়বে, মুখে মুখে খবর ছড়াতে তো সময় লাগে। তখন তাঁর ভক্তরা হয়তো মিছিল করে নিয়ে যাবে তাঁকে শ্মশানে। কাঁধে করে দল বেঁধে আমরা যেমন বুদ্ধদেব বসুর শবদেহ নিয়ে গিয়েছিলাম।

তা না করে হয়তো ভালোই হয়েছে। পরে ভেবেছি। সমর সেন আবেগের অসংযত প্রকাশ পছন্দ করতেন না।

সত্তর-একাত্তর বছরের একটি নাতিদীর্ঘ জীবন তিনি যাপন করে গেছেন। তার প্রথমার্ধে কিছু কবিতা এবং দ্বিতীয়ার্ধে একটি ছোট্ট আত্মজীবনীমূলক রচনা লিখেছেন আমাদের জন্য। তাতে অনেক কথাই না-বলা থেকে গেছে। শুধু এইটুকু ইঙ্গিত আমরা হয়তো পেয়েছি যে, ক্যমুনিজমের জয়লাভ দেখার জন্য তাঁর মনে বেঁচে থাকার ইচ্ছা ছিল একসময়, বুদ্ধির দিক দিয়ে। অন্যান্য ব্যাপারে বরাবরই তিনি বাগবাজারি বখাটে ভাব বজায় রেখে চলেছেন। চীনে নতুন যুগ প্রবর্তন করলেন মাও-সে-তুং আর দিল্লীর চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এলেন

বাবু সমর সেন। সাংবাদিকতার কাজ করেছেন নানা পত্রিকায়; কোথাও বেশি-দিন টিঁকতে পারেন নি তাঁর অনমনীয় সততার কারণে। না হলে, যে-মানুষ ইচ্ছা করলে কেবল ইংরেজী ভাষার ওপর দখলের জোরে নীরদ চৌধুরী কি খুশবন্ত সিং-এর মতো সচ্ছলতা কিনতে পারতেন অবলীলায়, তিনি কিনা শেষ জীবনে ট্রামে চেপে 'ফ্রন্টিয়ার' নামক এক লিটল ম্যাগাজিন চালিয়ে নিজেকে ক্ষয় করলেন। এদেশের সমাজব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। বরং মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েই চলেছে এবং মুখে বলা হচ্ছে আমরা সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়তে চাই—প্রতিকারহীন এই ভণ্ডামি দেখে দেখে হতাশ হয়েছেন সমর সেন। এক জায়গায় লিখেছেন, "হতাশার ভাব মাঝে মাঝে হয়। সব সময় হলে তার থেকে একটা কিছু বেরিয়ে আমার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ক্ষণিক হতাশা আর অভ্যাসবশে দিনগত পাপক্ষয় করে গেলে অবস্থাটা হয় হাফ গেরস্তর মতো।"

হয়তো তাঁর আশা ছিল, ভিয়েৎনামের মতো আমাদের দেশেও কোনো একদিন গণঅভ্যুত্থান হবে। বিপ্লব আসবে। গরিব মানুষ দেশ স্বাধীন হবার পর বেশিদিন বঞ্চনা সইবে না। নকশাল আন্দোলনের সময় তাঁর সে-আশা বাস্তবের রূপ নিচ্ছে বলে মনেও হয়েছিল হয়তো, কিন্তু এ দেশে তা হবার নয়। পালা করে শোষণ ও ত্রাণ—এই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত এদেশের সাধারণ মানুষ বিপ্লবের কথা ভাবতে ভয় পায়। শেষ পর্যন্ত নকশালদের তারাই প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যদিকে দেশের নেতৃত্ব গান্ধী-নেহরুর আমল থেকে শুরু করে আজ অবধি এমন একটা তালি মারা প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হয়ে এসেছে যে, দীর্ঘকালীন চিকিৎসার সুযোগ দেশের মানুষ পেল না। এই সব কারণে—বাবু বৃত্তান্তে বর্ণিত ইঙ্গিত থেকে মনে হয়—সমরবাবু ক্রমশ এ দেশের তথাকথিত গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিমুখ হয়েছেন। তাঁর মন ক্লান্তি ও তিক্ততায় ভরে উঠেছে। তাঁর সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিকে এই তিক্ততার প্রকাশ অবশ্যই হয়ে থাকবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রের উত্তরণে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাই ষাটের দশকের পর আর কখনো ভোট দেন নি। একথা তিনি কবুল করেছেন।

আদর্শের প্রতি অনুরক্ত, শান্ত ও প্রচারবিমুখ এই মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত পরিহাসপটু। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে এমন অজস্র চুটকি গল্প প্রচলিত আছে যেগুলি সংকলিত হলে একটি ছোটখাটো 'পকেট বুক অফ মেমরেবল জোকস'

তৈরি হয়ে যায়। বাবু বৃত্তান্তে তার অল্প কয়েকটি স্থান পেয়েছে মাত্র। বাঙ্গে তিনি নিজেকেও রেহাই দেন নি।

এক জায়গায় লিখছেন, "জনগণের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল না, পরিধি ও পরিবেশ ছিল মধ্যবিত্ত। আমার ছাত্রাবস্থায় বাবা বলতেন আমার বন্ধুবান্ধব সবাই সচ্ছল। কথাটা ঠিক। আমাকে কেউ বিপ্লবী বললে মনে হত—এবং এখনও হয়—যে, বিপ্লবকে হেয় করা হচ্ছে। চিন্তায় ও কর্মে সময়য় আনতে না পারলে বড় জোর 'বিপ্লবী' সাপ্তাহিক চালানো যায়, কিন্তু বিপ্লবী হওয়া যায় না। এমন কি স্তালিনোত্তর মহান বিপ্লবী দেশে কয়েক বছর কাটালেও নয়।"

অনেকেই জানেন, 'নাও' এবং 'ফ্রন্টিয়ার' চালাবার সময় তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী—খ্যাত-নামা সব সাংবাদিক ও লেখক তাঁরা—নানা ভাবে তাঁকে সাহায্য করেছেন। বিশেষত অনামে-বেনামে লেখা দিয়ে। দুঃসাহসী সে-সব লেখা প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকায় ছাপা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, প্রগতিপন্থী ও বন্ধুকৃত্য করতে উৎসুক সেই লেখককুলের প্রত্যেকেই নিজ-নিজ চাকরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সমরবাবুর কাগজে প্রকাশ্যভাবে লেখা ছাপিয়ে তাঁরা ঝুঁকি নেবেন কেন? এই ব্যাপার কৌতূকসহকারে লক্ষ্য করেছেন সম্পাদক। বাবু বৃত্তান্তে এ-নিয়ে একটি সুন্দর চুটকি আছে। নকশাল আমলের পর একদিন ভোরবেলা সমরবাবুর বাড়িতে পুলিশি হামলা হয়। জানা যায়, তাঁকে না, পুলিশ তাঁর ভাইপোকে খুঁজছে। কিছু কথা কাটাকাটির পর প্রস্থান করে পুলিশবাহিনী। ইত্যাদি।

গল্পটি বলার পর সমরবাবু লিখছেন, "ঘটনাটা চেপে গেলাম। কেননা জানা-জানি হলে 'ফ্রন্টিয়ার'-এ নিয়মিত লেখকদের দু-একজন হয়তো ঘাবড়ে যেতেন।"

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে, কেরিয়ার বাঁচিয়ে, সহমর্মী তাঁর যে-সব শ্রদ্ধাশীল বন্ধু সমর সেনকে আরব্ধ কাজে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের হেয় করছি না। বলতে চাইছি, এই জেদী ও একগুঁয়ে মানুষটি আসলে তাঁর ব্যক্তিগত যুদ্ধ একাই করে গেলেন। যা কিছু অন্যায় ও অসংগতি, তার বিরুদ্ধে তিনি নিজের জীবনটি স্থাপন করে গেলেন বর্শার ফলার মতো। কিন্তু কী হল তাতে? এই এক জীবনাদর্শ আগলে থাকা, নিজেকে ও নিজের পরিবারকে সামান্যতম সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা, এই প্রায়োপবেশন, আত্মক্ষয়, এতে কার কী উপকার হল? বৃহদাকার জগদ্দলকে কি তিনি নাড়াতে পারলেন? তিনি কি এমন কোনো

উত্তরাধিকার রেখে গেলেন যেখান থেকে তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে ? রাজনীতির লড়াই যখন সংগঠনভিত্তিক, প্রেরণাজাত, নেতৃত্বনির্ভর, তখন একা তিনি এ-লড়াইয়ে শামিল হলেন কেন ? তিনি কি ভেবেছিলেন, বুদ্ধিজীবীরা এ দেশে সমাজতন্ত্র আনবে, তিনি বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষিত করছেন ? পাতি বুর্জোয়া যাদের বলা হয়, তিনি কি তাদের চরিত্র জানতেন না ? এ-সব প্রশ্নের উত্তর আজ আর পাবার উপায় নেই। তিনি জীবিত থাকতে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যায় নি।

সর্বসাকুল্যে বারো বছর কবিতা লিখেছেন সমর সেন। তাঁর নিজের আঠারো বছর বয়স থেকে ত্রিশ বছর বয়স অবধি। সূচনাপর্ব লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, অল্প বয়সে তাঁর মন যাকে বলে পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে মনে হতো জোলো, নজরুল তখন বিপ্লবীদের নায়ক। তারপর কল্লোল কালিকলমের লেখককুল তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে কারণ তাঁরা এই স্থবির ভণ্ড সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। কালক্রমে সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে-র সাহিত্যিক আড্ডায় গতায়াত এবং কাব্যচর্চা চলতে থাকে। উনিশশো চল্লিশ সাল পর্যন্ত এই ব্যাপার, তারপর দিল্লী চলে যান এবং সেই পর্যায়ের কবিতায় রাজনীতির প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে। সমর সেনের প্রথম দিককার কবিতায় শ্লেষ ও বিদ্রূপের ফাঁকে ফাঁকে আমরা একজন ক্লান্ত ও হতাশ মানুষের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছি। রোমান্টিক মনের সেই মানুষটিকে আমাদের পছন্দ হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় প্রকট হয়ে উঠতে লাগল এক প্রকার তিক্ততা ও ক্রোধ। এবং রাজনীতির কথা। আত্ম-জীবনীতে লিখছেন, "১৯৪৪-এর জুন মাসে মিত্রশক্তিরা পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলাতে বিবেক হালকা হয়ে গেল, সরকারী চাকরি নিয়ে রেডিও সংবাদ বিভাগে ঢুকলাম। সংবাদের চাপে, দেশের দাঙ্গাহাঙ্গামায় আস্তে আস্তে কবিতা লেখা বন্ধ হয়ে এলো—ছক মেলানো কঠিন হয়ে পড়েছিল।" শুধু সংবাদের চাপ নয়, কলকাতা ত্যাগও তাঁর কবিতাচর্চা বন্ধের আর একটি কারণ বলে আমাদের ধারণা। যা-ই হোক, এই বারো বছর সময়ে কমবেশি একশোটি উজ্জ্বল কবিতা তিনি বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়ে গেছেন। তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

সমর সেনের কবিতা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় নি। অথচ বাংলা কবিতা, বিশেষত রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা নিয়ে যাঁরা ভাবনা চিন্তা করেন, তাঁরা তাঁর কবিতার অনুরক্ত পাঠক। বাহুল্যবর্জিত তাঁর ভাষা এবং আবেগকে বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি অথচ লেখার মধ্যে গভীর মমত্ববোধ লুকোনো আছে—সব

মিলিয়ে এ জিনিস আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে না। নাকি, আসলে মেলে ? মধুসূদন, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু মিত্র—উনিশ শতকের এই ধারালো মেজাজ শহুরে বাঙালীর নিজস্ব। মনে করা যেতে পারে, সমর সেন রবীন্দ্রনাথকে বাইপাস করে সেই মেজাজের খেই ধরিয়ে দিয়েছেন আমাদের হাতে—। এমন এক সময়ে তা দিয়েছেন যখন আমরা অনেক রকম ভাঙচুর—সম্পর্ক ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এর পরেই কাব্যিক ভাষা ভুলে বাঙালীর মুখের ভাষার কাছা-কাছি চলে এসেছে কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের কথা যখন উঠল, তখন একটি সামান্য প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয়। ১৯৪০ সালে সমর সেনের দ্বিতীয় কবিতার বই বেরিয়েছে। ১১।৩।৪০ তারিখের চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, "আপনার সময়ের অত্যন্ত অভাব, জানি, তবু 'গ্রহণ' আপনার কেমন লেগেছে জানতে পারলে বিশেষভাবে উপকৃত হবো।"

১৫।৩।৪০ তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, "তোমার লেখনী কাব্যের যে নতুন সীমানায় যাত্রা করেছে, সে আমার অপরিচিত, শুধু আমার নয়, সাধারণের কাছে এর ম্যাপ এখনো স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হয় নি, সুতরাং এখানে তোমার আসন অল্প লোকের কাছে স্বীকৃত হতে বাধ্য।···আমাদের রসসম্ভোগের অভ্যাস তোমাদের এ যুগের নয়, ক্ষুণ্ণমনে এই কথা কবুল করে তোমাকে আশীর্বাদ জানাই।"

এর প্রায় পাঁচ বছর আগে 'কবিতা' পত্রিকায় সমর সেনের লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথই বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন, "সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা ট্যাঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে।" (৩।১০।১৯৩৫)

১৯৩৫ সালে সমর সেনের বয়স ছিল উনিশ। বাংলা কবিতায় অভিনব এক গদ্যরীতি তিনি ওই বয়সেই প্রবর্তন করেছিলেন। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কবিতা না হয়ে ওঠার প্রায় সব লক্ষণ তাতে বিদ্যমান, সেই কারণে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মতো উদার ব্যক্তিরও রসসম্ভোগের অভ্যাসকে ক্ষুণ্ণ করেছিল তাঁর অভিনব গদ্যরীতি।

ক্ষুণ্ণ না করলে নতুন সীমানার দিকে যেতেন কী করে ? কী করে দেখাতেন নতুন সীমানার পথ ? পরবর্তীকালে নানা টালমাটালের মধ্যে বাংলা কবিতায় যে-সব উজ্জ্বল ফসল ফলেছে, তার খানিকটা দায়ভাগ আমরা এই উন্নাসিক রবীন্দ্র-বিমুখ কবিকে কি দেব না ?

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি

পিনাকী ভাদুড়ী

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এ চিঠি স্বনামে লেখেননি। লিখেছিলেন বকলমে। তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সূর্যমুখী তার ননদ কমলমণিকে একটি চিঠি লিখেছিল। এইটিই সেই চিঠি। লেখার সময়ে সূর্যমুখীর জীবনে দারুণ দুঃখ এসে উপস্থিত হয়েছে। তার স্বামী নগেন্দ্রনাথ তখন অন্যনারীতে আসক্ত। কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত। সেই দুঃখের কথা বলবার জন্যই চিঠিটি লেখা হয়েছিল। কুন্দনন্দিনী ছিল বিধবা। নগেন্দ্র কি তাহলে বিধবা বিবাহ করতে চলেছে? সূর্যমুখী স্বামী-অন্ত-প্রাণ। স্বামী অন্যকে বিবাহ করবে, এ তার পক্ষে সহ্য করা শক্ত। তাছাড়া বিধবা বিবাহ সূর্যমুখী সমর্থন করে না। সেই কথাই সে চিঠির শেষে লিখেছিল—

> ...আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্কবিতর্ক হয়। সেদিন ন্যায়-কচকচি ঠাকুর, মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র, বিধবা বিবাহের পক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটি টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন সার্বভৌম ঠাকুর বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য আমি পাঁচ ভরির সোনার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবা বিবাহের দিকে নয়।

চিঠিটি পরীক্ষা করে দেখলে কয়েকটি জিনিস চোখে পড়ে। প্রথম, 'ঈশ্বরচন্দ্রে'র নামটা কেবল 'ঈশ্বর বিদ্যাসাগর' বলে উল্লেখ করে তাচ্ছিল্য দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়, সরাসরি তাঁকে 'মূর্খ' বলতেও সূর্যমুখীর আটকায়নি। তৃতীয়, বিধবা বিবাহের পক্ষে যিনি, তাঁকে বিদ্রূপ করে 'ন্যায় কচকচি' বলেছে সূর্যমুখী। ঐ ন্যায় কচকচি মানুষটি যে বিধবা বিবাহের পক্ষে কথা বলে, তার কারণ তার টাকার দরকার। সেই দরকারে লোভে পড়ে সে যা বলেছে, তার গুরুত্ব তাহলে থাকে না।

চতুর্থ, 'সার্বভৌম' মানুষটি প্রকৃত জ্ঞানী, সে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে বলেছে—সূর্যমুখী তার জ্ঞানের পুরস্কার হিসেবেই তার মেয়েকে বালা গড়িয়ে দেয়। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রস্তাবটা, সূর্যমুখীর কাছে 'হাসির কথা' মাত্র।

এখন বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রস্তাব এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস, বাংলাদেশের এই দুটি ঘটনার পটভূমিটা বিচার করে দেখা যাক। বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন ১৮২০ সালে, তাঁর জীবনাবসান হয় ১৮৯১ সালে। এই সময়ের মধ্যে নানা ধরনের কাজে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি প্রচণ্ড সংগ্রাম করেন এবং ১৮৫৬ সালের ১৬ই জুলাই বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়।

অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের আয়ুষ্কাল ছিল ১৮৩৮ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত। তাঁর 'বিষবৃক্ষ' একটি বিশিষ্ট উপন্যাস, এটি 'বঙ্গদর্শনে' ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাস থেকে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭৩ সালে এটি গ্রন্থাকারে দেখা দেয়।

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিদ্যাসাগর মোটামুটি ভাবে সমসাময়িক ছিলেন। তবুও, দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি। প্রস্তাব আইনসিদ্ধ হবার ১৬ বছর পরে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস লেখা হয়, তখনো বঙ্কিমচন্দ্র একে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে পারেননি।

অবশ্য, ঐ উপন্যাসে নগেন্দ্র যখন বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিবাহে উদ্যত, তখন সে বিদ্যাসাগরেরই দোহাই দিয়েছে। শ্রীশচন্দ্র যখন নগেন্দ্রকে ঐ বিবাহের জন্য ব্যঙ্গ করে পত্র লিখেছেন, তার উত্তরে নগেন্দ্রনাথ লিখেছে

> যদি কেহ বলে যে, বিধবা বিবাহ হিন্দু ধর্ম বিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্র-বিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে? আর যদি বল, শাস্ত্রসম্মত হইলেও ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব; তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য?

চিঠিতে বিদ্যাসাগরের যুক্তিকে সাক্ষী মানলেও, নগেন্দ্রনাথের আসল জোর কিন্তু অন্যত্র। তা হল তাঁর সামাজিক প্রতাপ। অর্থাৎ, প্রায় গায়ের জোরে এই বিবাহ তিনি সমাজে স্বীকার করিয়ে নিতে পারেন। আসলে তিনি কুন্দনন্দিনীকে দেখে আবেগে, কামনায় তাড়িত এবং অভিভূত হয়েছেন, তাই চিঠির প্রথমেই গোঁ ধরে বসেছেন—

আমি এ বিবাহ করিব।··· নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব—তাহার বড় বাকীও নাই।

সূর্যমুখীর চিঠি এবং নগেন্দ্রনাথের চিঠি—দুটো মিলিয়ে পড়লেই দেখা যাবে যে সূর্যমুখীর বাক্যবিন্যাসে বঙ্কিম যে শৃঙ্খলা এবং দৃঢ়তা ভরে দিয়েছেন, নগেন্দ্রর কলমে তার কিছুই দেননি। এমনকি নগেন্দ্রকে দিয়ে বিবাহের পক্ষে বঙ্কিম যেসব যুক্তি দিয়েছেন, তার দুর্বলতাও সহজে ধরা পড়ে। সূর্যমুখী নিজেই এ বিবাহে উদ্যোগী, অতএব নগেন্দ্রর কোনো দোষ নেই—এটাকে যুক্তির ফাঁকি বলা চলে। সূর্যমুখীর অভিমানকে নগেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করেই দেখল না, এটুকু বুঝতে পাঠকের ভুল হবার কথা নয়।

এখন দেখা যাক, এই বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিজের মূল্যায়ন কী ছিল। যদিও নিজের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হবার কথা নয়, তবু এটুকু অন্তত বোঝা যাবে যে তাঁর জীবনব্যাপী বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলনকে বিদ্যাসাগর কী চোখে দেখতেন। বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করতে মনস্থ করায় বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্র দাদাকে লিখেছিল যে এ বিবাহ হলে কুটুম্বরা তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। অতএব দাদা যেন এ বিয়ে হতে না দেন। বিদ্যাসাগর প্রথমেই উত্তর দিলেন না। বিয়ে হয়ে যাবার পরে ৩১শে শ্রাবণ ১২৭৭ সালে (১১ই আগস্ট, ১৮৬০) শম্ভুচন্দ্রকে লিখলেন—

বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি, এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্তস্বীকারেও পরাঙ্মুখ হইব না।

অবিস্মরণীয় এই চিঠি। বিদ্যাসাগরের পৌরুষ, মনুষ্যত্ব এর ছত্রে ছত্রে জলজল করছে।

বিদ্যাসাগর যাকে তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম' মনে করতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সেটি কেবল 'হাসির কথা'। বাঙালী জীবনে যে নবযুগ রামমোহন রায়ের সময় থেকে শুরু হয়েছিল, সেই যুগেরই আরেক প্রতিভূ বিদ্যাসাগর। বাঙালী সমাজে তখন ব্যাপক আলোড়ন দেখা দিয়েছে—নানা মনীষী ও কর্মী এসেছেন।

তবুও, এই জাগরণের যুগে ত্রুটিও যে ছিল না তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে একজন 'জায়ান্ট', তথাপি বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারকে তিনি বুঝতে পারেননি। এঁদের দুজনের জন্যই বাঙালী পৃথক পৃথক ভাবে গর্ব বোধ করতে পারে, কিন্তু এঁদেরই একজন আরেকজনের গৌরবকে মেনে নেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্মকে স্বীকার করেছিলেন যদিও প্রথম প্রথম কিছু নিন্দাও করেছেন। বলেছেন, বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাঙলা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গিয়েছেন (যেন বঙ্কিমচন্দ্র নিজে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেননি!) পরে অবশ্য বলেছেন 'বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙলা গদ্য লিখিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার পরেও পারে নাই।'

রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েরই সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন করেছেন। বলেছেন, 'বিদ্যাসাগর বাঙলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।' প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের সফল প্রবর্তন করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় সাহিত্যের রাজকন্যা জেগে উঠলেন—রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস সম্বন্ধে তখনকার দিনে পাঠকের মনে কী কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল, তাও বলেছেন তিনি। বিষবৃক্ষ 'যে পরিচয় নিয়ে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের অনুরক্ত ছিলেন। নবীনচন্দ্র সেন একবার বঙ্কিমকে 'বিষবৃক্ষ' থেকে পড়ে শোনাতে বলেন। আমরা যে চিঠিটির কথা গোড়ায় উল্লেখ করেছি, সেইটি থেকেই বঙ্কিম পড়ে শুনিয়েছিলেন নবীনচন্দ্রকে। সূর্যমুখী যেখানে নিজের স্বামী-অনুরাগের কথা বলছে, সেই অংশটি বেছে নিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—

পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে

কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে যদি আমার কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ।

বঙ্কিমচন্দ্র সবটা পড়তে পারেননি। খানিকটা পড়ে কেঁদে ফেলেছিলেন—'বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে পারি না।'

অর্থাৎ বঙ্কিমের কাছে সূর্যমুখী এতটাই সত্য ছিল। সুতরাং সূর্যমুখীর হয়ে যে তিনি বিদ্যাসাগরকে গাল দেবেন, এ আর বেশি কথা কি! কেউ যদি বলেন যে সূর্যমুখী যা লিখেছে, সেটা তার মতো চরিত্রবিশেষেরই কথা, লেখকের নয়, তবে তাঁকে এই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিই।

এটা ঠিকই যে বঙ্কিম বিধবা বিবাহে রাজী হননি, তবে ঐ সামাজিক আলোড়ন থেকে দূরে সরেও থাকেননি। তাঁর মতাদর্শ অনুযায়ী সূর্যমুখীর প্রতিই তাঁর পক্ষপাত ছিল। কুন্দকে তিনি অবহেলা করেছেন। নগেন্দ্র যখন সূর্যমুখীকে মনে করে ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছে, সরে আসছে কুন্দনন্দিনীর কাছ থেকে—যার জন্য সে পাগল হতে বসেছিল—লেখক তখন তার মনে এ দ্বন্দ্ব একবারও আনেননি, কুন্দর কী দোষ, তার কাছে কেন শুতে যাব না!

বঙ্কিম শ্রীশচন্দ্রকে বলেছিলেন, এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ—তাঁর উপন্যাসের নারীচরিত্রের মধ্যে একথার প্রমাণ আছে। কিন্তু বিধবাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেবার কথা তিনি ভাবতে পারেননি। মানুষের আসক্তিকে তিনি প্রচলিত ধর্ম দিয়ে বাঁধতে চেয়েছেন। তাঁর মনোরমা বলেছে, ধর্ম বিনা প্রেম নাই।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসেও বিধবা রোহিণীর মুখ থেকে পিপাসার জলপাত্র কেড়ে নিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। রোহিণী একাধিক পুরুষকে ভুলিয়ে থাকতে পারে, সুন্দরী সে, তার পক্ষে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সে বাঁচতে চেয়েছিল—'আমার নতুন যৌবন, নতুন সুখ, মারিও না'—বঙ্কিম তার আশা পূরণ করেননি। অবশ্য রোহিণীর প্রতি আসক্ত গোবিন্দলালের মুখে একবার ভালোবাসার তীব্রতা অনুভব করা গিয়েছিল। ভ্রমর যখন গোবিন্দলালকে রোহিণীর জন্য অনুযোগ করে প্রশ্ন করেছিল, 'ধর্ম নাই কি', উত্তরে গোবিন্দলাল তার মর্মতন্ত্র ছিঁড়ে নিয়ে বলেছিল, 'বুঝি আমার তাও নাই।'

প্রেমের জন্য, কামনার জন্য গোবিন্দলালের এই স্বীকারোক্তি আমাদের সামনে একটি সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়, তবে কি কোনো সর্বনাশ অপেক্ষা করে আছে?

কিন্তু কিছুই হল না, যে দীপ্তি ঝলসে উঠতে দেখলাম, তা থেকে কোনো আগুন জলে উঠল না। রোহিণীর জীবনতৃষ্ণা অতৃপ্ত থেকে গেল। প্রণয়পিপাসা ব্যর্থ করে দিয়ে লেখক গোবিন্দলালকে ভগবৎসাধনার নির্বীর্য নিরাপত্তায় পাঠিয়ে দিলেন। বিধবা কুন্দনন্দিনী, বিধবা রোহিণী উভয়ের প্রতিই বঙ্কিম শেষ পর্যন্ত বিরূপ।

সূর্যমুখীর চিঠি, তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণার মুন্সিয়ানাতেই রচিত বলে বুঝতে হবে।

ক্যাবলের পত্র

সুকুমার রায়

শ্রীমান বাঙ্কারাম উন্নতিশীলেষু—

তুমি যে আমার কোনো চিঠি পাওনি তার একটা কারণ এই যে আমি তোমায় চিঠি লিখিনি। কারণ ছাড়া যখন কার্য হয় না, তখন চিঠি না লেখবারও অবিশ্যি একটা কারণ থাকা উচিত। তবে কিনা, চিঠি না লেখাটাকে কার্য বলে ধরা যায় কিনা, সেটা একটু ভাবা দরকার। কিছু না করাটাও যদি একটা কাজ হয়, তবে তোমরা পৃথিবীতে কেজো মানুষ আর অকেজো মানুষ বলে যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছ সেটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে পড়ে। তোমরা করেছ বলছি এই-জন্যে যে ও দ্বন্দ্বটিকে আমি বরাবরই অস্বীকার করে এসেছি। আমার ধারণা এই যে, আমসত্ত্ব হলেই যেমন আমের আমসত্ত্ব, তেমনি মানুষ মানেই কাজের লোক। ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব এ দুটোর মধ্যে তফাতটা কেবল কৃ-ধাতু আর অস্ ধাতুর তফাত, আর ব্যাকরণ মতে সব ধাতুই ক্রিয়াবাচক। "আমি আছি" এই তত্ত্বটিকে ফুটিয়ে বলার নাম কার্য এবং প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই এই যে সে আপনাকে প্রকাশ করে, অর্থাৎ ফুটিয়ে বলে। জলকে ফোটাতে হলে তাকে আগুনে চড়িয়ে গরম করতে হয় কিন্তু তাই বলে ফুলকে ফোটাবার পক্ষে ও উপায়টি খুব প্রশস্ত নাও হতে পারে। জীবনটাকে কাজের মধ্যে নিয়ে যাঁরা চব্বিশঘণ্টা টানাটানি করেন, তাঁরা এই সহজ কথাটি বোঝেন না যে, ওতে করে জীবনটা ফুটে বেরোয় না, কেবল প্রাণটাই ছুটে বেরোয়।

উপনিষদ বলেছেন আত্মা অব্যয়, আর ব্যাকরণেও দেখতে পাই যে অব্যয়ের রূপ নেই। কিন্তু জীবনের একটা রূপ আছে, সেটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ। কেননা, জীবনের ক্রিয়া সমাপ্ত হলেই মৃত্যু এবং মৃত্যুটা আর যাই হোক সেটা জীবন নয়। অসমাপিকা হলেও ক্রিয়াপদটি অকর্মক নয়, কারণ ওর একটি উদ্দিষ্ট কর্ম আছে এবং সেই কর্মটিই হচ্ছে আর্ট। রোসো, আগেই তর্ক কর না। আর্ট কাকে বলছি সেইটে আগে বুঝবার চেষ্টা কর। তুমি বলতে চাচ্ছ যে বিজ্ঞান পলিটিক্স্ বা

ফিলসফি প্রভৃতি ভারি-ভারি কর্মগুলো কি কর্ম নয়? আমার মতে ওগুলো হচ্ছে ক্রিয়ার উপসর্গ মাত্র। "উপসর্গস্য যোগেন" ক্রিয়ার অর্থ যে ওলটপালট হয়ে যায়, এটা ব্যাকরণের বিজ্ঞতা এবং সংসারের অভিজ্ঞতা এই দুই তরফেরই সাক্ষী। জীবনের ক্রিয়ার উপর ওরা মোচড় দেয়, কিন্তু কোথাও আঁচড় দিতে পারে না। জীবনের উপর আঁচড় দেওয়া অর্থাৎ আপনার ছাপ এঁকে দেওয়া, অর্থাৎ এককথায় নতুন করে রূপ সৃষ্টি করা, এই জিনিসটাই হচ্ছে আর্ট অর্থাৎ ব্যর্গ্‌সঁ যাকে বলেছেন ক্রিয়েটিভ ইভোলিউশন।

আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে বাঙলা দেশে কেউ ব্যাকরণ পড়ে না এবং পড়তে জানে না। অর্থাৎ আমাদের দেশে রসবোধ ছাড়াও আর একটি বোধের বিশেষ অভাব রয়েছে, সেটা ঐতিহাসিক বোধ নয়, সেটা হচ্ছে মূঢ়বোধ। তার কারণ, আমাদের দেশে ইতিহাসের মালমশলা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন, মাল এবং মশলার পার্থক্য তাঁরা বোঝেন না। ব্যাকরণের মধ্যে তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মশলা দেখেন কিন্তু ইতিহাসের মাল দেখতে পান না। অথচ এটা অস্বীকার করবার জো নেই যে ও বস্তুটি হচ্ছে জাতীয় খোশখেয়ালের আস্ত একটি তোষাখানা। সকলেই জানি, ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সব চাইতে বড় তফাত হচ্ছে আকারের তফাত। অর্থাৎ তারা আত্মসর্বস্ব আর আমরা আত্মাসর্বস্ব; ওদের টাকা মাত্র ভরসা, আমাদের টাকা মাত্র ফরসা। ইংরেজের ব্যাকরণে ও আচরণে ফার্স্ট পারসন্ হচ্ছেন আমি এবং আমরা। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাকরণটাও বেদাঙ্গ, সুতরাং তাতে পরমার্থ না থাকুক পরমার্থতত্ত্বের কোনো অভাব নেই। তাই আমাদের প্রথম পুরুষ হচ্ছেন ইনি এঁরা তাঁরা। এর মধ্যে দীনতা থাকলেও কোনো রকম হীনতা নেই, কারণ আমি ব্যক্তিটিকে আমরা বরাবর উত্তমপুরুষ বলেই প্রচার করে আসছি। এইখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের আসল তফাত। ওরা অহঙ্কারী বলেই স্বার্থপর হয়ে থাকে, আর আমরা পরার্থপর বলেই অহঙ্কার করতে পারি।

অধ্যাপক কিউম্‌রে তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, মিথ্যেটাই হল সাহিত্যের আসল সৃষ্টি—কেন না, সত্যকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল এইটুকু না বলে তিনি আরো বলতে পারতেন যে, আর্টের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেটা সৃষ্টিছাড়া সেইটেকে সৃষ্টি করা। বিজ্ঞানের সব সত্যিই যে সত্যি এইটে দেখানোই হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যবসা। সত্যিটার যে কোনো সত্তা নেই আর মিথ্যেটা যে মিথ্যে নয়, এইটেই হচ্ছে দর্শনের সাক্ষী। কেবল আর্টের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সত্য-

মিথ্যার স্বত্বসাব্যস্তের কোনো বালাই নেই, কেন না সাহিত্য হচ্ছে সত্য-মিথ্যার সব্যসাচী। অর্থাৎ এক কথায় বিজ্ঞান না পড়েই বোঝা যায়, দর্শন পড়লেও বোঝা যায় না, আর সাহিত্যের বেলা বোঝাপড়ার কোনো প্রয়োজনই হয় না। একেই আমি বলেছিলুম, "সাহিত্যের অনাসক্তি।" দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটা কারও প্রাণে লাগেনি অর্থাৎ কানে লাগেনি। কেন না, আমাদের দেশের বয়ঃপ্রাপ্ত পণ্ডিতেরাও পড়াশোনা করেন না, তাঁরা কেবল লেখাপড়াই করে থাকেন। আর তাতে করে যে জিনিসটা গজায় সেটা আক্কেল নয়, সেটা হয় টাক নয় টিকি, অর্থাৎ হয় নাস্তিকতা নয় অদ্বৈতবাদ।

দেখ কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে পড়ল। কথা বলবার একটা মস্ত অসুবিধে এই যে বেশি কথা বললে কেউ শুনতে চায় না, আবার অল্পের মধ্যে সংকীর্ণ করে বললেও কেউ বুঝতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, অল্প কথার মধ্যে যতটা বাহুল্য থাকে, বেশি কথায় ততটা থাকে না। তাই সাহিত্যের একটা বড় কাজ হচ্ছে সামান্য কথাকে চালিয়ে-চালিয়ে অর্থাৎ এক্সারসাইজ করিয়ে, তার বাহুল্য নষ্ট করা। এক্ষেত্রে যাঁরা সংযমের উপদেশ দিতে আসেন, তাঁদের এই সহজ তত্ত্বটি বুঝিয়ে বলা একেবারেই অসম্ভব যে সাহিত্যের শব্দকে মেরে ভাষাকে জব্দ করা যায়, কিন্তু এ কাজটি সম্যকরূপে যমের উপযুক্ত হলেও তাকে সংযম বলা চলে না।

আমাদের গুরুমশাইরা বলেন যে, ভাষাটার বাড়াবাড়ি হলে তার গুরুত্ব থাকে না, কেন না তাতে করে ভাষাটা হয় ভাসা-ভাসা, অর্থাৎ হাল্কা। ও সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ভাষার মধ্যে যে জিনিসটা যথার্থই ভাসে, অর্থাৎ আপনাকে প্রকাশ করে, তাকে ডুবিয়ে দিলে যে ডোবা সাহিত্যের, অর্থাৎ বোবা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাকে শোভন বলা আর মূর্খ বলা একই কথা, কেন না সে "কিঞ্চিন্ন ভাষতে"। ওর মধ্যে আরেকটু কথা আছে, সেটা আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনলুম না। সে কথাটা এই যে, যে-টাকা বাজে সেই টাকাই চলে, যেটা বাজে না সেটা অচল; সুতরাং সাহিত্যের বাজারে বাজে কথাই চলে ভালো অর্থাৎ সেই কথাটাই চলে যার শব্দের জোর আছে। তুমি ভাবছ এটা নেহাত বাজে কথা। তা হওয়া খুবই সম্ভব, কেন না কথাটা সত্যি।

আমার একটি প্রবন্ধে আমি বলেছিলুম যে, সাহিত্যের উক্তির মধ্যে যুক্তি থাকলেই তার মুক্তি হয় না, তাতে সাহিত্যের বিস্তার হতে পারে কিন্তু তার

নিস্তার হওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি আমি এই কথাটির একটি চমৎকার উদাহরণ আবিষ্কার করেছি। "পল্লী সাহিত্য" বলে একটা কথা আমি অনেকদিন ধরে শুনে আসছি কিন্তু ও বস্তুটা যে কি তা আমার জানা নেই, অর্থাৎ কাল পর্যন্ত জানা ছিল না। সেইজন্য কাশীরাম পণ্ডিতের পল্লীসাহিত্য প্রবন্ধটি আমি আগ্রহ করে অর্থাৎ নিজের পয়সা খরচ করে কিনে এনেছিলুম। কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠ করে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, ওতে করে আসল যে কথাটি বলা হচ্ছে, সেটা ওর মধ্যে কোথাও বলা হয়নি। বলা কথাটির অর্থই হচ্ছে কিছু কথা বলা, কিন্তু কথার উপর অসামান্য বলপ্রয়োগ করলেই যে বলা কাজটি খুব ভালো করে সম্পন্ন হয়, আমার অন্তত এরকম বিশ্বাস নেই। সাহিত্যকে তাজা করবার জন্য পণ্ডিতমশাই যে রকম তেজ প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর প্রবন্ধটিকে পল্লীসাহিত্য না বলে মল্লী-সাহিত্য অর্থাৎ মেয়েলি কুস্তির সাহিত্য বলা উচিত ছিল, কেন না, ওর মধ্যে প্রতাপের চাইতে প্রলাপের মাত্রাই বেশি।

পণ্ডিতমশাই বলতে চান যে সাহিত্যটাকে শহরের বদ্ধবাতাসে আবদ্ধ না রেখে, তাকে "সহজ সুস্থ পল্লীজীবনের সংস্পর্শে আনা প্রয়োজন" অর্থাৎ তাকে ঘন-ঘন হাওয়া খেতে পাড়াগাঁয়ে পাঠানো দরকার। পণ্ডিতমশাই বলেন, "আমি মনে করি ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব।" প্রস্তাবের মাঝখানে "আমি মনে করি" বলে উত্তম পুরুষের অবতারণা করলেই যে প্রস্তাবটা উত্তম হয়ে পড়ে এরকম যুক্তির জন্য ন্যায়শাস্ত্রে অনেক উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা আছে। পণ্ডিতমশাই ভরসা করেন যে তাঁর ব্যবস্থামতো চললে পরে সাহিত্যের ভাব এবং ভাষা হৃষ্ট এবং পুষ্ট হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঠিক তার উল্টো। শহুরে সাহিত্যকে গ্রামের হাওয়া খাইয়ে গ্রাম-ফেড করে পুষতে গেলে যে জিনিসটা পুষ্টিলাভ করে, সেটা "গ্রামার" নয়, সেটা হচ্ছে গ্রাম্যতা।

ব্যর্গ্‌সঁ বলেছেন, মানুষের হাত পা কাটলেও সে বেঁচে ওঠে, কিন্তু তার মুড়োটা কেটে ফেললে আর সে বাঁচতে পারে না। মাথাটা যে ঘাড়ের উপর থাকে, ঘাড়ের পক্ষে তা আপত্তিকর সন্দেহ নেই। কিন্তু ও বস্তুটি যদি ওখানে না থাকত তা হলে তাতে করে দেহটা লঘু হলেও আপত্তিটা আরো গুরুতর হত। কতগুলো ইংরিজি পড়া মাথাকে বাংলা সাহিত্যের ঘাড়ের উপর বসতে দেখে, পণ্ডিতমশাই তার মুণ্ডপাত করতে চান, কিন্তু এটা তিনি ভেবে দেখেননি যে তাতে করে তাঁর নিজের প্রবন্ধকেই তিনি কবন্ধ করে ফেলেছেন। যা হোক প্রবন্ধের একটা গুণ আছে,

সেটা আমি অস্বীকার করিনে, সেটা এই যে, সাহিত্য বলতে পণ্ডিতমশাই কি বোঝেন সেটা না বুঝলেও, তিনি কি না বোঝেন সেটা ওতে খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায়।

আমার কোনো-কোনো সমালোচক বলেন যে, আমার ভাষাটা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার অর্থ বোধ হয় এই যে, আমার লেখা পড়লে তাঁদের প্রাণটা জলে কিন্তু জল হয় না। তাই শুনলুম সেদিন একজন আক্ষেপ করে বলেছেন যে আমার কথাগুলো নাকি "সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না।" বোঝা যে যায় না এই কথাটুকু একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্য, কেন না সংসারের কোনো বোঝাই আপনা থেকে যায় না, তাকে কষ্ট করে বয়ে নিতে হয় কিন্তু সহজ বুদ্ধি বস্তুটা যে কি, সেটা আমি আজ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারলুম না। আমার বরাবর ধারণা এই যে, বুদ্ধি জিনিসটাই সহজ অর্থাৎ ও বস্তুটি ভগবান যাকে দেন তাকে জন্মের সঙ্গেই দিয়ে দেন। এবিষয়ে যাঁদের কিছু কমতি আছে তাঁরা বোধহয় এইটে বোঝেন না যে ঐ অভাবদোষটা তাঁদের স্বভাবদোষ।

—ক্যাবল

ব্যঙ্গরসিকতার উৎকৃষ্ট গল্পকবিতা ছাড়াও সুকুমার রায় কতিপয় অসাধারণ মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। আশ্চর্য আধুনিকতা ও বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল সেই রচনাগুলির একটি পুনর্মুদ্রিত হল।

সুলতান রিজিয়া

কমলকুমার মজুমদার

অনেকেই জানেন অসামান্য সাহিত্য প্রতিভার সঙ্গে কমলকুমারের পাট্যপরিচালন প্রতিভাও (কমলকুমারের ভাষায় মোশন মাষ্টার) ছিল একান্তরূপেই মৌলিক। নাট্যচরিত্রের পোশাক, মেক-আপ, গান বা আলোকসম্পাত কী ধরন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে অতিসীমিত দু-একটি কথা। এই রচনাটি আসলে নোট। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখবেন ভেবেছিলেন। ইতিপূর্ব অপ্রকাশিত—সম্পাদক]

মাধবায় নমঃ! এই পালাখানিতে শুধুমাত্র মেয়েদের ভূমিকা আছে; মেয়েদের ভূমিকা লইয়া পালা লেখা ভারী কঠিন: আরও শক্ত কাজ তখনই মনে হয়, যখন আমরা লক্ষ্মীর পরীক্ষা-র কথা স্মরণ করি; এরূপ একখানি নাটক কোন সাহিত্যে নাই, এখানে মেয়েদের মানে বিয়ের মানসিকতা লইয়া যে হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কি বাস্তব তাহা কি সুন্দর! সেখানে কি বিস্ময়কর কথা তোমারও লেগেছে দাতার হাওয়া—এমন এক মুহূর্ত্ত নাই যেখানে কিছু না কিছু উদ্ঘাটিত হইতে আছে! এইরূপ এক নাটক আছে জানিলে স্বভাবতই পালা লিখিতে ভয় করে!

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে এখানে যে ঘটনা (ইতিহাসে) তাহা কোথাও নাই। এখানে আমার মনে হয়, চরিত্র বলিতে কিছু নাই, শুধু নাম আছে: রিজিয়া, সা তুরকান। আর কিছু মজার ঘটনা যাহা সবই হাত-গড়া!—তাই বলা হইয়াছে আষাঢ়ে (আমি ত্রৈলোক্যবাবুকে ভুলিতে পারি না) উদ্দেশ্য ইহার এইমাত্র যে মঞ্চে খানিকটা হৈ চৈ করা! কোন কোন ভারত বৎসল (দেশ-বৎসল নয়) যাহারা স্বার্থ অন্বেষী এই আঁতুড়ে পালাখানি লইয়া চিন্তিত হইয়াছেন! তাঁহাদের আমি ইতিহাস পড়িতে বলিব না, কোন ইতিহাসবেত্তা শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত যদি পরিচয় তাঁহাদের থাকে—তবে উহাদের নিকট জানিতে কহিব! আমার নিজের দিক হইতে এই প্রকাশ করি যে রাজনীতি বা রাজনৈতিক আদমী লইয়া তামাসা আমার বংশ মর্য্যাদাতে বাধে (অবশ্য ভারতে রাজনীতি মানে পোষাকী

ছ্যাচ্‌ড়ামী—যাহা বিনয় দত্ত মহাশয় সংখ্যার পর সংখ্যা লিখিয়া থাকেন : অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যদি এই উদ্ধৃতি করি, ইহা মাজারিণ সম্পর্কে ভোলতেয়র কথিত 'লু সিয়েকাল দ্য লুই কাংয়জ' ৪১ পৃ. "কারডিনেল সমস্ত প্রিন্সগণের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য এক ইতর ফন্দি খেলাইলেন যাহাকে লোকে পলিটিকস্ কহিল" —আমাদের দেশ এখনও নির্বোধ, তাই ইতরমীকে রাজনীতি কহে। স্বীকার করি এখানে বাজার চল অনেক শব্দ আছে যাহা মুচি মুদ্দোফরাস আদি সকলেই ব্যবহার করে, যাহার হাস্য উদ্রেক নিমিত্ত লাগ সই করা! আবার বলি আমি নির্ঘাৎ হিন্দু ইদানীং ভারতীয় সংজ্ঞায় সাম্প্রদায়িক, যে এবং আমি নিদারুণ কলকাতিয়া, আরও যে প্রমথ চৌধুরীর পর আমিও বাঙালী ছাড়া আর কিছু বুঝি না বিশ্বাস করি না! তাহাতে যদি ঘাট হয় হইবে।

এখানে সখীর দল কমপক্ষে তিনজন রাখার অর্থ এই হয় যে, যাহাতে সমস্ত পালাই উহাদের দেহ আন্দোলনে ও বিবিধ প্রকার গমন গতিতে একটি বিশেষত্ব লাভ করিবে মানে লীলা, ছন্দ, পরিগ্রহ করিবে। পাশ্চাত্তে যাহাকে করিওগ্রাফী কহে আমাদের দেশে ইহার খুব চল ছিল। শিশিরবাবুর স্বর বৈচিত্র্য আমাদের গর্ব্বের—এই বিষয় প্রখ্যাত নট শ্রীমান অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শক কাগজে অতীব বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছেন। এরূপ মনোজ্ঞ লেখা ক্বচিৎ দেখা যায়—আমরা (শিশিরকুমারের) তাঁহার অঙ্গ সঞ্চালনার কথা যখন ভাবি তখন অবাক হই—যেমন আলমগীরে, উদিপুরীর কথায়, তিনি যে কি চতুর কৌশলে দুতিনবার চক্ষু বুজাইয়া ঝাটিতি ডানভ্রূতে টঙ্কার দিতে কালেই দেহ হেলাইতেন তাহা, ও কি অদ্ভুত তরিখায় পদসঞ্চালনে পশ্চাদগমন করিতেন এই সংলাপ উচ্চারিয়া—'ও অভিমান'। অমনি উদিপুরী (শব্দ শোনা যাইত) এক পা ইতস্ততঃ করত প্রায় ফুট লাইটের কাছে! এমন অনেকের কথা অনেক সাটের (সিচুয়েশন) কথা মনে পড়ে, রাধিকানন্দবাবু অহীনবাবু দুর্গাবাবু নরেশবাবু প্রভাদেবী কঙ্কা দেবী—ইহাদের দক্ষতা আশ্চর্য্যের!

আমাদের দেশে যাত্রাকে এখন গান বলা হয়, আগেতে 'প্রকাশ করিয়া বল' মানেই গীত, এই গীতকে বিশেষ দেহ অভিব্যক্তি আড়া দিত—যেমন অতি উচ্চমার্গ গীতে ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক ওস্তাদ ফৈয়জ খান সাহেব অদ্ভুত অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা করিতেন 'চল বনাও বাতিয়া কাহে কা ঝুটি' (ভৈরবী) অথবা কাফিতে 'মরি বাং জিন···' এরূপ যাত্রা বা 'লেটো' আমি ছেলেবেলাতে দেখিয়াছি—। ইদানীং-

কার প্রগতিশীল নাট্যধারা যাহা বিশেষ কোন দলজাত—সোসাল কনটেন্ট যাহার সূত্র—তাহাতে শব্দের বৈচিত্র্য নাই, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।—(১৯৫৮!) 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটিকে যুক্ত অক্ষর বর্জিত করিতেছে, এবং আর এক প্রগতিবাদী কণ্ঠস্বর রেডিও মারফৎ শুনিলাম, ইনি পুরাতন নটদের বাচনভঙ্গী নকল ও তাহার বক্তব্য সবটাই ঝিঁঝিঁ হিহিতে পূর্ণ তখনকার বাচনভঙ্গীর কিছু বুঝিলাম না, এবং সেদিন সম্ভবত (হপ্তা তিনেক আগে) এক রেডিও নাটকে তিনিই নায়ক—শ্রোতারূপে মনে হইল নাটকের চরিত্র নিশ্চয় ভূত! হিঁ হিঁর ঘটা ভাবা যায় না। ইহারা কোন দলভুক্ত ছিলেন বলিয়াই খুব নাম ডাক হইয়াছে!

ইদানীংকার প্রায় নাট্য গোষ্ঠীই নাটকের গল্পই শুনাইয়া থাকে—মঞ্চস্থ করা হয় খুব কমই, অথচ আমাদের দেশের মত অভিনয় খুব কম লোকেই জানিত, প্রত্যেক রস বিবিধভাবে প্রকাশ করায় তাহার দারুণ পারদর্শিতা ছিল।

শুধু যে কষ্টীউম প্লেতে এমত নয়, ঐ লীলায়িত পদ্ধতি আমি চারুবাবুর 'গুণীন' ও প্রভাতবাবুর 'হর্নস অফ এ ডাইলেমা'তে ও অন্যান্য নাটকেও ব্যবহার করিয়াছি—তবে ইহা করিতে এক একটি নাটকের মহড়া অনেকদিন ধরিয়া, নিদেনপক্ষে ৩ মাস দেওয়া উচিত! তাহা ব্যতীত ঘটান সম্ভব হয় না। 'মাইম্' বলিতে শুধু হস্ত সঞ্চালন করা নয় সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহই খেলিবে। এবং সমগ্র মঞ্চ ব্যবহার রপ্ত করিতে হইবে।

রিভার্টিতে সবসময় সুলতান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে! তাই সুলতানই মান্য করিলাম! এবং সুলতান নিমিত্তই মানে জোরেই জাঁহাপনা খোদাবন্দ ইত্যাদি সম্বোধন করা হইয়াছে! দুর্ম্মতিনী, নরাধমী বা গুপ্তঘাতকিনী ইত্যাদি শব্দ মজা করিয়া লাগান হইয়াছে।

সাজ পোষাক! মাথাতে : টুপী ইহা কাগজের তৈয়ারী নিউ মার্কেট অঞ্চলে এক টাকা দামে কেনা যায়, তাহাতে কিছু চুমকী বসান উচিত। কেশ বিন্যাস শুধু : রিজিয়ার বেলায় মুখের দুই পাশ মানে ঝুলপী বহিয়া লহরদার একছড়া চুল দুইপাশেই প্রায় গলা পর্য্যন্ত নামিবে : অন্যদের টুপী হইতে চুল হঠাৎ বাহির হইয়া আসিবে; নাচনেওয়ালীর চুল পাতা কাটা, তিন কি চার পাতা, এক এক ধারে, প্রতি পাতায় বড় চুমকী বসান, টুপী বেশ পিছনে থাকিবে। গলায় : কলার জাতীয় গহনা বা অন্যকিছু—গায়ে : পাঞ্জাবী ঈষৎ ফিকে রঙীন চুমকী ও কাগজের পান ইত্যাদি মানান সই বসান, গলা হইতে প্রায় বুক ছাড়িয়া রঙীন কাগজের ইউ আকারে

কাটা রঙীন কাগজ ! গহনা : চুড়ী, রতনচুড়, জসম, হার (পাঞ্জাবীর সহিত আঁটা হইবে যাহাতে নীচু হইলে না ঝুলে) নিম্ন অঙ্গে : চুড়ীদার পাজামা বা স্ট্রেচ জীনস। এগুলিতে কিছু চুমকী বসান। পায়ে : মোজা, ফিকে গোলাপী এবং ঠিক ব্যালে জুতার আকারে চুমকী বসান বা রঙীন কাগজ যাহাতে জুতা বলিয়া মনে হয় !

মেক-আপ : আজকাল ফিল্মই মেক্-আপ হইয়াছে—তবু মেক্-আপ ম্যানকে বলিবে—যেন চোখের ভিতরে মানে পাতায় লাল টানা দেওয়া হয়—সাবধান ! লাল যেন সাধারণ সিঁদুর না হয় উহাতে পারা আছে ! নাকে হাইলাইট—নাসারন্ধ্র ও কান ইহাতে যেন কিছু বেস দেওয়া হয়, হাতের তালুতে কিছুটা লাল দেওয়া হয় ! সবই যেন চক ফিনিস্ হয় !

আলো : ফুটলাইট হইলে ভালো। টপ লাইট থাকিবে, যদি তাহা না হয় তাহলে দেখিবে স্টেজের দুই কোণ যেন সুস্পষ্ট আলো থাকে। ইদানীংকার আলো-ওয়ালারা এসব কথা ভাবে না—তাহারা হয়ত দুখানি আলো বসাইয়া চলিয়া যাইবে যাহাতে নট যদি এক কোণে যায় তাহাতে সে বেচারা অন্ধকারে পড়িবে !

চলন : পায়ের আঙুলে ভর দিয়া দ্রুতলয়ে আসা-যাওয়া। কখনও পুরা পাতা মেঝেতে জলদি টানে ! যখন যেমন প্রয়োজন। তৎসহ হাতের ভাঙন থাকিবে।

গল্প ক্রোড়পত্র

নাচ

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

অনন্ত আর দশরথ ডাকাত ইদানীং নামগান নিয়ে খুব মেতে উঠেছে। নেড়া-গোয়ালে, ভাণ্ডার ডিহি, বণ্ডুল, কামার কিতা, বাকলসা, ঈশান ডাঙ্গা ইত্যাদি গ্রামগুলি প্রায় পাশাপাশি। প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্তে অনন্ত আর তার দলবল এই গ্রামগুলি নামগান করতে করতে পরিক্রমা করে, আঠার-উনিশ জনের একটি দল।

চৈত্র প্রায় শেষ হয়ে এল। আর দিন সাতেক বাকী। অনন্তের নিজের গ্রাম ভাণ্ডার ডিহির পশ্চিমে ঈশান ডাঙ্গা। আজই এ বছরের শেষ কীর্তন। আর কিছুক্ষণ পরে অনন্ত আর দশরথ সাত দিনের জন্য ঈশান ডাঙ্গার বাবা ভৈরবনাথের গাজনে শ্মশান-সন্ন্যাস নিয়ে ভক্তা হবে। এ তাদের কৌলিক আচার। তার বাবা, কর্তাবাবা, পূর্ব পূর্বপুরুষের প্রত্যেকেই এই আচার মেনে এসেছে। এটা নিয়ম। মানতে হয়। নাম কীর্তন যা কিছু, আবার আসছে বছর, পয়লা বৈশাখ থেকে।

বাকলসা, বণ্ডুলের পথে মাস দুই হল পিচ হয়েছে। মাঠের কোল ভেঙ্গে উঠলেই এখন বাঁধান সরান। দু'পা এগুলেই ক্যানেল পুল। শেষ চৈত্রের ভোর ভোর আলোয় গোটা দলটা মাঠ ভেঙ্গে এসে ক্যানেল পুলে উঠল। এই মাত্র চাপ চাপ অন্ধকার বুকে পিঠে নিয়ে রাত্রির শেষ প্রহর থেকে উঁচু নীচু প্রান্তর ভুস্ করে মাথা তুলেছে। চারপাশে ভোরের হাল্কা কুয়াশা। ছাই ছাই রঙ। কীর্তনীয়া দলের পায়ে পায়ে উড়ে আসা লাল ধুলো তাতে গৈরিক ছোপ ধরাচ্ছে। হাওয়ায় হাওয়ায় যেন মহাপ্রভুর উত্তরীয় দুলছে।

দশরথ সামনে আর দলের একদম পেছনে অনন্ত। মাঝখানে ষোল সতের জন। অনন্ত কখনও এগিয়ে কখনও পিছিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে হাঁক দিচ্ছে— দাওগো ধ্বনি দাও—জয় বাবা ঈশানেশ্বর ভৈরবনাথ মহাদেব, জয় রাধা মাধব। গাজনেশ্বর মহাদেব বাবা ভৈরবনাথ অনন্তের নিজের গ্রাম ঈশান ডাঙ্গার তো

বটেই, তা ছাড়া এ অঞ্চলেরও গ্রামদেবতা। সব কাজের আগে স্মরণ করতে হয়, এটাই রীতি। তা ছাড়া সে ডাকাতি-মারদাঙ্গা যাই করুক ঈশান ডাঙ্গার বাবা ভৈরবনাথের গাজনে সে শ্মশান-সন্ন্যাসী। তারা বংশানুক্রমিক ভাবে গাজনের শেষ দিন 'কলকে পাতা'র নাচ নাচে। নরদেহ থেকে মুণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করে খড়ো নদীর এলার ঘাটের বালি-কাদায় তাকে পুঁতে রাখতে হয়। চৈত্র সংক্রান্তির ভোরে শ্মশান জাগিয়ে তাকে তুলে এনে গাজন তলায় নাচতে হয়। আগে অনেক দেবোত্তর এর জন্য ছিল। এখন ভাগ হতে হতে আঠার বিঘাতে এসে ঠেকেছে। অজয়ের উত্তরে অনন্তের মত এতদিনের পুরানো শ্মশান-সন্ন্যাসীর বংশ আর নেই। তাই সর্বকাজে বাবা ভৈরবনাথের নাম জিভে এসে যায়। রাধা মাধব বলতে গিয়েও সেই নাম একবার উচ্চারণ না করলে মন শান্ত হয় না। বাবা ভৈরবনাথ যে রক্তে।

গোটা দলটা ক্যানেল পুলের ওপরে এসে উঠল। পোলের দু'পাশে সিমেন্টের বাঁধান চাতাল। এই ভোরে সেই চাতালের ওপর বসে এ অঞ্চলের ইদানীং কালের সব চেয়ে ফুলে-ফেপে ওঠা ধনী খেপু ঘটক নিমডালে দাঁতন করছিল। নীচে চাতালের গায়ে হেলান দিয়ে তার নতুন কেনা স্কুটারটা দাঁড় করান।

কীর্তন দলের সবার পেছনে ছিল অনন্ত। গোটা দলের তদারকি করতে করতে সে একটু পিছিয়ে হাঁটছিল। খেপু হঠাৎ তড়াক করে চাতাল থেকে লাফিয়ে নেমে অনন্তের হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে বলল—দাঁড়ারে অন্তা কথা আছে।

অনন্ত রীতিমত বিস্মিত হয়ে খেপুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—ঠাকুর এত দূরে এ ভাবে দাঁতন কাঠি নিয়ে?—সড্ডে কড়ুরির দিকে যাচ্ছি। নাতিটোর বড্ড বাড়াবাড়িরে! তুই আমার স্কুটারের পেছনে বোস। যেতে যেতে কথা হবে।

অনন্তের বুঝতে কষ্ট হয় না। সড্ডে কড়ুরি মানে হ'ল সারদা গণৎকার। আরও মাইল তিনের পথ। রাত্রির শেষ প্রহরে সারদা গণৎকার ধ্যানস্থ হয়ে আসনে বসেন। মাত্র সাধক। আসন ছেড়ে ওঠার মুখে যাকে যা বলেন একেবারে অভ্রান্ত।

আজকাল খেপু বাবুমানুষ। সদরের বাবুরা তার বাড়ীতে এবেলা-ওবেলা যাতায়াত করে। একটা ধানের কল, সত্তর বিঘা বাকুলি জমির মালিক। বাবা ভৈরবনাথ শিবের সেবাইয়েত। একশ বিঘের ওপর দেবোত্তর। খেপুর এখন

প্রবল প্রতাপ। আসছে বছর ভোটে দাঁড়াবে। খুব দায়ে না ঠেকলে খেপু এখন আর বড় কোথাও যায় না। তার কাছেই সবাই আসে।

নাতি মানে মেয়ের ঘরের। সব মরে হেজে ঐ একমাত্র সলতে। লোকে বলে খেপুর গলার মাদুলী। তার অসুখ-বিসুখ মানে, খেপুর বিশ্ব-সংসার অন্ধকার। বোধ হয় কোন খারাপ তার এসেছে। নইলে এত পথ খেপুকে এই সকালে নিয়ে যায় কার সাধ্য। তবুও অনন্ত বলল—ঠাকুর সঙ্গে যাই কি করে? ফিরে গিয়েই যে সন্ন্যাস নিতে হবে, গাজনের আর ছ'দিন বাকী।

খেপু রাগল না। বলল—গাজনেশ্বর শিবতো আমাদেরই। তার সন্ন্যাসের ভালোমন্দের দায় আমার। অনেক কথা আছে, যেতে যেতে হবে।

অনন্ত কি আর বলবে! খেপুর জন্য বরং তার একটু মমতাই হ'ল। সব গিয়ে ঐ একটাই মাত্র। তাও মেয়ের ঘরের। সাহেবগঞ্জের দিকে রিসৌরে বাবা মায়ের কাছে থাকে। আট দশ বছর বয়স। ভুগতে ভুগতে বড় হচ্ছে।

খেপুর সঙ্গে দু'চার পা এগুতে এগুতে অনন্ত বলল—ঠাকুর তা হলে ওকে আনা করান। ইখানে ঘরের ছামুতে সদর। কত বড় বড় ডাক্তার।

—আর ডাক্তার! পরের গোয়ালের গরু আর মেয়ের ঘরের নাতি জড়িয়ে ধরলেও ছাড়িয়ে নেয়রে!

অনন্ত উত্তর দেয় না। একা একা বলতে বলতে খেপু পথ চলে—কার জন্যরে কার জন্য। এই জমি-জমা ধানকল সবই তো ঐ নাতিটার মুখ চেয়ে, আর সেই সুখই বারমাস ত্রিশদিন যদি শয্যা নিয়ে থাকে, তা হলে আর কি—

অনন্তের কাছে খেপুর এদিকটা অজানা নয়। নাতির প্রসঙ্গ একবার এলে খেপু দু'চার কথা বলতে বলতে শেষটায় চোখের জল ফেলতে শুরু করে। এখানে চুপ করে না থাকলে আরও বিপদ। তাই প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য আলের পথ দিয়ে বাঁধান সরানে আসতে আসতে অনন্ত বলে—ঠাকুর কি যেন কথা আছে বলছিলেন?

নাতির প্রসঙ্গ আসায় খেপুর আসল কথাতে হুঁস্ ছিল না। এবার চমকে উঠে বলে—দ্যাক্, নাতির ব্যাপারটা হ'লগে ঘরের কথা। বাইরের কথাটাও খুবই জরুরীরে। তুই এমন ভাবে ডাকাতি ছেড়ে দিলে যে আমি না খেয়ে মারা যাই। তোর মাল বেঁচেই তো আমার অন্নরে—'

—সে কি ঠাকুর! এ পরশে এত পয়সা আর কার! আমার ছামুতে তো বিশ খানা গ্রামের মাথা যে দাঁড়িয়ে গো!

—দ্যাক্ অন্তা, ক্যানেলের গেট বন্ধ করে দে—দেখবি মাঠের বুক ঠন্‌ঠনে। আমারও সেই হাল। তোর মাল বেঁচেই তো আমার যা কিছু। জল কাটলে দু'ভাগ হয় না। তুই আমি কি পৃথকরে—

কি উত্তর দেবে খেপু ভেবে পায় না। আলের পথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে—ঠাকুর আপনার ছি'চরণে অজ্ঞাত কিছুই নেই। আমার দু'হাতে রক্তের ছাপ। ঘাটের সানে সারা জীবন ঘষলেও তা আর উঠবে না। দয়াল গুরু দীক্ষার কালে বলেছেন—যো হুয়া সো হুয়া, আভি সামাল যাও।

খেপু রীতিমত বিরক্ত হয়ে বলে—দূর ছাই তোর শালো গুরুর মুখে মারি লাথি, যত্ত সব জঞ্জাল।

হঠাৎ কি হ'ল ঠিক বোঝা গেল না। প্রবল চীৎকার করে অনন্ত মুহূর্তের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার সাড়ে ছ'ফুটের মত দীর্ঘ দেহ টান টান হয়ে গেল। ছ'পুরুষ ধরে তারা ঈশান ডাঙ্গার গাজনেশ্বর শিব বাবা ভৈরবনাথের শ্মশান-সন্ন্যাসীর বংশ। ডাকাতি তাদের পুরুষানুক্রমিক পেশা। তার কর্তাবাবার যাবজ্জীবন মেয়াদ হয়েছিল। মাতামহ এখনও ফেরার। পাথর খোদাই মুখে বংশপরম্পরায় বাহিত প্রাচীন হিংস্রতার ঢেউ মুহূর্তে খেলে গেল। তার হাতের পেশী রাঢ়ের রোদে পোড়া মাটির মত ঠন্‌ঠনে। হঠাৎ সেই পাথুরে হাত খেপুর গলার কাছটায় প্রবলভাবে চেপে ধরে সে বলে উঠল—এক সেকেণ্ড লাগে ঠাকুর এক সেকেণ্ড। তিলেকে তোমার ঐ মুণ্ডু ছিঁড়ে ছুড়ে ফেলে দিতাম। নেহাৎ বামুন বলে রেয়াৎ পেলে।

অনন্ত মাত্র দু'চার সেকেণ্ডই দু'হাত দিয়ে খেপুর গলার কাছটা তার কঠিন দু'হাতে চেপে ধরেছিল। তাতেই খেপুর সারা দেহের রক্ত জমাট বেঁধে চোখ মুখ দিয়ে প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে আসে আর কি। চীৎকার করতে গিয়েও তার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হ'ল না।

দু'চার সেকেণ্ডই মাত্র। অনন্ত খেপুর গলা ছেড়ে দিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে দু'চার বার নিঃশ্বাস নিয়ে গভীর ঘৃণায় মাটিতে এক মুখ থুথু ছিটিয়ে বলল—ছিঃ এনারাই আবার ভোটে দাঁড়াবেন। দেশের মাথা হবেন। তারপর খেপুর চোখে কঠিন চোখ রেখে কিছুটা ঘৃণা, কিছুটা অবজ্ঞা প্রকাশ করে একসময়

তাকে মাঠের মধ্যে একলা ফেলে রেখে জয় বাবা ভৈরবনাথ মহাদেব—জয় রাধা গোবিন্দ ধ্বনি দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে অনন্ত মাঠের উল্টো দিকে হাঁটতে সুরু করল। তার নাম অনন্ত ডাকাত। এই ক'দিন আগেও মোড়ল গাঁ-তে ভোর রাতে খুন করে নিরীহ ভাবুকের মত যাত্রায় শোনা পালাগানের কলি ভাজতে ভাজতে ভোরবেলা মাঠ ভেঙ্গে বাড়ী ফিরেছে। আর এতো তুচ্ছ খেপা ঘটক। একটু নাড়া দেওয়া মাত্র।

খেপু অপলক ভয়ার্ত চোখে মাঠের প্রান্তে মিলিয়ে যাওয়া অনন্তের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আপন মনেই বলল—শালো বরাহনন্দন।

খেপা ঘটকের গলায় হাত! তোর মরণ নাচন সামনেরে। নাভিতে বড়শি গিঁথে তোকে নাচাব।

খেপুর এটা যথার্থ অহংকার। আজ অবধি অনেককেই সে মরণ নাচ নাচিয়েছে। তবুও এই মুহূর্তে আবার নাতিটার কথা ঘুরে ফিরে মনে এল। প্রায় বছর দশেক হ'ল। শিবরাত্রির সলতে। এই বাঁচে এই মরে। কচু পাতায় এক ফোঁটা জলের মত টলমল করছে। আজ আবার সারদা গণৎকারের কাছে যাবার পথে বাঁধা! মনটা খিঁচিয়ে যায়।

খেপুর পকেটে একটা প্লাস্টিকের খাপে সব সময়ই নাতির একটা ছবি থাকে। ধারে কাছে কেউ না থাকলে গভীর দুঃখ কিম্বা আনন্দের মুহূর্তে পকেট থেকে ছবিটা বার করে সে একা একা কথা বলে। আজও এই দুঃখের ঘটনায় পকেট থেকে ছবিটা বার করে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তার এত বড় অপমান এ তল্লাটে আজ পর্যন্ত কেউ কল্পনাও করতে পারে না। স্কুটারটা সামনে দাঁড় করিয়ে আলের ওপর খানিক সময় বসে থাকল। অস্ফুট স্বরে বার দুই বলল—দাদু ভাইরে তোর লেগেই বেঁচে আছি। কথাটা আংশিক সত্য। হোক ডাকাতির মাল বেচে তার আজ বাড়-বাড়ন্ত। তবুও টাকা পয়সার আমদানী হলেই নাতিটার মুখ মনে পড়ে। সব গিয়ে থুয়ে শেষ সলতে।

২

আলের বাঁকের মুখে একটা খেজুর গাছের চারা, মাটি ছাড়িয়েও তিন চার হাত ওপরে উঠেছে। পাতিয়ে যাওয়া গাছ। পাতাগুলি চার পাশে ছড়িয়ে যাওয়ায়

একটা ঝোপ ঝোপ ভাব। সবে ভোর হচ্ছে। এ সময়টায় এদিক ওদিক গাছ গাছালির একটু আড়াল অনেকেই এক ঘটি জল দিয়ে বসে পড়ার জন্য খোঁজে।

খেপু গাছের আড়ালটা কাটিয়ে দু'পা হাঁটতে না হাঁটতেই খেজুর পাতার পেছন থেকে ভুস্ করে বেড়িয়ে এ'ল ভূষণ। খেপুর কিষান ভূষণ দুলে।

মুহূর্তেই খেপুর চোখে মুখে একটা কালো ছায়া দুলে যায়। দু'চার সেকেণ্ড মাত্র। নিজেকে সামলে নিয়ে বিস্ময়ের সুরে বলে—

—ভূষণে এই বিহানে তু ইদিকে!

—হাটগোবিন্দপুর যেছিলাম ছাগল বিচার দাম আদায়ে।

—তা হোক গা, কিন্তু ইখানে কি দেখলি বলতো? দেখ ভূষণে তোর নাকে বাঁধা দড়ি আমার হাতের মুঠোয়। যা দেখলি দেখলি, পাঁচ কান হয়েছে কি নির্ঘাৎ মরণ নাচ কপালে।

নুন মাখা কেঁচোর মত কুঁকড়ে গিয়ে ভূষণ বলে—ছিঃ ছিঃ বাবু ইটো কি কথা গো, আপনি হলেন গিয়ে মুনিব—মস্তের দেবতা, আপনার চরণ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

খেপু তবুও নিশ্চিন্ত হয় না। এই ভোর বেলার কি আখ কি পাট বেড়ে ওঠার মাঠ বড় বিশ্বাসঘাতক, চারদিক সুনসান। কেউ মনে হয় কোথাও নেই। কিন্তু থাকে। গত বছরই দুলেদের একটা মেয়ের সঙ্গে আখ বাড়িতে একটু আধটু লুটুস্ পুটুস্ করতে গিয়ে ইজ্জত যায় যায় হয়েছিল।

খেপু শেষটায় ভূষণকে মিনতি করে বলে—দেখতো ভূষণে চার পাশটায় একটু নজর বুলিয়ে দেখতো বলাতো যায় না—

ভূষণ সান্ত্বনা দিয়ে বলে—কি যে বলেন বাবু! ডাকাতের হাতে হেনস্থা তায় আবার মান অপমান। সমানে সমানে হলে না হয় কথা হত।

খেপু রীতিমত বিরক্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে উঠে, বলে—ধুত্তোর তোর চাষার বুদ্ধি। সবার ওপরে মাথা হয়ে আছি। সেটা নাড়া খেলে কি আর ইজ্জত থাকেরে? ধর যদি ভোটে দাঁড়াই।

কথাটা সত্য। ভূষণ সায় দেয়। তা ছাড়া মুনিবের যা ধারণা তার বাইরে কিষাণ-মাহিন্দারদের আলাদা মত থাকতে নেই। থাকলেই দুঃখ। তবুও সমাধানের পথ বাতলে দিয়ে বলে—অত ভাবনার কি আছে গ'? দু'চারটে চার্জ বানিয়ে অনন্তকেই আবার হাজতে পুরে ছাখনা, সদরে আপনার হাত কত।

কথাটা খেপুর মনে ধরে। সত্যিতো ডাকাত ডাকাতি ছেড়ে দিলে তাকে আর জেলের বাইরে রেখে লাভ কি?—মাষ্টারের মাষ্টারী, চাষার চাষ-আবাদ, ডাক্তারের ডাক্তারি, ডাকাতের ডাকাতি—যার যা কাজ। তার উল্টোটা হলে কি আর সমাজ থাকে? তবুও মুখে কিছু না বলে খেপু আপন মনে চলতে শুরু করে। ভূষণ পেছন পেছন হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতেই আনমনে একসময় বলে—মনটা ভালো নেইরে ভূষণে নাতিটার এখন তখন। নইলে শালোকে দেখতিস্—

বাকলসার শেষ প্রান্তে একটা কাদোর। চৈত্রের শেষ। এখন জল নেই। বালি আর বালি। গভীর। অনেকটা ঢালে নেমে আবার উঠতে হয়। খেপু আর ভূষণ কাদোরের মাঝ বরাবর যেতেই তাকিয়ে দেখে প্রায় মুখোমুখি থানার মেজবাবু বালির ওপর দিয়ে সাইকেল টেনে টেনে আসছেন।

হঠাৎ চোখে চোখাচোখি হতেই খেপু বাজখাই গলায় ভূষণকে ধমকে ওঠে—ধর ব্যাটা! দেখছিস্ স্যার সাইকেল হ্যাটকাচ্ছেন আর উনি লবাবপুত্তুর হেলে-দুলে হাটছেন।

ভূষণ ছুটে গিয়ে বালিতে আধ-বসা সাইকেলকে শূন্যে দু'হাতে তুলে ধরে। খেপু দ্রুত পায়ে সামনে এগিয়ে এসে বিগলিত হয়ে হাত জোড় করে বলে—প্রাতঃ পন্নাম্। কি ভাগ্য কি ভাগ্য! সকালবেলায় রাজপুরুষ-দর্শন। —তারপর ইদিকে?

—গাজন এ'ল যে। গতবার মানুষের মাথা নিয়ে হাঙ্গামা হুজ্জুত হবার পর এবার একটু আগে থেকেই নজর দিচ্ছি। কথাটা সত্য। ঈশান ডাঙ্গার গাজনে কলকে পাতার নাচ হয়। নাচ গোটা জেলার উত্তর-পশ্চিমে সীতেহাটি-নৈহাটির কালরুদ্রতলা থেকে পুবে নবদ্বীপের পোড়ামাতলা। উত্তরে কুর্মুন ঈশান ডাঙ্গা থেকে দক্ষিণে অজয় ময়ূরাক্ষী পার হয়ে কোটাসুর শিবগ্রাম রাতসা অবধি প্রায় সর্বত্রই শিব কি ধর্ম গাজনে মরার মাথা নিয়ে নৃত্য করার প্রথা আছে। আজকাল নদীর চড়ায় পুঁতে দেওয়া মরার বড় অভাব। তা ছাড়া বর্দ্ধমানের গ্রামে গ্রামে গ্রীষ্মের শুরুতে যে কলেরা বসন্তের মড়ক ছিল এখন তা' প্রায় ইতিহাসের মত। গতবার হঠাৎ এখানে হাওয়ায় হাওয়ায় গুজব রটে যায় যে মুসলমানদের কবরখানা থেকে মরা তুলে আনা হয়েছে। এবার তাই আগাম সতর্কতা।

তবুও ঈশান ডাঙ্গার গাজনে দু'টো একটা মরার মাথা এসে যায়। অনন্ত জানে আর কিছু না হোক ফরাক্কার তালতলার ঘাটতো আছে। এখনও ওদিককার বিহারা বারমনি ইত্যাদি গ্রামের কোন কোন সম্প্রদায় দাহ করে না। মৃতদেহ

গঙ্গার বুকে ভাসিয়ে দেয়। প্রাচীন রীতি প্রায় মুছে যাবার মুখে। তবুও অনন্ত বিশ্বাস করে—বাবার গাজন বাবাই দেখবে।

থানার মেজকর্তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে খেপু আবার ফিরে চলে। এক-সময় হাতজোড় করে বলে—স্যার এতটাই এলেন একবার যদি অধীনের বাড়িতে—

মেজকর্তা একমুখ হাসেন। সেই হাসির প্রসন্নতা মিলিয়ে যেতে না যেতেই বলেন—সে না হয় একদিন হবে, কিন্তু আপনার হাত যে গত দু'মাস আর উপুড় হ'ল না।

খেপু কিছু বলতে গিয়েও ভূষণের দিকে তাকিয়ে থেমে যায়। তারপর ধমক দিয়ে বলে—হা করে দেখছিস কি—যা দৌড়ে বাড়ী যা, মাকে গিয়ে বল মেজবাবু পায়ের ধুলো দেবেন।

ভূষণেরও বয়স হয়েছে। বাবুদের সঙ্গে সদাসর্বদা থাকতে হয়। কিন্তু সব কথা শুনতে নেই। শুনলেও বুঝতে নেই। বুঝলেও বলতে নেই। সে তরতর করে বেশ খানিকটা এগিয়ে যায়।

খেপু উস্মার সঙ্গেই বলে—উপুড় আর চিং কি? অনন্ত এখন শাবল ভেঙে করতাল বানাচ্ছে। আমার হাতে খরা।

মেজবাবু অনন্তের খবর রাখেন। বললেন—না না সে এখন অন্য-মানুষ। থানাতে গিয়েও আমাদের নামগান শুনিয়ে এসেছে।

তারপর খেপুকে লক্ষ্য করেই বলল—অনন্ত না থাক বসন্ত আছে। ছোট বড় সিঁদ কাঠির মালগুলোতো আর হাওয়ায় উড়ছেনা।

খেপুর আত্মমর্যাদায় কথাটা আঘাত করে। তবুও বিনয়ের সঙ্গে বলে—আমারও তো একটা সম্মান আছে স্যার। ও সব হাত গন্ধ মাল সব সামন্তের গদীতে।

খবরটা মেজবাবুর কাছে নতুন। মুহূর্তের জন্য মুখটা উজ্জ্বল হয়। পুরানো কথার খেই ধরেই বলে—সে তো বুঝলাম। কিন্তু কাটোয়া-বর্দ্ধমানের ছোট লাইনের? কর্জনা গেটের ওয়াগনের মাল?

খেপু প্রায় নাকে খত দেবার ভঙ্গিতে বলে—বিশ্বাস করুন স্যার, খবরটা এসেছে গতকাল। আসলে অনন্ত পথে বসাল। সেই তো সব খবর দিত।

কাদোর পার হয়ে মেজবাবু সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখতে যাবে, খেপু

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় গলবস্ত্র হয়ে আর্তনাদ করে উঠে বলে—সে কি স্যর ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে……।

মেজবাবুর নাম সীতানাথ চক্রবর্তী। ব্রাহ্মণ শব্দটির ওপর তারও একটু দুর্বলতা আছে। খেপুর দিকে মুখ ফিরিয়ে যথার্থ লজ্জিত হয়ে বলল—আর বলবেন না ভাই, এক্ষুনি আবার গঞ্জের পুলের দিকে ছুটতে হবে, ফটোগ্রাফার আনতে।

—মানে?

—মানে আর কি! বাকলসার বাদাড়ে-দীঘিটার ধারে একটা মার্ডার কেস্। ধড় মাথা আলাদা। সাত পুরুষে কেউ যেন আর পুলিশের চাকরী না করে।

সকালের অপমান খেপু কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সীতানাথ দারোগা সাইকেলে উঠি উঠি করতে করতেই খেপু বলে—আসলে কি জানেন এসব অনন্তেরই কাজ। একটু ভাববেন স্যর। দেখবেন পুরানো ঝগড়া থেকে ক্লু এসে যাবে।

সীতানাথ এ কথার গুরুত্ব দিল না। তবুও সে মিলিয়ে যেতে না যেতে খেপুর মুখে চোখে আত্মপ্রসাদের ছায়া পড়ে। আপন মনেই বলে—এইবার শালো তোকে এমন নাচান নাচাবো যে একেবারে ছিড়িক ছিড়িক নাচবি। খ্যাচা-কলের কারেণ্ট (গ্রাম বাংলায় ওভারহেডের হাই পাওয়ার থেকে বাঁশের লগা দিয়ে তারের আংটা ঝুলিয়ে চুরি করে কারেণ্ট নেওয়ার কৌশলের নাম খ্যাচাকল)।

কি নাচ নাচাবে, তার তাল লয় মাত্রা এখন খেপুর হাতের মুঠোয়। তবুও অভিজাত কুলীন সাপ ছোবল মেরে যেমন কিছুটা মন্থর হয়ে চলে খেপুও কিছুটা সময় তার স্কুটারটার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আর জীবনের সব চেয়ে জরুরী দিক হল তার নাতি, তার জন্যই সারদা গণৎ-করের কাছে যাওয়াটা ছিল খুব জরুরী। এই নাতির জন্যই বেঁচে থাকা। কিন্তু এই মুহূর্তে তার চাইতেও অনেক দরকারী হল, দ্রুত স্কুটার চালিয়ে বাদাড়ে-দীঘির পাড় থেকে খুন হয়ে যাওয়া হতভাগ্যের মাথাটা তুলে আনা।

ভূষণের দিকে মুখ ফিরিয়ে খেপু বলে—তুই ঘর যা। আমি একটা জরুরী কাজ সেরে ফিরছি।

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে খেপু ঘটক তার স্কুটারের মুখ বাকলসার বাদাড়ে-দীঘির দিকে দ্রুত ঘুরিয়ে দেয়। এখন অনেক কাজ—একটা থলে হলে ভাল হত। যোগাড় করতে করতে দেরী হয়ে যাবে। রোদ উঠতে উঠতে লোক

জানাজানি। বরং এ সময় বেড়ে ওঠা আখের গোড়াগুলি শেয়ালে কামড়ায় বলে অনেকে চটের ঘের করে দশ বারটা গাছ কে গোল করে বাঁধে। তার একটা চট যেতে যেতে দেখে শুনে খুলে নিতে হবে। ষড়হীন মুণ্ডটাকে তাতে জড়িয়ে নিয়ে অনন্তের জিম্মায় জমা করে দিয়ে আসতে হবে।

তারপর চৈত্র সংক্রান্তির ভোরে বাবা ভৈরবনাথের মন্দির চাতালে কলকে পাতার নাচ হয়ে যাবার পর অনন্তকে পুলিশের গাড়ীতে চালান করে দিয়ে, নিজে জামিনে দাঁড়িয়ে আবার তাকে ছড়িয়ে আনা—ব্যাস নাভিতে বড়শি গাঁথা হয়ে গেল, এরপর যত খুশী সুতা ছাড়ো আর গোটাও। আরে তুই হলিগে কোমর ভাঙ্গা দাগী আসামী তার আবার কেত্তনের বাহার কিরে। খেপু স্টুটারের স্পীড বাড়ায় আর আপন মনে যাত্রায় শোনা গানের কলি আওড়ায় আহা কি গানই না পালাদাররা বেঁধেছে—"ছিঃ ছিঃ একি কুব্জা গো / ছেড়া কানি হয় কি পায়ের মোজাগো। আহা কুব্জার রূপের বাহার দেখ / চিৎ করলে হয় নৌকো, উপুড় করলে সাঁকো।" স্টুটার জোরে ছোটায়। আপন মনেই বিড় বিড় করে বলে—হারামজাদা। ব্যাটা বরাহনন্দন। তোকে এবেলা নৌকো আর ওবেলা সাঁকো বানাব। তোকে দিয়েই আমার এপার ওপার।

খেপু তবুও গানটা থামিয়ে দিল। অন্যসময় হলে এ রকম অবস্থায় তার মুখে চোখে উল্লাসের স্পষ্ট ছায়া পড়ত। কিন্তু আজ মনটা সত্যিই বিষণ্ণ। সারদা গণৎকারের কাছে যাবার কথা ছিল আরও অনেক আগে। অথচ হ'ল না। এদিকে নাতিটার এখন তখন অবস্থা। স্টুটারে চলতে খেপুর পরলোকগত পিতৃদেবের উপদেশবাণী মনে পড়ে। তিনি বলতেন—বাপুহে জীবন হল রেললাইনের মত। শেষ নেই। শুধু বসে বসে ট্রেনের সিগ্‌ন্যাল দাও। কোনটা মেল আর কোনটা প্যাসেঞ্জার ঠিক করে নিতে পারলেই হল। খেপু আপন মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে দিতে ভাবে : এখন সে মেল ট্রেন পাস করাচ্ছে। সারদা গণৎকারও আর একটা মেল, তবু না হয় পরেই সেটা ছাড়বে।

৩

ঈশান ডাঙ্গার মন্দির তলায় মেলা বসে। বাবা ভৈরবনাথের চৈত্র গাজনের মেলা। মন্দির তলা থেকে আরও মাইল খানেক উত্তরে গ্রামের শেষ প্রান্তে এলার ঘাটের মহাশ্মশান। ঘাটের নীচে খড়ো নদী। রাঢ়ের নদী। সারা বছর এলিয়ে

থাকে। বর্ষায় সিংহ বাহিনী। এক সময় চার পাশে চিতা জলত। আজকাল পথঘাট ভালো হয়ে যাচ্ছে। চারদিকেই প্রায় বাঁধান সরান। বিশ পঞ্চাশ টাকা যোগাড় করতে পারলেই লোকে নাদনঘাট কি কাটোয়ার গঙ্গায় যায়। আহা গঙ্গা যাত্রা—তার মাহাত্ম্য কত! তাই সারা বছরই এ সব গ্রাম্য শ্মশান প্রায় ফাঁকা পড়ে থাকে। চার পাশে বাদশাহী আমলের বিশাল বিশাল গাছ। নির্জন বনভূমির মত। দায়ে ঠেকায় ছাড়া এদিকটায় কেউ বড় একটা আসেনা।

বাবা ভৈরবনাথের সন্ন্যাসী ভক্ত্যাদের হুটো থাক। একদল শুধুই সন্ন্যাসী। তারা শিব গোত্রে সন্ন্যাস নিয়ে মন্দিরের চাতালে থাকে। গলায় কড়ুই ফুলের মালা সন্ন্যাসের ধরা। হাতে বেতের ছড়ি। সংখ্যায় এরা প্রায় আশি নব্বুই। কোন কোন বছর কিছু বেশীও বা। শ্মশান-সন্ন্যাসীর থাক আলাদা। অনন্তই সেখানে মূল সন্ন্যাসী। বিশ বিঘে দেবোত্তর পেয়ে বংশ পরম্পরায় তার বাবা কর্তাবাবারাও এ কাজেই ছিল। মন্দির থেকে সন্ন্যাস নিয়ে এলার ঘাটে ছ'রাত্রি থাকার নিয়ম। সেখানে ছ'রাত পর পর হবিষ্যান্নে ও সংযমে থেকে প্রহরে প্রহরে শ্মশান জাগাতে হয়। সপ্তম রাত্রের অনুদয়ে নরমুণ্ড নিয়ে এসে গাজন তলায় নাচতে হয়। কলকে পাতার নাচ। বাবা ভৈরবনাথ মন্দিরেই থাকেন। তারই প্রতিনিধি অন্য আর একটি শিবলিঙ্গকে পালকীতে বসিয়ে আগে পিছে ঢাক বাজিয়ে চার পাশের গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয়। শেষ দিন কাটোয়ার ঘাট থেকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে আনলে শ্মশান-সন্ন্যাসীর সেই নৃত্য শুরু হয়। শেষ রাত্রে হাজারে হাজারে মানুষ এসে যায়। বিপুল উৎসাহ।

শ্মশান-সন্ন্যাসী এদিনই এলার ঘাটের শ্মশান থেকে ফের লোকালয়ে আসেন। তখন তার সম্মানই আলাদা। আগে আগে যাবেন খেপু ঘটক প্রধান সেবাইয়েৎ। তার পর ভক্ত্যা সন্ন্যাসীরা। শ্মশান-সন্ন্যাসীকে সমাদরে ডেকে আনবেন। কাটোয়ার গঙ্গা থেকে স্নান করে ফিরে আসা শিবকে ঘিরে চলবে সেই নাচ।

খেপু ঘটক দ্রুত এলার ঘাটের শ্মশানে যখন ফিরে এল তখন চারদিকে বেশ আলো ছড়িয়ে পড়েছে। স্টুটারের ক্যারিয়র থেকে কলাপাতার ওপর চটে জড়ান একটা পুটলি নিয়ে জোরে পা চালিয়ে এলার ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে হাঁটু জলে নেমে পুঁটলিটাকে হাত দিয়ে বালি সরিয়ে পুঁতে রাখল। গা-টা রীতিমত ঘিন ঘিন করছে। হাজার হোক সদ্য খুন হয়ে যাওয়া একটা রক্ত কাদায় মাখা-

মানুষের মাথাকে নিজের হাতে করে তুলতে হয়েছে। তারপর একসময় ভাল করে হাত পা ধুয়ে তরতর করে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল।

সময়ের হিসেব যা করেছি ঠিক তাই। আর দু'চার মিনিট দেরী হলেই অসুবিধা হত। শশ্মানের মাঝ বরাবর টিনের চালাটার নিচে আসতে না আসতেই দেখে বাবা ভৈরবনাথের নামে ধ্বনি দিতে দিতে শ্মশান-সন্ন্যাসীরা এগিয়ে আসছে। সংখ্যায় চারজন। প্রথমে অনন্ত আর দশরথ। পিছনের দু'জন এখানকার জে-এল-আর অফিসের কেরানী। ধুলিয়ানের ওদিককার লোক। কিছুকাল এখানে বদলী হয়ে এসেছে।

খেপু ডাকে : অনন্ত ইদিকে আয় কথা আছে। তোর শ্রী গুরুর চরণে আমার শতকোটি প্রণামরে। মনটা ভালো নেই নাতিটোর লেগে। তাই অমন কথা মুখে এসেছিল। অন্যায়টা আমারই।

অনন্ত এতটা আশা করেনি। ডাকাত হলেও তার গ্রামের একটা সহজাত সহবৎ আছে। অনন্ত সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন হয়ে যায়। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলে—বাবা ভৈরবনাথকে প্রণাম হইগো কর্তাঠাকুর। সন্ন্যাস নিয়ে এলাম তাই আপনার চরণ আর ছুঁতে নাই। ক্ষমা করেন গ। অধম তো কত অন্যায়ই করে।

খেপু আর বাড়তি কথায় না গিয়ে বলে—আরে অমন হয়েই থাকে। রাখতো তুই—। তারপর আড়ালে ডেকে এনে কানের কাছে মুখ দিয়ে দীঘির ধারের খুন, দারোগার কথা চেপে গিয়ে নিজেরই যেন যেতে যেতে দেখতে পাওয়া, তারপর বাকী সব ঘটনা বলে উচ্চ কণ্ঠে আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলে ওঠে—বুঝলিরে একেই বলে জাগ্রত দেবতা। বাবা ভৈরবনাথ যেন তোরই জন্যে সাজিয়ে রেখে-ছিলেন।

অনন্তের আনন্দে মুখ দিয়ে আর কথা বের হয় না। মাটিতে আর একবার মাথা ঠেকিয়ে বলে—জয় বাবা ভৈরবনাথ। কিন্তু নিমিত্ত তো আপুনি গ।

খেপু হাসে। প্রসন্ন হাসি। আকর্ণ বিস্তৃত। কান প্রায় এঁটো হয়ে যায়। অনন্ত কি ভেবে যেন হঠাৎ কিন্তু কিন্তু করে। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা কাটিয়ে বলে—কিন্তু ঠাকুর অপঘাতের মৃত্যু। এতে কি দেবতার কাজ হবে গ!

বাৎসল্যের স্বরে খেপু সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—ব্যাটা আমার ভেক নিয়ে রাতারাতি শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের গোঁসাই ঠাকুর বনেছেন! আরে বেটা ঠাকুর তো

আমাদের। তুই কে রে শালো। তোকে যে সুরে বাঁশি বাজাতে বলব সেই সুরে বাঁশি বাজাবি। তবলার ঠেকনতো আমার হাতে। খেপু আর কথা বাড়ায় না। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে স্কুটারে ষ্টার্ট দিতে দিতে বলে—ঘাটের রানার বাঁদিক ঘেঁসে খুঁজে নিস। হাঁটু জলের তলায়।

শ্মশানের বাঁকটা পার হতেই খেপুর হঠাৎ মনটা আবার খারাপ হয়ে যায়। একটু বেলা বেড়ে গেল—নইলে সারদা গণৎকারের কাছে যাওয়া যেত। মুহূর্তেই আবার সকালের জ্বালা আর অপমান উথলে ওঠে। খেপু আপন মনেই বলতে বলতে চলে—শালো বরাহনন্দন—ডাকাতি ছেড়ে শালো তোমার নাম কেত্তন—এবার মরণ নাচ নাচিয়ে ছাড়াবো।

৪

চারজন শ্মশান-সন্ন্যাসী। এর মধ্যে অনন্ত আর দশরথ পুরানো। এখানকার নিয়ম আচার সব তাদের জানা। বাকী দু'জন নতুন। বিদেশী। মানত করে একবারের জন্য সন্ন্যাস নিয়েছে। সকাল থেকেই অনন্তর পেছন পেছন আঠার মত লেগে আছে। হাজার হোক খুন হয়ে যাওয়া মরার মাথা তার যে কি দায় আর হেপা দাগী ডাকাত অনন্তের অজানা নয়। দশরথকে আড়ালে ডেকে অনন্ত বলার আর অবসর পায় না। বিকেলের দিকে শ্মশানের আটচালাটার নীচে অনন্ত ধুনি জ্বালল। পরপর ছ'দিন এই ধুনি সেবা। নিভবে না। পালা করে একে জাগিয়ে রাখতে হবে। এই আগুনেই হবিষ্যান্ন করে মধ্য রাত্রিতে কানে তুলো-গুজে বিনা নুনে আহার। কানে কোন শব্দ গেলেই খাওয়া ত্যাগ করে উঠে পড়া ইত্যাদি নিয়ম কানুনগুলি অনন্ত জে-এল-আর বাবুদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ এ সময় মাঝখান থেকে দশরথ বলল—সবই তো হবে, কিন্তু কলকে পাতার ব্যবস্থা এবার কি হবে? জে-এল-আর অফিসের বাবু দু'জন পরম নিশ্চিন্তের সঙ্গে বলে—সে ভাবনা এবার আমাদের ওপর ছেড়ে দ্যান। আমাদের ওদিকে ফরাক্কার তালতলার ঘাটে লোক পাঠিয়েছি। একটা দুটো যা বাবা পাঠায় আপনারা হাতে নেবেন। ওতেই আমাদের হবে।

—হাতে নিতে ঘেন্না করে? দশরথ শুধোয়।

—ঘেন্না করলে আর মানত করি? আদতে অভ্যেস নেই কিনা।

অনন্ত এ উত্তরে খুশী হয়। সে পুরানো শ্মশান-সন্ন্যাসী, এ কাজ যে সবার কাছে সহজ নয়। এটাও একধরনের স্বীকৃতি।

তাল ঘাটের কথাটা দশরথ এমন কি অনন্তের কাছেও নতুন নয়। জায়গাটার নামও তারাও জানে। ফরাক্কার ওদিকে খেপু ঠাকুরের মেয়ের বাড়ী। তত্ত্ব নিয়ে তাদের ওদিকটায় দু'বার যেতে হয়েছে! অনন্তও ছেলেকে পাঠিয়েছে।

অফিস-বাবু দু'জন আশ্বাস দিয়ে বলে যে কোনো কোনো গ্রামে এখনোও মৃতদেহ সৎকার না করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে তো কথাই নেই—এটাই রীতি। ওরাই বলল—আমাদের মানত। লোক ঠিক এসে যাবে।

পরম আশ্বস্ত হয়ে দশরথ আনন্দে বলে ওঠে—দাদাগো লাগাও—জয় বাবা গাজনেশ্বর বাবা ভৈরবনাথ।

সঙ্গে সঙ্গে বাকী তিনজনও কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায়! এলার ঘাটের শ্মশানের নির্জনতা থরথর করে কাঁপে। বাবার নামে প্রহরে প্রহরে এখানে ধ্বনি দেওয়ার রীতি। মেলাতলা বা বাবার মন্দিরে শ্মশান-সন্ন্যাসীদের কণ্ঠ গিয়ে পৌঁছালে সেখানকার ভক্ত্যা সন্ন্যাসী যাদের সংখ্যা প্রায় আশী নব্বই তারা আবার প্রতি-ধ্বনি দেয়। ধ্বনিতে-প্রতিধ্বনিতে গোটা অঞ্চল গমগম করে ওঠে।

শ্মশান-সন্ন্যাসীর অনেক কাজ। প্রহরে প্রহরে শ্মশান জাগাতে হয়। প্রতি প্রহরে শ্মশানের চৌহদ্দীকে চারবার ডাকিনী শাকিনী মন্ত্রে প্রদক্ষিণ করতে হয়। একে বলে শ্মশান জাগানো। নইলে অপদেবতা এসে যায়। সব কাজ পণ্ড হয়। তা ছাড়া যাদের মাথা নিয়ে সংক্রান্তির অনুদয়ে বাবার মন্দিরে নৃত্য, যাতে তাদের আর পুনর্জ্জন্ম না হয় তার জন্য কাঁচা হলুদ আর নিমপাতা নিয়ে আট কোণে পুঁতে দিতে হয়। জন্ম-বন্ধন ক্রিয়া।

শেষ প্রহরে অনন্ত শ্মশানের ঢিবিটার নৈঋত কোণে কাঁচা হলুদ আর নিম-পাতাকে হাতের চেটোয় কূর্ম মুদ্রায় রেখে মাটিতে পুঁতে দেবার আগে ত্র্যম্বক বীজ জপ করছে এমন সময় তিনজন ছায়া ছায়া মানুষ খড়ো নদীর তিরতিরে জল ভেঙে ক্রমশঃ ঢিবির ওপরে উঠে আসছে। অনন্তকে বোধ হয় তারা লক্ষ্য করে থাকবে। কিছু বলার আগেই তারা 'জয় বাবা ভৈরবনাথ' ধ্বনি দিতে দিতে কাছে এগিয়ে এ'ল। অনন্তের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে বলে—আমরা তালতলার ঘাট থেকে এলাম। বাবা দয়া করেছেন গো।

অনন্ত এ সময় মৌনী থাকে। ওদের দু'জনের হাত থেকে দুটো ব্যাগ নিয়ে

তরতর করে নদীর জলে নেমে যায়। বাবার প্রসাদ, হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে নদীর বালিতে পুঁতে রাখতে হয়। গাজনের দিন রাতের শেষ প্রহরের আগে আর তুলতে নেই।

মাঝে চার দিন গেছে। খেপু ঘটক বার দুই শ্মশানে এসে অনন্তের খোঁজ খবর নিয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু সারদা গণৎকারের কাছে আর গিয়ে উঠতে পারেনি। হাজার হোক—এই বিরাট সুযোগ। মেল ট্রেন পাস করাতে হবে। ঈশান ডাঙ্গা থেকে বর্ধমান-সদর প্রায় দশ মাইল। দিনে দু'বার তিনবার যাতায়াত করতে হয়েছে। ব্যবস্থা এখন একেবারে পাকা। শুধু বড়বাবু মেলাতলায় দু-তিন হাজার লোকের মধ্যে এ্যারেষ্ট করতে রাজী হননি। খেপুর অনেক অনুরোধেও না।

আজ সেই শেষ রাত। শেষ প্রহর। জে-এল-আর আপিসের বাবু দু'জন, অনন্ত আর দশরথ চারজনে খোড়ো নদীতে স্নান করে উঠতে না উঠতেই ঢাকের টেঙাই শুরু হয়ে গেল। মেলাতলা এখান থেকে খানিকটা দূরে, গ্রাম পার হয়ে। ঢাকের টেঙাই শুনতে পেয়ে সেই দূরের শ'য়ে শ'য়ে কণ্ঠ বাবা ভৈরবনাথের নামে ধ্বনি দিয়ে উঠল। এই ধ্বনির মানেই হ'ল এবার মন্দির তলার ভক্তরা চারপাশের গ্রামগুলি শেষ প্রদক্ষিণে বেরিয়ে যাবে। অন্য গ্রামের ভক্তরা তখন এখানটায় চলে আসবে। আর দু-দলের এই আসা-যাওয়ার মাঝখানে অনন্ত আর তার দল মন্দির তলায় কলকে পাতার নাচ নাচবে। গ্রামের সন্ন্যাসীরা ফিরে এলে সেই নাচের সমাপ্তি। মেলাতলার ঢাক পাঁচ খানা। তার বোল মিলিয়ে যেতে না যেতেই পাশের গ্রামের ঢাক বাজতে শুরু করেছে। পরপর গ্রামগুলিতেও এই একই আওয়াজ। সমস্ত এলাকা জুড়ে অন্ধকারের হাওয়ায় হাওয়ায় এক বিচিত্র তরঙ্গের ধ্বনি।

মেলাতলায় আলোয় আলো। হ্যাজাকের আলো আর নেই। এদিককার গ্রামে গ্রামে এখন বিদ্যুৎ। চারদিক দিনের মত। টলটলে। মন্দিরের একেবারে ওপরের সিঁড়িতে খেপু ঘটক এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদেহ। খালি পা। পরনে মালকোঁচা মারা কাপড়। মাথায় হলুদ পাগড়ী। খেপুর ইষ্টদেবী বগলামুখী। হলুদ তাঁর প্রিয় রঙ। খেপু দাঁড়িয়ে আছে। আর বড় জোর আধ ঘণ্টা—

এলার ঘাটের শ্মশানে সন্ন্যাসীরা স্নান করবে। নরমুণ্ডগুলিকেও স্নান করিয়ে

সন্ন্যাস নেবার দিনের প্রজ্জ্বলিত ধুনিতে আত্মার পূর্ণাভিষেক অর্থাৎ নির্বাণ প্রার্থনা করে এরা অগ্রসর হবে। অনন্তের মত মানুষও কীর্তন গায়। অজয়-দামোদরের গৈরিক স্রোত-ধারার রঙের বাহারই তখন একমাত্র সত্য।

মন্দিরের চাতালে খেপুর বুক দ্রুত উঠছে নামছে। মাথার পাগড়ীটা আবার ঠিক করে নেয়। সামনে বাবা ভৈরবনাথ। মাথায় মা বগলামুখী। পাশে আবার মেজবাবু চক্রবর্তী। খেপু কানের কাছে মুখ এনে বলে—দেখবেন স্যার!

শেষ রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে তারপর ফিকে হয়ে আসে। পৃথিবী ক্রমশ জাগে। ঢাক বাজছে। খেপুরা এইবার আসবে। মন্দিরের দূরে উঁচু নীচু জমি। ঢেউ খেলান। সেই ঢেউয়ের লালচে মাথাগুলির একবার ওপরে আর একবার গড়ানে নেমে তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে অনন্তের দল এগিয়ে আসছে। চারটে কালো দেহ। গলায় হলদে কড়ুই ফুলের মালা। এক হাতে খোলা খড়্গ। অন্য হাতে ইউক্যালিপ্টাস আর দেবদারু পাতায় জড়ান তিন জনের হাতে তিনটি নরমুণ্ড। অন্য এক জনের হাতে পুরানো একটি নরকপাল। এদের নৃত্যের ভঙ্গীতে মনে হয় যেন পৃথিবীর শেষ অন্ধকারের পাপ আর প্রথম প্রভাতের পুণ্য এক সাথে মিশে যাচ্ছে।

কেউই প্রকৃতিস্থ নয়। আকণ্ঠ কারণ পানে চুর হয়ে আছে। মন্দির চাতালে প্রণাম করে বর্ধমান-দাদন ঘাটের বাঁধান সরানে গিয়ে দাঁড়াবে। নৃত্য সেখানেই। অনন্তের মুখে জড়ান কণ্ঠে গানের কলি—'সাজিবে উলোর ভূঞে ধুল্যোরে ভাই মটরের ভূঞে ওই / কলকে পাতা ভেসে এল মরার মাথা কৈ।' গানের সুর চড়ায় তুলে আবার মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে বলছে—লাচগো তুমরা লাচ—জয় বাবা ভৈরবনাথ।

গোটা মেলার লোক এদের সঙ্গে গোল হয়ে চলতে থাকে। সামনে পেছনে অনেকে নাচে। খেপু তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। নামার মুখেও একবার মেজবাবুকে বলে—দেখবেন স্যার আপনার চরণ ছুঁয়েই আছি স্যার।

জয়বাবা-ধ্বনি দিতে দিতে খেপু নামে। সে প্রধান সেবাইয়েত। অনন্তর মুখোমুখি হয়ে তাকেও সমানে নাচতে হবে। খেপু ঘুরে এসে অনন্তের মুখোমুখি দাঁড়ায়। একবার মাটিতে পায়ের দিকে, তারপরই মন্দির চূড়োর দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে—বাবা মুখ রেখো গো। শালোকে আজ চাপুলে ধরব।

অনন্ত তখন উন্মত্ত। কে রাজা আর কে খেপু এ তার সম্বিতের বাইরে। তবুও সে আপন মনেই বলে—লাচুন গ' কর্তা লাচুন।

খেপু এবার সামনে এসে অনন্তের মুখোমুখি চোখ তুলে নৃত্যের ভঙ্গীতে প্রচণ্ড লাফ দিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তীব্র আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে—একি করেছিসরে অন্তা, এযে আমার নাতির মুখ— হায় হায়রে হায় হায়···

অনন্তের কানে সেকথা ঢুকল না। পেটে তার পরিপূর্ণ কারণ। থেমে পড়া খেপুকে সে পাতা দিয়ে বাঁধা হাতের দোলান মরার মাথা দিয়ে আঘাত করে। খেপু অনড়। নিশ্চল। অথচ অনন্ত নাচে। গোটা গ্রাম জয়ধ্বনি দেয়। অপ্রকৃতিস্থ অনন্ত তখনও বুঝতে পারেনি যে সব নৃত্যই একদিন চিরকালের মত থেমে যাবে।

অসংরক্ষণীয়া

কল্যাণ মজুমদার

এই নিয়ে বার চারেক এলো ওরা। কথাটা আপ-ডাউন করছে মাস তিনেক। প্রথমবারেই অবশ্য গোবিন্দ নিজে আসেনি। এসেছিল ওর বউ মেনকা। ত্রিদিব শুনেছিলেন অমলার কাছ থেকে। শুনেই মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। এত সাহস হয়েছে গোবিন্দর!

অমলা বলেছিলেন, সাহস গোবিন্দর নয়, ওর ছেলে মিণ্টুর। ও-ই নাকি জেদ ধরে আছে।

মিণ্টুই-বা এই সাহস ও জেদের জোগান পায় কোত্থেকে? ও জানে না ও গোবিন্দ ঘরামির ছেলে? জানে না ত্রিদিব বোসের এঁটো খুঁটেই মানুষ হয়েছে গোবিন্দ? নাহয় ওদের কিছু টাকা হয়েছে, মিণ্টু ভালোই চাকরি করে তাবলে তাঁর ছোটমেয়ে বুয়াকে বিয়ে করতে চাইবে!

দেশের বাড়িতে বসে এ কথা তোলার সাহস হতো গোবিন্দর? এ বয়েসেও নির্ঘাৎ থাপ্পড় মেরে বসতেন—অল্প বয়েসে যেমন অনেক মেরেছেন।

অমলা স্বামীকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। রাগারাগি করে লাভ নেই। মেয়ে থাকলে বিয়ের প্রস্তাব আসবেই। আর এখন দেশ-গাঁয়ের কথা কেউ মনে রাখে না। জাত-বেজাতের প্রশ্নও উঠে গেছে। বুয়া নিজেই যদি মিণ্টুর মতন কাউকে বিয়ে করে—বাধা দিতে পারবেন?

দেখে-শুনে প্রচুর খরচ করে ভালো ঘরে বরে বিয়ে দিলেও কি মেয়ে সুখী হয়? বড়মেয়ে টুয়া তো হলো না। বিয়ের দু বছরের মধ্যে মেয়ে ফিরে এলো ঘরে। কোর্ট-কাছারি করে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। আসলে, সবই ভাগ্য। ভাগ্য এখন গোবিন্দর পায়ে পায়ে হাঁটছে।

ত্রিদিব বলেন, অকৃতজ্ঞ! স্রেফ আমাকে অপমান করার জন্যেই প্রস্তাবটা পাঠিয়েছে। জানেতো আমাদের অবস্থা! তুমি বলে দিও, ত্রিদিব বোস এখনো মরেনি। জীবনে কারুর কাছে হাতও পাতিনি, মাথাও নোয়াইনি। ও ভেবেছে

কি, মেয়ে আমাদের জলে পড়ে গেছে, না টাকার অভাবে বিয়ে দিতে পারব না?

ত্রিদিব ভুল বুঝেছিলেন। অজ্ঞতাবশত গোবিন্দর প্রতি অবিচারও করেছিলেন।

প্রস্তাব শুনে গোবিন্দ চমকে উঠেছিল ত্রিদিবের চেয়েও বেশি। স্ত্রীকে বলেছিল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

মেনকা বলে, মাথা আমার খারাপ হয়নি। খারাপ হয়েছে তোমার ছেলের। ও বুয়াকে ছেড়ে আর কারুকে বিয়ে করবে না। তা এতে মাথা খারাপের আছেটাই বা কি! এখন আর আগের দিনকাল নেই। মিণ্টু আমাদের হীরের টুকরো ছেলে। কত বড় চাকরি করে। ওকে জামাই পেলে অনেক বড়মানুষেরাই বর্তে যাবে। ওঁদের আর সে-অবস্থা নেই। তুমি একবার বলে দেখ।

গোবিন্দ মাথা নাড়ে।—আমি পারব না। বড়দার সামনে দাঁড়িয়ে আমি এ-কথা উচ্চারণও করতে পারব না। ছেলেকে বলো এসব উটকো চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে।

কি করে গোবিন্দ ভোলে যে দেশ ছেড়ে এখানে আসা থেকে শুরু করে আজকের অবস্থায় পৌঁছানোর পেছনে রয়েছে বড়দা ত্রিদিব বোসের সস্নেহ সাহায্য, প্রশ্রয় ও পরামর্শ।

আজন্ম বোস বাড়ির পাত কুড়িয়ে মানুষ হয়েছে গোবিন্দ। তার বাবাও তাই করেছিল। সেই সূত্রেই ত্রিদিবকে বড়দা বলা। বোসবাড়ির জমি-জায়গা, গরু-বাছুর দেখাশোনা করা, হাট-বাজার করা ছিল গোবিন্দর কাজ। অথচ বাড়ির চাকর বলতে যা বোঝায় তাও ছিল না সে। বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেও পাত পেড়ে বসতে পারত। পুজো-পার্বণে কাপড়-জামা পাওয়াটা তো নিয়মই ছিল। ত্রিদিবের পুরানো পোষাক পাবার অধিকার ছিল তারই।

ত্রিদিব যখন ধীরে সুস্থে জায়গা-জমি বেচে দিয়ে এপারে চলে আসার ব্যবস্থা করেন, গোবিন্দ বলেছিল, বড়দা, আমাদের কি হবে?

ত্রিদিব বলেছিলেন, তুইও চল আমাদের সঙ্গে।

—আমি গিয়ে কি করব। কোথায় থাকব কি খাব! আমার তো কোনো আত্মীয়স্বজন নেই ওখানে। জমি-জায়গা কেনার টাকাও নেই। বৌ-বাচ্চা নিয়ে—

ত্রিদিব বলেন, বৌ-বাচ্চা ফেলে যেতে বলেছি নাকি! সবাইকে নিয়ে চল

আমাদের সঙ্গে। আমাদের যদি জোটে তোরও জুটবে। তোকে না-খাইয়ে নিজে খেয়েছি কোনোদিন ?

লজ্জায় গুটিয়ে গিয়েছিল গোবিন্দ।—কী যে বলেন, বড়দা। চিরকাল আপনাদেরটা খেয়েইতো মানুষ। আপনি একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছেন। সেখানে আবার আমার বোঝা চাপাবো ?

ভাগ করে নিতে জানলে মানুষ কখনো বোঝা হয়না। ত্রিদিব জানতেন। গোবিন্দও নিজেকে বোঝা মনে করার সুযোগ পায়নি।

কলকাতায় এসে কয়েকটা দিনের জন্যে কেবল এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন ত্রিদিব। তারপরই বিরাটিতে দশ কাঠা জমিসহ বাড়িটা কিনে ফেলেন। পুরানো বাড়ি। অনেকগুলো ঘর। গোবিন্দকেও দুটো ঘর দিতে পেরেছিলেন। রান্না হত এক হেঁসেলেই। আলাদা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করার সঙ্গতি ছিল না গোবিন্দর।

তখন কলকাতার চারপাশে একের পর এক জবরদখল কলোনি গড়ে উঠছে। বিরাটিতেও প্রতিদিন আসছে নতুন মানুষ। গড়ে উঠছে কলোনি। নতুন ঘর-বাড়ি।

ত্রিদিব কলোনিতে যেতে রাজী হলেন না। বলেন, জবরদখল বেআইনী জমি আমার চাই না। মাথা গোঁজার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমি অপর কোনো ঝঞ্ঝাটে যাবো না। এবার কাজকর্মের ব্যবস্থা দেখতে হবে।

গোবিন্দ কিন্তু নতুন গজিয়ে ওঠা মহাজাতি নগরে পাঁচ কাঠা জমির দখল পেয়ে গেল। ত্রিদিবের বাড়ি থেকে খুব দূরে না। হেঁটে যেতে বারো তেরো মিনিট লাগে।

শুনে ত্রিদিব বলেন, জমি পেলি, বাড়ি করতে পারবি ?

গোবিন্দ বলে, বাড়ি আর কি—ওই দরমার বেড়া, টালির ছাউনি দিয়ে একটা কিছু খাড়া করা যদি যায়—শ তিনেক টাকা পেলে—

টাকাটা দিয়েছিলেন ত্রিদিব। আর ওর ঘর তৈরি শেষ হবার আগেই নবীন হাইস্কুলে অ্যাসিস্টেন্ট হেড মাস্টারের চাকরি পেয়ে যান ত্রিদিব। সেই স্কুলেই দপ্তরী হিসেবে ঢুকিয়ে দেন গোবিন্দকে। দেশেও মাস্টারি করতেন ত্রিদিব।

পাঁচ বছর আগে রিটায়ার করেছেন ত্রিদিব। গোবিন্দ এখনো কাজ করছে ঐ স্কুলে।

বাড়ি আলাদা হবার পরও বেশ কিছুকাল গোবিন্দ নিয়মিত বোস-বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। সকালে এসে বাড়ির কাজকর্ম দেখত। রেশন আনা, বাজার করা, প্রয়োজনে মিস্ত্রি ডাকা, বাগানের গাছে জল দেওয়া পুরানো অভ্যাসবশতই করে যেত। স্কুলে যেত বড়দার সঙ্গে। ফিরতোও একসঙ্গে যদি না বড়দার মিটিং থাকত। স্কুল থেকে ফিরেও অনেকক্ষণ কাটিয়ে যেত। যদি বৌদির কিছু দরকার হয়। বড়দার দেরি হবে জানলে তিনি না-ফেরা পর্যন্ত নিজের বাড়িতে যেত না গোবিন্দ।

একদিন ত্রিদিব বললেন, তুমি আর এসব করো না গোবিন্দ।

গোবিন্দ বাগানের মাটি কোপাচ্ছিল। থমকে দাঁড়িয়ে অবাক গলায় বলেছিল, কেন বড়দা ?

—তুমি আর আমার কাজ করো না, আমি তোমাকে আগের মতন রাখতেও পারব না। তাছাড়া একই স্কুলে কাজ করো, লোকে বলবে আমি তোমাকে স্কুলের মাইনে দিয়ে বাড়িতে খাটাচ্ছি।

দুঃখ পেয়েছিল কিনা জানে না গোবিন্দ। তবে মনে হয়েছিল বড়দা যেন ওকে একটু দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন।

তবু যাতায়াত ছাড়েনি গোবিন্দ। মাঝে মাঝে মেনকাও আসত। ছেলেরাও আসত। কিন্তু বোসবাড়ির ছেলেরা বিশেষ কারণ ছাড়া ওদের বাড়িতে যেত না। ওরা যেত না বলে কখনো কোনো প্রশ্নও জাগেনি। দেশেও ওদের বাড়িতে বোসবাড়ির কেউ অহেতুক যেত না। অথচ ওদের বোস বাড়িতে যাতায়াত ছিল অবারিত।

হঠাৎই একদিন স্কুলে নিজের ঘরে ডেকে বড়দা বললেন, গোবিন্দ, তপশীলী সার্টিফিকেটটা করিয়ে রাখো।

—আজ্ঞে—

—শিডিউল কাস্ট সার্টিফিকেট। তাড়াতাড়ি করিয়ে নাও। কাজে লাগবে।

ততদিনে তোনু দাশ গোবিন্দবাবু হয়েছে। পাড়ার সবাই গোবিন্দদা বলে ডাকে। স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তির জন্যে ওকে এসে ধরাধরি করে। গোবিন্দ ত্রিদিব বোসের আপনজন—অনেকেই জানে। বড়দার কথায় ঠিক রাজী হতে পারে না। দেশে গ্রামে যা ছিল সেকথা এখানে আবার বলা কেন !

ত্রিদিব বলেন, আরে তুমি তো কিছু মিথ্যেও বলছ না অন্যায়ও করছ না। কত

লোকে তো মিথ্যে বলে সার্টিফিকেট নিচ্ছে। আমার এক ছাত্র এস. ডি. ও হয়ে এসেছে। লিখে দিচ্ছি। সার্টিফিকেটটা নিয়ে রাখো। তোমার না লাগুক ছেলেদের খুব কাজে লাগবে।

তখন না বুঝলেও এখন গোবিন্দ জানে, বড়দা সেদিন ঈশ্বরের গলায় কথা বলেছিলেন।

কেবল গত দশ-বারো বছরের উথাল-পাথাল সময়ের থই পায় না গোবিন্দ। যে বড়মেয়ের ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছিলেন বড়দা, তাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনতে বাড়ির পাঁচ কাঠা জমি বিক্রি করেছেন। তখন গোবিন্দর দোতলা বাড়ি— তার বড় ছেলে বিনোদ, যার লেখাপড়ায় মাথা বা মন কিছুই ছিল না, হঠাৎই যেন আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পেয়ে যায়। ইলেকট্রিক মিস্ত্রির সাগরেদি করতে করতে এখন সে বিল্ডিং কন্ট্রাকটর। বড়দার করে-দেওয়া সার্টিফিকেট দেখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পেয়েছে। আরো কি করেছে বা করে গোবিন্দ জানে না। তবে বছর দুয়েক আগে নিজের বিয়েতে বিনোদ নাহোক চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেছে।

ওদের বাড়িতে যেদিন টিভি আসে সেদিন বোস-বাড়ি ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। খবর পেয়েই ছুটেছিল গোবিন্দ। মেনকার বারণ সত্বেও। শুনলো, বড়দার ছোট ছেলে দীপু, যে ওদেরই স্কুল থেকে প্রথম, ডিস্ট্রিক্টে ফার্স্ট হয়ে পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছে, নাকি নকশাল হয়ে গেছে। ওর বিরুদ্ধে মার্ডার-চার্জ। দীপু বাড়িতে ছিল না। তাবলে বড়দা ও বাড়ির সকলের হেনস্থা কম হয়নি। বড়দা একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। দীপুর ওপরই ছিল তাঁর বেশি ভরসা। সেই দীপু ফিরল পাঁচ বছর পর। নতুন সরকার এসে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের যখন মুক্তি দেয়। দীপু না ফিরলেই ভালো হতো। যে ফিরেছে সে দীপু না, দীপুর কঙ্কাল।

বড়ছেলে শমীর একার রোজগারে সংসার চলে না বলে পঁয়ষট্টি বছরেও ঘরে বসে ছেলে পড়ান ত্রিদিব বোস। সকালে, বিকালে।

গোবিন্দর বাড়িতে টেলিফোন। মিন্টুর অফিস থেকে দিয়েছে। সকালে বিকেলে অফিসের গাড়ি মিন্টুকে নিয়ে যায় ও পৌঁছে দেয়।

মেনকার গরবিনী হবার অধিকার আছেই। মিন্টুও দাবী করতে পারে বুয়াকে। বয়েসে বুয়া মিন্টুর কিছু ছোট হলেও একই সঙ্গে স্কুলে-কলেজে পড়েছে।

তাই নিজের অন্তর্গত বাধা পেরিয়েও বড়দার সামনে দাঁড়াতেই হয়েছিল গোবিন্দকে।

বুয়াকে বিয়ে করতে চাওয়ার পেছনে ভালোবাসা ছাড়াও মিন্টুর নিজস্ব কারণ আছে। স্কুলে ও কলেজে সে কখনো বুয়াকে কোনো কিছুতেই হারাতে পারেনি। ডিবেটে, আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় এবং পরীক্ষার ফলাফলে বুয়া সব সময় ওকে হারিয়ে দিয়েছে। স্কুলে পড়ার সময় ভাবত ত্রিদিব বোসের মেয়ে বলেই বুয়ার প্রতি পক্ষপাত ঘটে। কলেজে এসে সে-কথা ভাবা সম্ভব ছিল না। বি-এ পরীক্ষাতে বুয়া সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেলেও মিন্টু অনার্স পায়নি।

তাছাড়া বহু চেষ্টা করেও মিন্টু বুয়ার ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। বুয়া যে ওকে তাচ্ছিল্য করেছে, বা কখনো অপমান করেছে তা নয়। কোনোরূপ প্রশ্রয়ও দেয়নি। অনেক বছর ধরে ভেতরে ভেতরে পুড়ছে মিন্টু। নিজের কাছেই নিজে প্রতিজ্ঞা করেছে তেজী মেয়ে বুয়াকে ও দখল করবেই। এ পর্যন্ত একবার ওকে হারাতে পেরেছে, কিন্তু চূড়ান্ত জয় হবে যেদিন স্বামীর অধিকার পাবে। একমাত্র জয় যথার্থ আনন্দের ছিল না।

দুজনেই শমীদের অফিসে চাকরির আবেদন করেছিল। মিন্টু চাকরি পায় তপশীল সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত পদে। সেবারে একজনও অ-তপশীলী চাকরি পায় নি। শমী ধরাধরি করেও বুয়ার জন্যে কিছু করতে পারে নি। এখনো চাকরি পায়নি বুয়া। এম. এ পাশ করে বি-এড পড়ছে। দু-বেলা টিউশনি করে।

চাকরি পাবার তিন বছরের মধ্যে অফিসার হয়েছে মিন্টু। তার দু'বছর পর আবার প্রমোশন পেয়ে অ্যাসিস্টেণ্ট সেলস ম্যানেজার হয়েছে মাস চারেক আগে। এজন্যই অপেক্ষা করছিল ও। এই পদের সঙ্গেই আসে টেলিফোন ও গাড়ি। এখন ওর দাবী নিশ্চয় অযৌক্তিক নয়।

হ্যাঁ, চাকরি পাওয়া, পদোন্নতি ঘটা সবই হয়েছে ত্রিদিব বোসের করে দেওয়া সার্টিফিকেট ভাঙিয়ে। সংরক্ষিত কোটায়। সরকারী নিয়মের জন্যে মিন্টু দায়ী নয়। আর অফিসে পদটাই আসল কথা। শমী বোস একজন সিনিয়র অ্যাসিস-টেণ্ট মাত্র। এক বিভাগে কাজ না করলেও পদমর্যাদার জন্যে মিন্টুকে সমীহ না করে পারবে ?

মিন্টু জানে শমীদা খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। অফিসেও কর্মী হিসেবে খুব সুনাম আছে। কিন্তু শমীদা ওকে কোনোদিনই ছুঁতে পারবেন না। তিনি

চাকরিতে ঢুকেছেন একটা ভুল সময়ে। গত কয়েক বছরে ওদের অফিসে কেবল তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্তরাই প্রমোশন পাচ্ছে। কেননা সরকারী নিয়মমত ওদের বকেয়া কোটা পূরণ করতে হবে। সকল স্তরে কোটা পুরতে এখনো বাকি।

মুশকিল হয়েছে অমলার। ত্রিদিব বা শমী সরাসরি হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি। শমীর কথামতন বুয়ার মতও জানতে পারেননি। তাঁর কথা বুয়া মন দিয়ে শুনেছে কিনা তাও জানেন না। যা তেজী মেয়ে—বেশি বলতে ভয়ও পান। প্রথমেই বলে উঠেছিল, আমার বিয়ে নিয়ে ভাবতে কে বলেছে তোমাদের? ও মেয়ের মুখ দেখে কিছু বুঝবেন সে-ক্ষমতাই নেই অমলার।

অথচ মেনকা বিকেল থেকে এসে বসে আছে। আজ কথা না-নিয়ে উঠবে না। কিন্তু অমলা কি বলবেন?

মেনকা বলে, আপনাদের কথা না জেনে অন্য কোথাও কথা বলতে পারছি না। কত ভালো ভালো সম্বন্ধে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

মেনকা লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে যায়। কারা বলেছে গাড়ি দেবে। কেউ বলেছে কলকাতায় ফ্ল্যাট দেবে ভালো পাড়ায়। এখন তো বাড়ির বদলে ফ্ল্যাট কেনার ধুম পড়েছে। অবশ্য পরে হয়তো মিণ্টু নিজেই কোম্পানির ফ্ল্যাট পেয়ে যাবে। সেজন্যই এখানে দাবী-দাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। শুধু বুয়াকে দিলেই হবে। ছেলেটা যে কী চোখে দেখেছে বুয়াকে! অবশ্য বুয়া তো খুবই ভালো মেয়ে। জন্ম থেকে দেখে আসছে। কোলে-পিঠেও করেছে।

—ও দিদি, আর দেরি করবেন না। পাঁজি দেখে একটা দিন ঠিক করে ফেলুন।

অমলা হাসেন, আরে অত হড়বড় করে কি বিয়ে হয়! তাছাড়া শুধু তোমার আমার কথাতেই বিয়ে হবে নাকি? আজকালকার ছেলেমেয়ে সব বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। ওদেরও নিজস্ব মতামত আছে। সব বিচার বিবেচনা করেই এগুনো ভালো।

—কী যে বলেন দিদি, মিণ্টু তো মত দিয়েই রেখেছে। ওর তো কি বলে, ভাত খাবি না আঁচাবো কোথায়—অবস্থা। অফিস থেকে ফিরেই জিজ্ঞেস করবে দিন ঠিক হলো কিনা। ওর আবার ছুটি-টুটি নেবার ঝামেলা আছে তো!

—মিণ্টুর কথা তো শুনেছি, কিন্তু বুয়ার মতটাও তো জানতে হয়।

ভুরু কুঁচকে মেনকা বলে, কেন, বুয়ার কি মত নেই?

—মত অমত কিছুই জানি না। জানো তো ও কীরকম। ওর মুখ থেকে কথা বের করা শিবেরও অসাধ্য।

অমলার মনে পড়ে বুয়া বলেছিল, তোমাদের চাপাচাপি না করে মিণ্টু আমার সঙ্গে কথা বললেই পারত।

অমলা বলেছিলেন, তোর সঙ্গে কোনো কথা হয়নি?

—হলে তোমাদের বলতাম।

কেবল বুয়াই জানে কেন মিণ্টু নিজে ওকে প্রস্তাবটা দিতে পারেনি।

অমলা বললেন, মেনকা, মিণ্টু ও বুয়ার মধ্যে কোনো কথা হয়েছে বলে তুমি জানো?

মেনকা মাথা নাড়ে—না, দিদি। জানি না কিছু। তবে ওরা নিজেরা কথা না বলে কি আর—

—আমি যদ্দুর জানি কথা হয়নি ওদের। তুমি বরং মিণ্টুকে বলো, বুয়ার সঙ্গে কথা বলতে। তারপর দেখা যাবে কি হয়।

—বুয়া কিছু বলেছে আপনাকে?

তরল হাসেন অমলা—তেমন কিছু নয়। মনে হয় মেয়ের একটু অভিমান হয়েছে। হওয়াটা স্বাভাবিকও। কি বলো?

কিছু বুঝে অনেকটাই না বুঝে মাথা ঝাঁকায় মেনকা।

চারদিন আগে শমীদাকে বলেছিল মিণ্টু। আজ সকালে শমীদা অফিসে বুয়ার লেখা চিরকুটটা দিলেন। 'শিয়ালদা। এনকোয়ারি। সাড়ে পাচটা।'

মিণ্টু দাঁড়াবার তিন মিনিটের মধ্যে এসে পড়ে বুয়া। এক বছরেরও বেশি পরে দুজনে মুখোমুখি।

বাদামী রঙের প্যান্ট আর চেক সার্টে বেশ স্মার্ট দেখায় মিণ্টুকে। হাতের ব্রীফকেস মুখের উজ্জ্বলতার ভারসাম্য রাখছে।

বুয়ার পরনে তাঁতের হলুদ রং শাড়ি। হলদে ব্লাউজ। কাঁধে শান্তিনিকেতনী চামড়ার ব্যাগ। মিণ্টু সেই চোখে তাকায় যার মধ্যে মুগ্ধতার সঙ্গে লোভও মিশে থাকে।

বুয়া বলে, বলো, কি ব্যাপার।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিণ্টু বললো, চলো একটা ট্যাক্সি ধরি। এখানে এই ভিড়ের মধ্যে—তুমি আর জায়গা খুঁজে পেলে না—

—আমাকে তো ট্রেন ধরতে হবে।

—কেন, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।

—না। বলো, কেন দেখা করতে চেয়েছ।

ওর মুখ দেখে মিণ্টু বুঝে যায়। বুয়া কোথাও যাবে না। নিজের ভেতরে একটুখানি সঙ্কুচিত বোধ করে। বছর খানেক আগের প্রগলভ ঘটনা মনে পড়ে। ও আরো দ্বিধাগ্রস্ত হয়। জোর না করে বলে, চলো, তাহলে এখানেই রেস্টুরেন্টে বসি। চা খাওয়া যাক।

রেস্টুরেন্টের দিকে যেতে-যেতে বুয়াও মনের পর্দায় ঘটনাটা দেখে নেয়।

কাছাকাছি একটা টিউশনি সেরে বাসের জন্যে দাঁড়িয়েছিল বুয়া। উল্টোডাঙা ভি-আই-পির মোড়ে। সন্ধ্যে আটটা হবে। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি থেকে ডাক আসে। ও এগিয়ে দেখে জানালায় মিণ্টুর মুখ। হাত বাড়িয়ে ডাকছে।

—বাড়ি যাবে তো? চলো। উঠে এসো।

ট্যাক্সিতে উঠে ক্লান্ত শরীর শিথিল করে বুয়া বলে, তোমার তো প্রচুর পয়সা হয়েছে। এতদূর থেকে ট্যাক্সি করে বাড়ি যাচ্ছ।

খুশি-খুশি হাসে মিণ্টু, বাসের এই গাদাগাদি আর ভালো লাগে না। তোমাকে লিফট দেবার সুযোগ পেলে অবশ্য আমি রোজই ট্যাক্সি করতে রাজি।

—তোমাদের অফিসে এইসব ন্যাকান্যাকা কথা শেখায় বুঝি!

—তুমি ন্যাকামি বলছ, আমি কিন্তু সত্যি বলছি। তুমি আমার কি বলে শৈশব-সঙ্গিনী—না, না, বাল্য প্রণয়িনী—

বলেই হাহা করে হেসে ওঠে মিণ্টু। বুয়াও হাসে।

—আমি কারুর প্রণয়িনী নই, হবার ইচ্ছেও নেই।

চোখ গোল করে মিণ্টু বলে, তাই?

ফাঁকা রাস্তায় ছুটন্ত ট্যাক্সি, দুধারে সবুজের সমারোহ, আলোর মালা, পাগল-করা বাতাস সারা শরীরে-মনে একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। তখন মনে দুঃখ যন্ত্রণা থাকে না, মলিনতা থাকে না। বিশুদ্ধ ভালোলাগায় ওরা দুজনে স্মৃতির টুকরো নিয়ে লোফালুফি খেলে।

হঠাৎ একসময়ে বুয়া টের পায় মিণ্টুর হাত ওর কোমর-বুকের কাছে বারবার

উঠে আসছে। ওর হাত যেন তৈলাক্ত বাঁশ-বাওয়া অঙ্কের বাঁদর। প্রথমে ভেবে-ছিল হয়ত গাড়ির ঝাঁকুনিতে বা হাত-পা ছড়াবার সময় আচমকা লেগে যাওয়া। বুয়া নিজেকে গুছিয়ে জানালার ধারে সরে যায়।

একটু পরে মিণ্টু আত্মস্থভাবে বুয়াকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। যেন তা করা ওর অধিকারের মধ্যে। বলে, এই, অমন করছ কেন? কাছে এসো।

বুয়ার অবাক লাগে। বিরক্ত হয়।

—তুমি এমন অসভ্য হয়েছ জানলে আসতাম না তোমার সঙ্গে।

মিণ্টু হাসে, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? এত বছর ধরে যা পাহারা দিয়ে আসছি তা একটু পরখ করব না!

—আমি জানতাম না কেউ তোমাকে দারোয়ান রেখেছে!

—সেলফ-অ্যাপয়েন্টেড, ম্যাডাম। আমার নিজেরই গরজে।

—স্টপ ইট, মিণ্টু। এসব ইয়াকি আমার ভালো লাগে না।

মিণ্টু বুঝতেও পারেনি সত্যি রেগে গেছে বুয়া। ও ভেবেছে, মেয়েরা তো এমন করেই থাকে। নারী ও নখরা—শাড়ি আর পাড়।

বললো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। রাগারাগি করতে হবে না। শান্তি। ও. কে? জাস্ট গিভ মি আ কিস্।

ক্ষেপে গিয়েছিল বুয়া—তোমার এত সাহস হয়েছে! হাউ ডেয়ার য়ু—ট্যাক্সি থামাও। আমি নেমে যাবো।

কোনো অনুনয়, ক্ষমা প্রার্থণা টলাতে পারেনি বুয়াকে। কেষ্টপুরের কাছে নেমে গিয়েছিল ট্যাক্সি থেকে।

রেস্টুরেন্টে বসে চায়ের অর্ডার দিয়ে মিণ্টু বললো, কিছু খাবে—কাটলেট বা চপ—

—না। শুধু চা।

চায়ে চুমুক দিয়ে বুয়া বললো, বলো, কি বলবে। কি জন্যে ডেকেছ?

মিণ্টু বললো, অনেক কথা বলার আছে, অনেক খবর দেবার আছে। তার আগে বলো, তুমি কি এখনো রেগে আছো?

ঠাণ্ডা গলায় বুয়া বলে, আমি তো রাগিনি। অপমানিত বোধ করেছিলাম।

নরম গলায় মিণ্টু বলে, সেদিনও ক্ষমা চেয়েছিলাম। এখনো আবার বলছি, লজ্জিত, দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করো।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিণ্টু বললো, চলো একটা ট্যাক্সি ধরি। এখানে এই ভিড়ের মধ্যে—তুমি আর জায়গা খুঁজে পেলে না—

—আমাকে তো ট্রেন ধরতে হবে।

—কেন, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।

—না। বলো, কেন দেখা করতে চেয়েছ।

ওর মুখ দেখে মিণ্টু বুঝে যায়। বুয়া কোথাও যাবে না। নিজের ভেতরে একটুখানি সঙ্কুচিত বোধ করে। বছর খানেক আগের প্রগলভ ঘটনা মনে পড়ে। ও আরো দ্বিধাগ্রস্ত হয়। জোর না করে বলে, চলো, তাহলে এখানেই রেস্টুরেণ্টে বসি। চা খাওয়া যাক।

রেস্টুরেন্টের দিকে যেতে-যেতে বুয়াও মনের পর্দায় ঘটনাটা দেখে নেয়।

কাছাকাছি একটা টিউশনি সেরে বাসের জন্যে দাঁড়িয়েছিল বুয়া। উল্টোডাঙা ভি-আই-পির মোড়ে। সন্ধ্যে আটটা হবে। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি থেকে ডাক আসে। ও এগিয়ে দেখে জানালায় মিণ্টুর মুখ। হাত বাড়িয়ে ডাকছে।

—বাড়ি যাবে তো? চলো। উঠে এসো।

ট্যাক্সিতে উঠে ক্লান্ত শরীর শিথিল করে বুয়া বলে, তোমার তো প্রচুর পয়সা হয়েছে। এতদূর থেকে ট্যাক্সি করে বাড়ি যাচ্ছ।

খুশি-খুশি হাসে মিণ্টু, বাসের এই গাদাগাদি আর ভালো লাগে না। তোমাকে লিফট দেবার সুযোগ পেলে অবশ্য আমি রোজই ট্যাক্সি করতে রাজি।

—তোমাদের অফিসে এইসব ন্যাকান্যাকা কথা শেখায় বুঝি!

—তুমি ন্যাকামি বলছ, আমি কিন্তু সত্যি বলছি। তুমি আমার কি বলে শৈশব-সঙ্গিনী— না, না, বাল্য প্রণয়িনী—

বলেই হাহা করে হেসে ওঠে মিণ্টু। বুয়াও হাসে।

—আমি কারুর প্রণয়িনী নই, হবার ইচ্ছেও নেই।

চোখ গোল করে মিণ্টু বলে, তাই?

ফাঁকা রাস্তায় ছুটন্ত ট্যাক্সি, দুধারে সবুজের সমারোহ, আলোর মালা, পাগল-করা বাতাস সারা শরীরে-মনে একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। তখন মনে দুঃখ যন্ত্রণা থাকে না, মলিনতা থাকে না। বিশুদ্ধ ভালোলাগায় ওরা দুজনে স্মৃতির টুকরো নিয়ে লোফালুফি খেলে।

হঠাৎ একসময়ে বুয়া টের পায় মিণ্টুর হাত ওর কোমর-বুকের কাছে বারবার

উঠে আসছে। ওর হাত যেন তৈলাক্ত বাঁশ-বাওয়া অঙ্কের বাঁদর। প্রথমে ভেবে-ছিল হয়ত গাড়ির ঝাঁকুনিতে বা হাত-পা ছড়াবার সময় আচমকা লেগে যাওয়া। বুয়া নিজেকে গুছিয়ে জানালার ধারে সরে যায়।

একটু পরে মিণ্টু আত্মস্থভাবে বুয়াকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। যেন তা করা ওর অধিকারের মধ্যে। বলে, এই, অমন করছ কেন? কাছে এসো।

বুয়ার অবাক লাগে। বিরক্ত হয়।

—তুমি এমন অসভ্য হয়েছ জানলে আসতাম না তোমার সঙ্গে।

মিণ্টু হাসে, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? এত বছর ধরে যা পাহারা দিয়ে আসছি তা একটু পরখ করব না!

—আমি জানতাম না কেউ তোমাকে দারোয়ান রেখেছে!

—সেলফ-অ্যাপয়েন্টেড, ম্যাডাম। আমার নিজেরই গরজে।

—স্টপ ইট, মিণ্টু। এসব ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না।

মিণ্টু বুঝতেও পারেনি সত্যি রেগে গেছে বুয়া। ও ভেবেছে, মেয়েরা তো এমন করেই থাকে। নারী ও নখরা—শাড়ি আর পাড়।

বললো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। রাগারাগি করতে হবে না। শান্তি। ও. কে? জাস্ট গিভ মি আ কিস্।

ক্ষেপে গিয়েছিল বুয়া—তোমার এত সাহস হয়েছে! হাউ ডেয়ার য়ু—ট্যাক্সি থামাও। আমি নেমে যাবো।

কোনো অনুনয়, ক্ষমা প্রার্থণা টলাতে পারেনি বুয়াকে। কেষ্টপুরের কাছে নেমে গিয়েছিল ট্যাক্সি থেকে।

রেস্টুরেণ্টে বসে চায়ের অর্ডার দিয়ে মিণ্টু বললো, কিছু খাবে—কাটলেট বা চপ—

—না। শুধু চা।

চায়ে চুমুক দিয়ে বুয়া বললো, বলো, কি বলবে। কি জন্যে ডেকেছ?

মিণ্টু বললো, অনেক কথা বলার আছে, অনেক খবর দেবার আছে। তার আগে বলো, তুমি কি এখনো রেগে আছো?

ঠাণ্ডা গলায় বুয়া বলে, আমি তো রাগিনি। অপমানিত বোধ করেছিলাম।

নরম গলায় মিণ্টু বলে, সেদিনও ক্ষমা চেয়েছিলাম। এখনো আবার বলছি, লজ্জিত, দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করো।

—বাদ দাও ওসব পুরানো কথা।

—বাদ দেওয়া যায় না, বুয়া। আমাদের বোঝাপড়ায় ভুল থাকলে—

—আমাদের মধ্যে কখনো কোনো বোঝাপড়া হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ে না।

—ঠিক। সেভাবে কিছু হয়নি। কিন্তু আমরা এত কাছাকাছি ছিলাম, পরস্পরকে পছন্দ করতাম—

—তাতেই তুমি ভেবেছিলে যা-খুশি তাই করতে পারো!

—আমি তো বলেছি আমার ভুল হয়েছে, অন্যায় হয়েছে।

কপালের ওপর থেকে উড়ে-আসা খুচরো চুল সরিয়ে বুয়া বললো, কি খবর দেবে বলছিলে—

নিজেকে চেয়ারে সোজা করে মুখে হাসি ফুটিয়ে মিণ্টু বললো, শুনেছ নিশ্চয় আমি প্রমোশন পেয়ে এ. এস. এম হয়েছি।

চেষ্টা করে হাসে বুয়া—বিলম্বিত অভিনন্দন। তোমার উন্নতি কে ঠেকাবে!

—ঠাট্টা করছ!

—না, না। ঠাট্টা করব কেন। তোমরা সরকারের নীল-চক্ষু ছেলে। নবব্রাহ্মণ।

—হাজার হাজার বছর ধরে আমরা যে অত্যাচার অবহেলা বঞ্চনা—

—প্লিজ। আমার এসব তর্কে কোনো উৎসাহ নেই। আমি এইটুকু জানি, আমার বাবা দাদা বা আমি তোমাদের ওপর কোনো অবিচার অবহেলা করিনি। অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার কোনো দায়ও আমার নেই। কিন্তু আমার বা তোমার কথায় তো কিছু হবে না। আর কি খবর আছে, বলো।

চা শেষ করে রুমালে মুখ মোছে মিণ্টু। এদিক ওদিক তাকিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে গলা নামিয়ে বলে, ইয়ে মানে—তুমি নিশ্চয় শুনেছ—আমাদের, মানে তোমার আমার, বিয়ের কথা চলছে।

নিস্পৃহ স্বরে বুয়া বলে, শুনেছি।

—তুমি নাকি কোনো মতামত জানাওনি!

—না। দৃঢ় ভাবে বুয়া বললো, আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে তুমি এসব করতে গেলে কেন? তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাওইবা কেন?

বিপন্ন বোধ করে মিণ্টু। কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। এসব প্রশ্নের জবাব হয় নাকি?

তবু বলে, তোমাকে বলিনি, তুমি রেগে ছিলে, আর এটা তো একটা জানা ব্যাপার, তুমি আমাকে বিয়ে করবেই, তোমাকে ছাড়া আমি তো জীবন কাটাবার কথা ভাবতেও পারি না। হয়ত বহুদিন ধরেই আই হ্যাভ টেকেন য়ু ফর গ্রেণ্টেড।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুয়া উঠে দাঁড়াবার জন্যে তৈরি হয়। ওর চোয়াল শক্ত।

—আমিও তোমাদের ঐ কোটার মধ্যে পড়ি নাকি?

মিণ্টুর বিবর্ণ মুখের দিকে একবারও না তাকিয়ে উঠে যায় বুয়া।

ওর ট্রেনের সময় হয়েছে।

জনকরামের ত্রিশূল

কানাই কুণ্ডু

পাথরের খাঁজে বিশাল ত্রিশূলটা আটকে নিচের দিকে তাকাল জনকরাম।

গিধরা পাহাড়ের চূড়া থেকে পাহাড়তলি সাফ দেখা যায়। শফেদ ছোট্ট তাঁবু নজরে পড়ে। কুর্তা কামিজ পরা পুতুলের মতো কয়েকটা মানুষের ঘোরাঘুরি। দুজন কুসিতে বসে থাকে। জনকরাম চোখের ওপর হাত দিয়ে সূর্যকে আড়াল করে। ভালোভাবে তাকায়। ভিনদেশী মানুষ দেখলে তার ডর লাগে। এই সব মানুষ বড় মতলববাজ। মতলব ছাড়া এতো দূরের গ্রাম দেশে কোনও ভদ্দর মানুষ আসে না। নিশ্চয়ই কোনও ধান্ধায় এসেছে। কিন্তু ধান্ধাটা কি আগে জানা থাকলে সামাল দিতে সুবিধা হয়। পাঁচ শাল আগেও একবার পাহাড়-তলিতে তাঁবু পড়েছিল। বাবুরা চুনাও লড়তে এসেছিল। দশ বিশ দিন ধরে আশপাশের গাঁ গেরামে হৈ হল্লা! বাবুছানারা রুপিয়া পয়সার লালচ দেখিয়ে গাঁওলি ঔরতদের নিয়ে জঙ্গলে গেল, মজাক উড়াল। মরদের সঙ্গে ঝগড়া মারপিট, জহরিলা সাপের বিষমাখানো তীরে খুনও হল দুজন। সব ঝামেলি তাকেই সামাল দিতে হল। থানা, পুলিশ, বিচার উচার। কিন্তু চুনাও-এর দিন গাঁওলি মানুষ কাতার দিয়ে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতে চুনাও-এর কাগজ। দালালরা ফুসলানি কথা বলে। জোড়া বলদ, দীয়া ছাপ নয়তো ধানের শিসে চিকা মারতে বলে। তারপর বাক্সভর্তি কাগজ নিয়ে তাঁবু উঠিয়ে চলে যায়। চুনাওতে কার জিত হল, কেউ বা হারল কোনও খবর মিলল না। গাঁ গেরাম আগের মতোই শুনশান। ভুখা মানুষ জঙ্গলে পাহাড়ে শিকারের তালাশে ঘুরে বেড়ায়। জংলি ফসল তুলে, সুখা লকড়ির আঁওল মাথায় নিয়ে হাটে বেচতে যায়। খেত জমিনে গাঁইতির কোপ পড়ে। বীজ গেড়ে ফসলের আশায় বসে থাকে। এই পঁচিশ বছরে ঝাউবনী গাঁয়ের কোনও বদল হয়নি। চারিদিকে টিলা পাহাড় জঙ্গল, পাহাড়গুলিতে খেত জমিন, বাবুয়া ঘাসের মাঠ খাঁ

খাঁ করে। লাওলি ঝোরার পানি সেই পুরানা দিনের মতো আজও বয়ে চলে। রাতভর তার আওয়াজ শুনতে শুনতে গাঁওলি মানুষ নিঁদ যায়।

কেবল তিন কোশ দূরে একটা নওয়া সড়ক হয়েছে। রামগড় শহর থেকে এই সড়ক ছালো, শিথরা হয়ে, মান্দ নদী পেরিয়ে চলে গেছে পেণ্ড্রা রোড। জঙ্গল বেহেড়ে ঢাকা সেই কোরবা এখন নাকি মস্ত শহর। জঙ্গল বেহেড়ে সব সাফ। কোয়লা খাদান, বিজলি কারখানা, অ্যালুমুনি কারখানা, ইঁসদেও বাঁধ আরও কত কি! ওই সড়ক দিয়ে এখন দিনে দুবার মোটর-বাস ছুটে যায়। মোড়ে মানুষ দেখলে বাস দাঁড়ায়। কাঁচা সড়কের উপর বাসের ধুলো ধোঁয়ার গন্ধ মানুষ প্রাণভরে টানে। বড় ভালো লাগে। রুপিয়া পয়সার যুগাড় থাকলে, কেউ দূরের গাঁয়ে বাসে চেপে রিস্তা করতে যায়। কিন্তু বারিষকালে মান্দ নদী পাড় ছাপিয়ে ওঠে। পাহাড় ফাটিয়ে, গাছ উখড়ে ছুটে চলে। তখন এপার ওপার বন্ধ, মোটর বাসও বন্ধ। পারের মানুষ পারেই থেকে যায়। রিস্তেদারীও বন্ধ থাকে।

কিন্তু এখন তো চুনাও-এর সময় নয়। বাবুদের সঙ্গে তো লালী নিলী ঝাণ্ডাও নেই। তাহলে এই সব ভিনদেশী বাবুরা এখানে তাঁবু গাড়ল কেন! কোন মতলবে এসেছে! জনকরামের মনে খটকা লাগে। গাঁয়ের লোককে সজাগ থাকতে বলতে হবে। ঝামেলিতে যেন কেউ না জড়ায়। আবার কোন আপদ শুরু হয় কে জানে।

এই অঞ্চলে সবচেয়ে উঁচু এই গিধরা পাহাড়। এর চূড়ায় উঠলে আশমান হাতের মুঠিতে এসে যায়। চূড়ায় কে কবে পাথর জুড়ে একটা মন্দির বান্ধিয়ে-ছিল, গাঁয়ের মানুষ জানে না। তারা আজন্ম এই মন্দিরটা দেখে আসছে। সেখানে পাথরের তৈরি বিবর্ণ এক দেবী মূর্তি। জনকরামই তাদের বুঝিয়েছে, এ মায়ের মূর্তি, ধরতিমাই। এই পাহাড় চূড়ায় দাঁড়ালে যে সব গাঁও পাহাড় খেতি জমিন জঙ্গল তল্লাট নজরে আসে, এই দেবী তার মাতাজি। প্রতি ফাগুয়ার পহেলা রাতে জনকরাম এখানে পূজা করতে আসে। মেলা জমে। বিশ পঁচিশটা গাঁয়ের মানুষ ভিড় করে, মুরগা বলি দেয়, রাতভর নাচাগানায় মাতোয়ালা। দুসরা বিহানে ধরতিমাইকে প্রণাম করে সবাই গাঁয়ে ফেরে।

কোরবার বিজলি কারখানার চোঙা বেয়ে শফেদ ধোঁয়ার ঘুরপাক। কালি সুতার মতো রায়গড় সড়ক বেয়ে একসার বয়েল গাড়ি চলেছে। এই পাহাড়ে গাছপালা নেই, কেবল পাথর। চড়াইতে যেমন দিলের দম কুলোয় না, উৎরাইতে

পা পিশলে যাবার ডর। কিন্তু উপরে চড়তে পারলে দিল ঠাণ্ডা হয়। আশমানের মেঘে শরীর ভরে যায়। কোনও শোক তাপ দুখ তকলিফ মনে থাকে না। দেবীজির মন্দিরে হেলান দিয়ে জনকরাম তাঁবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। এরা কি ফুর্তি করতে এসেছে! না কি সরকারি দাওয়া বাঁটোয়ারা করতে এসেছে। গাঁয়ে বড় বিমারীর সময় সরকার বাহাদুর বড়ি টিকিয়া বাঁটোয়ারা করে। কিন্তু এখন গাঁয়ে তো বিমারী নাই। জংলি পথ ধরে মানুষ কুশওয়াড়ার হাটে যায়। ফসল বেচে ঘরেলু শমান কিনে আনে। কিন্তু এই ভিনদেশীরা কেন!

খবরটা প্রথমে তাকে শুকলালই দিয়েছিল। শুকলাল গাঁয়ের গরু ভৈঁষা চরায়। পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। বিকেল নাগাদ যার গরু তার গোয়ালে তুলে দিয়ে লাওলি ঝোরায় স্নান করে। কাল স্নান না করেই সে সোজা তার ঝোপড়ায় এল। ভেতরে ঢুকে গোড় পড়ি মহারাজ বলে, হাত পেতে বসল।

এই অবেলায় তার ডাকে চমকে গিয়েছিল জনকরাম। তার হাতের ওপর একে একে দুই পা ছুঁইয়ে সে সামনে দাঁড়াল, কা খবর শুকলাল?

গিধরাতলিতে তাঁবু পড়েছে। ভিনদেশী ভদ্দর আদমি এসেছে। তাদের সঙ্গ সিপাই বন্দুক ভি আছে। আমি ভৈঁষা লিয়ে গাঁও ফিরছিলাম। আমাকে পুকারল। আমি জলদি ভেগে এলাম। একও বাত করিনি। ভিনদেশী আদমী বড়ি খতরনাক মালুম হচ্ছে।

নিরালা রাতে দীপের শিখায় চড়চড় আওয়াজ। ঘরের দেওয়ালে ত্রিশূলের লম্বা ছায়া কাঁপে। বাঁশছিলার চাটাইতে শুয়ে জনকরামের ঘুম আসে না। একা মানুষের এই বিপদ। এই সময় তার কথা দেওতার সঙ্গে। লাওলিঝোরার তল থেকে এক ডুবে এই পাথরটা সে তুলেছিল। তারপর তেল সিঁদুর ফুল চন্দনে সেই পাথরই তার শিউজি মহারাজ। শিউজির দিকে তাকিয়েই সে বলে, এ দেওতা, আমার ইজ্জত রাখবি। গাঁয়ে যেন ফির কোই ঝামেলি না হয়। তু হি আমার ভরোসা। আমাকে হিম্মত দে দেওতা।

এই উটকো ঝামেলি আজ তার নিঁদ হারাম করে। শান্তি কেড়ে নেয়। অথচ ঝাউবনী গাঁয়ের মানুষ বোধহয় ভুলে গেছে, সেও এই গাঁয়ের মানুষ নয়। ভিনদেশীর মতোই হঠাৎ একদিন এই গাঁয়ে এসেছিল, আনজান বেপহেচান। লাওলি ঝোরার পানি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। পরে নিজেই ঝাড় জঙ্গল সাফ

করে লাওলি ঝোরার ধারে নিড়ালি ঝোপড়ি বানাল। শিউজি মহারাজের পাথর রেখে ত্রিশূলটা পুঁতে দিল।

কিন্তু প্রথমে গাঁওলি মানুষ তাকে ইজ্জত দেয়নি। তার কথা বিশ্বাস করেনি। এক মুঠো চাওল বা দুটো শশা মাঙলে গালি বকত। তার গুণের কদর বোঝেনি। ভুখ তিয়াস আর অপেক্ষার কষ্টে সে পুড়তে লাগল। সে বিশ্বাস রেখেছিল, তার শিউজি ভগবানই একদিন সব সুরাহা করে দেবে। সত্যিই সুযোগ এসে গেল। তালাও কিনারে মানুষের ভিড় দেখে সেও এগিয়ে এসেছিল। মাঝখানে ঝাঁটি-রামের বারো বছরের ছেলে নিঃসাড়ে পড়ে আছে। তাকে কোলে নিয়ে মায়ের আকুলি বিকুলি। ছেলে আঁখ ফেড়ে তাকায় না, মা বলে ডাকেও না। কাঁধে বিশাল ত্রিশূলটা নিয়ে জনকরাম তার কাছে এল। কপালে ত্রিশূল ছুঁইয়ে নিজের কোলে তুলে নিল। নিজের ঝোপড়ায় নিয়ে এসে শুকনো শিকড় বেটে খাইয়ে দিল। তালপাতার পাখায় হাওয়া দেয়, মাঝে মাঝে নাকের কাছে গোবর চেপে ধরে। আধ ঘন্টার মধ্যেই ছেলে তাকিয়ে মা মা বলে ডেকে উঠল। ঝাঁটিরাম বলল, ধন্য হো মহারাজ।

ঝাঁটিরাম ঝাউবনী গাঁয়ের সর্দার। তার কথায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল জনকরাম। নিজেকে ধরতিমাই-এর সেবাইত, শিউজিকে ভক্ত ঘোষণা করল। চাল ফুল খুচরো পয়সার আমদানি শুরু হল। তাতেই জনকরামের চলে যায়। এখন সে গাঁয়ের সর্দারের চেয়েও বেশি হিম্মত রাখে। সব কাজে তার শলাহ নেওয়া হয়।

অথচ সবই শিকড় পাতার গুণ। সে জংলি শিকড় পাতার ব্যবহার জানত। এ সব তার আগের শিক্ষার ফল। তার গুরু আসলি জনকরামের কাছে শেখা। সুরগুজার নিয়তপুরে জনকরামের আশ্রম। তার ভারি খাতির। পঞ্চাশটা গাঁয়ের বিমারী আদমি তার আশ্রমে ছুটে আসে। শিউজিকে পূজা দেয়, বিমারীর দাওয়া মাঙে। জনকরাম তাদের কপালে এই ত্রিশূলটা ছুঁইয়ে, শুখা শিকড় বাকড় দিত। বলত, শিউজি মহারাজের ত্রিশূল। এই ত্রিশূল গেড়ে শিউজি কৈলাস পাহাড়ে বসে থাকত। আমি পূজা আরতিতে তার মন পেয়েছিলাম। আমাকে ত্রিশূলটা দিয়ে বলেছিল, বেটা, যা অব আদমির কলিয়ান কর। বিমারী আতুরের সেবা কর।

রিখিদাস, এটাই তার আসলি নাম। সেও জনকরামের ত্রিশূল, শিকড় বাকড়ে বিশ্বাস করত। সেও এইসব শিকড় বাকড় জড়ি বুটি শিখতে চেয়েছিল, মানুষের

খাতির পেতে চেয়েছিল। সে জনকরামের চেলা বনে গেল। বাপ-মা ঘর-দুয়ার ছেড়ে জনকরামের ঝোপড়ায় পড়ে থাকত। গাঁয়ের মানুষ, মা বাপ তাকে রিখি-দাস বলে পুকারলেও জনকরাম তাকে ডাকত বেটা বলে। তবে শিখিয়ে বুঝিয়ে দিত। সেও শিকড় পাতা চিনল। লুকিয়ে বিমারী মানুষের ইলাজ শুরু করল। লোকের বিমারী জলদি ভালো হয়। রিখিদাস নিজেই অবাক হয়ে যেত। সে তো শিউজির মামুলি ভক্ত। অথচ তার ইলাজে মানুষ জলদি সুস্থ হয়ে যায়। তাহলে, সে নিশ্চয়ই শিউজীর কিরপা পেয়েছে।

আঁধার বেলায় লোক রিখিদাসের খোঁজে আসে। বিমারীর ইলাজ পেতে চায়। কিন্তু লুকোছাপার এই ব্যাপার একদিন জনকরামের মালুম হয়ে গেল। গুসসায় টং। রাতের বেলা ডাণ্ডা হাতে তেড়ে এল। তু তো বরসদেও বনে গেছিস রে রিখিদাস! আমার ভাত খেয়ে আমারই খুন চুষিস! তু ঔর কভি ইধর কদম রাখবি না। হামেশাকে লিয়ে ইধরসে ভাগ যা। নহি তো এই ত্রিশূল দিয়ে তোর জান লিয়ে লিব।

সেও মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। বলেছিল, আমি ভি শিউজির কিরপা পেয়েছি। আমার ইলাজে আদমির বিমারী জলদি শুধার হয়।

আর কথা বলতে পারেনি জনকরাম। হাতের ডাণ্ডাটা ছুঁড়ে তাকে মেরে-ছিল। কপাল কেটে রক্ত ঝরল। সেও ঝোপড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

কিন্তু পালিয়ে আসেনি। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসেছিল। মাঝরাতের সন্নাটায় আস্তে আস্তে শিউজিথানে গেল। জনকরামের ভুলিকুস্তিটা তাকে হঠাৎ ঝাড়ের ভেতর থেকে আসতে দেখে একবার ঘাউ করে উঠল। কিন্তু সেই তো তাকে বরার টেংরি, হরিণের হাড় খেতে দিয়েছে। দুবার চু চু করতেই লেজ নেড়ে পায়ের কাছে কেতরে পড়ল। সে শিউজিকে প্রণাম করল, কসুর নিও না দেওতা। আমি আপন তকদীর বানাতে যাচ্ছি। তোমার দুয়া চাই।

পাশে খাড়া ত্রিশূল। সেদিকে তাকিয়েই হাত বাড়িয়ে কাঁধে তুলে নিল। হয়তো হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগবে। বাপ মা দেশ গাঁও ছেড়ে হাঁটা শুরু করল। কটা রাত, কটা দিন ঠিক মনে নেই। লাওলি ঝোরার পানি আঁজলা ভরে খেয়েছিল।

ঝাউবনী গাঁয়ের মানুষ তাকে ভিনদেশী মূর্তা ভেবে এগিয়ে এসেছিল। দু-চারবার ডাকাডাকি করেছিল হয়তো। পাশ ফিরতেই সে শুনেছিল, কৌন হো?

জনকরাম। হঠাৎ এই নামটাই তার মুখ থেকে বাইরে এল।

তারপর থেকে সেও জনকরাম মহারাজ নামে পরিচিত হল।

ভুখনের রিস্তেদারীতে যাওয়া হল না। গৌরীগাঁও থেকে খবর এসেছে, তার মঝলি লড়কির পহলি বিয়ান হয়েছে। একটা সুন্দর টুরী। টুরী বিয়ালে বড় আনন্দের খবর। কৌনও রকম পাঁচ সাত শাল ওমর তক বড় করা। তারপর নানা গাঁও থেকে লড়কার বাপেরা লড়কার শাদির বাত পাক্কি করতে ঘরে হাজির। শো দো শো রুপিয়ার বন্দোবস্ত, সঙ্গে দু চার বোরা ধান জাওরা। তাই লড়কি বিয়ানের খবর মিললে বাপঘর থেকে কিছু দিতে হয়। ভুখন দুটো মুরগা হাতে ঝুলিয়ে সকালেই কটুম ঘর যাচ্ছিল। গিধরা পাহাড়ের কোল ঘেঁসে পায়ে হাঁটা ফালি রাস্তা। একদিনের পথ। আঁধার নামার আগেই কুটুম ঘরে পৌঁছোতে হবে। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে প্রায় ছুটে চলছিল। হঠাৎ ভিনদেশী বাবুদের শিকলি নিয়ে পাহাড় মাপতে দেখে থমকে দাঁড়াল। আজব ব্যাপার, পাহাড় কি শিকলি দিয়ে মাপা যায়? ইতনা বড়া পাহাড়ে কিসের মাপ? তারা শিকলি ধরে ক্রমশঃ এগিয়ে আসে। ভুখনকে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে, ইধর আও।

পেছনের রাস্তার চিন্তাই ভুখনের মাথায় এল। একদৌড়ে গাঁয়ে চলে আসা যাবে। কিন্তু বাবুটা আবার কথা বলে, বেচোগে?

ভুখনের মনে হল, বাবুরা বোধহয় পাহাড়টাই তার কাছ থেকে কিনে নিতে চায়। কিন্তু সে তো পাহাড়ের মালিক নয়। পাহাড়ের মালিক ধরতিমাই। সেখানে তার মন্দির। তার সেবাইত জনকরাম। নিচে লাওলি ঝোরার পাশে জনকরাম মহারাজের ঝোপড়ি। সেখানে তার ত্রিশূল খাড়া। ইচ্ছে করলে মহারাজ এই পাহাড় বেচতে পারে। সেও নিশ্চয়ই ঝোপড়ির আশেপাশেই আছে। বাইরে গেলে ত্রিশূলটা ঘাড়ে নিয়ে যায়। সে কি মহারাজকে ডাকবে!

বাবুরা এগিয়ে আসে। মুরগা দুটোর পালক উল্টে দেখে। কা দাম বাতা। তিশ রুপিয়া দিব।

ভুখন কোনও কথা বলে না। এক পা এক পা পিছিয়ে আসে। এক বাবু কুর্তার পকেট থেকে দুটো কুড়ি টাকার নোট দিয়ে তার হাত থেকে মুরগা দুটো নিয়ে নেয়। বলে, ইসসে জাদা নেহি হোগা।

তৎক্ষণাৎ গাঁয়ে ফিরে আসে ভুখন। গাঁময় সোরগোল তোলে। ভিনদেশী বাবুরা গিধরা পাহাড় মাপছে। পাহাড় খরিদ করতে চায়। আমাকে দুটো মুরগার দাম কত দিয়েছে জানিস? চালিশ রুপিয়া! অব আমার সারা মুরগা ওই বাবুদের কাছে বিকে দিব।

কিন্তু পাহাড় মাপার কথায় জনকরাম চিন্তিত হয়। নূতন কোনও বিপদের সূচনা দেখতে পায়। সে ভাবে, এখনই বাধা দেওয়া উচিত। দেরী হলে আর থামানো যায় না। সে ত্রিশূলটা ঘাড়ে নিয়ে গিধরা পাহাড়ের দিকে বেরিয়ে পড়ে।

বাবুরা তখনও পাহাড়ের ওদিকে শিকলি টানছে। খুঁটা পুঁতে দাগ মারছে। এক বাবু তিনটে কাঠের ঠ্যাংওলা দাঁড়ের উপরে কাঁচের চোঙ বসিয়েছে। বহুত দূরে আরও এক বাবু শাদা কালো রঙ করা একটা লকড়ি এদিক ওদিক বসাচ্ছে। বাবুটা চোঙের ভিতর দিয়ে কি সব দেখছে। দলবল নিয়ে জনকরাম মাঝখানে দাঁড়ায়। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখময় দাড়ি গোঁফ। কাঁধের ওপরে তোলা ত্রিশূল। কোমরে একফালি ন্যাকড়া জড়ানো। গিধরা পাহাড়ের পাথরের মতোই কালো শক্ত শরীর। কপালের মাঝখানে বড় মাপের সিঁদুরের টিপ। বাবুটা যেন একটু ভয় পেয়ে যায়। জনকরাম জিজ্ঞাসা করে, ইধর লাপ উপ কিস বাত কে?

ইধর সে সড়ক তৈয়ারি হবে। এই সড়ক রায়গড় পেণ্ড্রা রোড সড়কের সাথ মিলে যাবে। উসিকা মাপ হো রহা। লেকিন আপ?

হম জনকরাম, ধরতিমাই কি সেবাইত জনকরাম। সে ত্রিশূলটা বাবুর কপালে ছুঁইয়ে দিয়ে আবার বলে, লেকিন গাঁও ওয়ালে কে সাথ কৌনও ঝামেলা নহি করনা।

নেহি সাধুবাবা, বলে বাবুটা জনকরামের হাতে একটা টাকা দেয়।

খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয় না। গাঁয়ে সড়ক তৈরি হবে। মাটি কাটা, পাথর বিছানোর কাম মিলবে। কুছ দিনকে লিয়ে ভরপেট খানা মিলবে, মৌজ হবে।

এক মাসের মধ্যেই সড়কের কাজ শুরু। গাঁওলি মানুষও কাজের হুজুগে মেতে ওঠে। দেড় টাকা রোজের মজুরী। সারা গ্রামে খুশির হাওয়া বয়। চাঁদনী রাতে গাছতলিতে আসর বসে। ধামসা মাদল বাজে। দারু মাংসে মানুষ

মাতোয়ালা। সড়ক এগিয়ে চলে। গিধরা পাহাড় ঘিরে পাক খেতে থাকে। ওদিকে রায়গড়-পেণ্ড্রা রোডের মুখে দপ্তরখানা, বাংলো, কোঠি শুরু হয়ে যায়। দানবের মতো মেশিন আসে। ডজার ক্যাটারপিলার ডাম্পারের আওয়াজে গ্রাম জঙ্গল গমগম করে। হাজার মানুষের কাজ দু ঘণ্টায় সারা। জঙ্গল চেঁছে ছিলে সাফ, টিলা মাটিসমান। বাড়তি মাটি পাথর ঝোরার ধারে ডাঁই করে রাখা হয়। জঙ্গলের জানোয়ার আরও গভীরে চলে যায়। গাঁয়ের মানুষ মজদুর বনে যায়। হপ্তায় পগার উঠায়, দারু খায়, গাছতলায় পড়ে থাকে। সকালে কোদাল গাঁইতি নিয়ে আবার কাজে সামিল।

সড়ক পাহাড় পাক দিয়ে থেমে গেছে। কোরবার বিজলি কারখানা থেকে খাম্বায় বিজলি চলে এসেছে। আলোয় বাবুদের রাস্তা মাকান, ঘর দুয়ার ঝলমল করে। জনকরাম পাহাড়ে চড়তে কষ্ট পায়। কাঁধের ত্রিশূল ভারী মনে হয়। মন্দিরে পুজো দিতে বসে, দেওতায় মন বসে না। কানের ভিতর টিটি পোকার ফরফরানি। বাবুদের মতলব সে বুঝতে পারে না। সড়কের কাজ শেষ হলেও বাবুরা তো ঘর মাকান বানিয়ে দিব্যি বসে গেছে। নানারকম মিসিন আমদানি করেছে। হঠাৎ তার সব চিন্তার জট ছিঁড়ে গুম গুম শব্দে পাহাড় কেঁপে ওঠে। ফাটলের খাঁজে পোঁতা ত্রিশূলটা ঠং ঠং শব্দে গড়িয়ে পড়ে। পাহাড়ের একদিক ফেটে চৌচির। পুজো শেষ করতে পারে না জনকরাম। ত্রিশূল ঘাড়ে নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসে।

পাহাড়ের একদিক চৌ-চাকলা। ঝুর ঝুর পাথর ঝরে পড়ছে। টুপি মাথায় দেওয়া এক বাবু, সঙ্গে আরও দু-চারজন দাঁড়িয়ে থাকে। পাশে হুডখোলা জিপ। জনকরাম নিজের পাঁজরেই ভেঙে যাবার ব্যথা টের পায়। এমন তো কথা ছিল না। এরা পাহাড় ভেঙে সড়ক গড়বে। সে আরও এগিয়ে যায়। গাঁয়ের স্কুল, ভজন, ধনিয়া, ভুখন যাদবেরাও গাঁইতি কোদাল নিয়ে উপস্থিত। এক বাবু হুকুম দেয়, অব মাটি পাথর সব উঠাও।

বাবুর কথামতো তারা ঝুড়িভরে পাথর তোলে। পাহাড়ের বুকে গাঁইতি চালায়। একটু পরেই খান কয়েক ডাম্পার হাজির হয়। মাটি পাথরের টুকরো সশব্দে বোঝাই হতে থাকে। জনকরাম হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সামনে দাঁড়ায়। রুক যা স্কুল। এ ভজন, ধনিয়া রুক যা।

তারা কাজ ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। টুপি পরা বাবুটাও যেন থমকে দাঁড়ায়। গটগট করে জনকরামের কাছে এসে বলে, কোন হ্যায় আপ ?

তু কৌন হো ?

আমি এই সিমেণ্ট কারখানার চীফ এঞ্জিনীয়ার। লেকিন তুম ?

ই পাহাড়ি পর কোই চোট নেহি। কোই ইধর টোরফোর করবে না।

কিঁউ ? এই পাহাড় তোমার ?

ধরতিমাইকে হৈ। হম ওকার সেবাইত।

যাও ওদিকে গিয়ে সেবা কর। এখানে কোনও গোলমাল করবে না। এই এলাকা আমরা লিজ নিয়েছি। লও ভাই তোমরা আপন কাম কর।

জনকরাম নিজের কপালে ত্রিশূল ছুঁইয়ে বলে, ধরতিমাই কি কসম, কোই ইধর গাঁইতি চালাবে না। পাহাড় পর হাতিয়ার লাগাবে না।

ভুখন বলে, এমে কোই কসুর নেই। আমাদের ভাত রোটি মিলছে। দুখ তকলিফ কমেছে, রুপিয়া মিলছে। ধরতিমাইকে আমরা বড়কা পূজা দিব। আও ভাইলোগ কাম কর। ভুখন নিজেই এগিয়ে যায়। জনকরামের সামনেই পাহাড়ের বুকে গাঁইতির কোপ মারে। তাকে দেখে ধনিয়াও এগিয়ে যায়। কিন্তু বাকিরা যেন পাথর হয়ে গাঁইতি কাঁধে তুলে রাখে।

সন্ধ্যায় জনকরাম গাঁয়ের আসরে উপস্থিত। গোড় পড়ি মহারাজ ব'লে মজলিশের মানুষ তাকে অভিবাদন জানায়। জনকরাম বলে, আমার দিল বেচইন হয়েছে। ই গাঁওয়ে আর সুখ নাই।

তার কথায় মানুষের চোখে মুখে হতাশা। জনকরামই যে তাদের বিমারী ইলাজের, সব আপদ-বিপদের রাখওয়ালে। দশটা গাঁয়ের সুখদুখের সাথী। সে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে ! ঝাঁটিরাম বলে, আমাদের কা কসুর হল মহারাজ ?

তোরা জানিস এই পাহাড়, জঙ্গল, লাওলি ঝোরা, জঙ্গলকে জানবর ঔর চিড়িহা, ই সবকে মালিক ধরতিমাই। মাতাজির হুকুমে জঙ্গলে ফসল হয়, ঝোরার পানি বয়ে চলে। আশমানে মেঘ আসে, খেতিতে বারিষ ঝরে। লেকিন কেন ? কেন ই সব হয় ?

কেউ জবাব খুঁজে পায় না। জানলেও কেউ কিছু বলতে চায় না। কেবল অবাক চোখে জনকরামের দিকে ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে থাকে। অন্ধকার চৌরহার মাঝখানে কাঠকুটো জ্বলার চড়চড় শব্দ।

জনকরামই আবার বলে, কারণ আমরা মাতাজির লড়কা বাচ্চা। ম-ই আমাদের জন্য ইসব ব্যবস্থা করে। সেই ধরতিমাই-এর বুকে তোরা গাঁইতি চালাস, তার হাড্ডি টোড়ে ভিনদেশী বাবুদের গাড়িতে বুঝাই করিস। মাতাজির বড়ি দুখ হয়েছে রে। আমি দেখতে পারছি না। আমি ইধরসে চলে যাব।

জনকরাম নির্বাক মানুষগুলোর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। কিছুটা বিশ্বাস, কিছুটা সন্দেহ তাদের মাঝখানে দুলতে থাকে। সে আবার বলে, ঔর থোড়ি দিন আমি দেখব। লেকিন খেয়াল রাখবি, মাতাজির গুসসা হচ্ছে। ফির কোই বেইমানী করলে, মাতাজি তাকে জিন্দা রাখবে না। আমিও বিমার উমার হলে তার ইলাজ করব না।

হঠাৎ সারা তল্লাটে মজদুরের অভাব হয়ে যায়। পাহাড়ে কেউ গাঁইতির কোপ বসাতে চায় না। সিমেণ্ট কারখানার কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়। বাবুরা গাঁয়ে গাঁয়ে চোঙা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রথমে নোকরি থেকে সবাইকে বরখাস্ত করার ভয় দেখায়। তবুও কেউ এগিয়ে আসে না। এ এক আশ্চর্য পরিস্থিতি। রায়গড়, বোম্বাই থেকে বড় সাহেবরা আসে, আলোচনা শুরু হয়। খানাপিনায় হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু পাহাড় থেকে চুনা পাথর এক দানাও ওঠে না।

আবার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোষণা হয়। মজুরী বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দু-টাকা চার আনা রোজি মিলবে। তিনদিনের মধ্যে যারা আসবে তাদের নোকরি পাক্কা। এর পরে এলে, আর আদমি নেওয়া হবে না।

অবস্থা অপরিবর্তিত। জনকরাম পাহাড় চূড়ায় বসে মাতাজির পুজো করে। বলে, মানুষের মনে বিশ্বাস দে মা। তোর আসন তোকেই রক্ষা করতে হবে। তবেই আমি তোর পূজা দিতে পারব।

তিনদিন পরেই বিলাসপুর বস্তার থেকে শয়ে শয়ে মজদুর আমদানি হয়। লাওলি ঝোরার ওপারে টিনের ব্যারাকে তাদের থাকার বন্দোবস্ত, ঘরে বিজলি বাতি। হাসি গান সুখের কলকলানি গাঁয়ের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। ভুখন আর ছোটে লালাও পরিবার নিয়ে লাওলি ঝোরার ওপারে চলে যায়। আবার গুম গুম শব্দে পাহাড় ফাটে। বিশটা গাঁ কেঁপে ওঠে। চুনাপাথর গাড়িতে বোঝাই হয়ে কারখানায় চলে যায়। গাছের পাতা হলুদ হয়, খসে পড়ে। চূড়ার মন্দিরে ফাটল ধরে।

জনকরামের মনে শান্তি নেই। সে ত্রিশূল কাঁধে উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়ায়।

তার শরীরময় ধুলো, চোখ লাল। চোখে ঘুম নেই। সে একটা বিহিত খুঁজে বেড়ায়। তার চেয়েও বাবুরা অনেক শক্তিশালী। তাদের রুপিয়া ধন-দৌলতের কাছে তার শিউজি ভগবান, দেবী ধরতিমাইও হেরে যাচ্ছে। তাহলে ঝাউবনীতেই তার শেষ। না, হিম্মতে হেরে গেলে চলবে না। চোরের মতো, রণ্ডি ভরতের মতো সে রাতের আন্ধারে গাঁও ছেড়ে ভেগে যাবে না। তার শেষ লড়াই শুরু করবে।

এখন সে ত্রিশূল কাঁধে দিনরাত গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। লাওলি ঝোরার ওপারে নওয়া কুলিপাড়ায় মানুষ দেখলে বলে, ধরতিমাইর রোনা শুনতে পাচ্ছিস। জমিনে কান পেতে শুন, ধরতিমাইর আঁসু ঝরছে।

মানুষগুলো আতঙ্কিত হয়। কিছুক্ষণ বিবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তাদের কতটুকু ক্ষমতা। ঘর পরিবার আছে, পেটের ভুখ আছে। অসহায় ভাবে জনকরামকে দেখে। জনকরাম ত্রিশূল নিয়ে তখন অন্য গাঁয়ে রওনা হয়।

ঝাউবনীর মানুষও এখন জনকরামকে দেখলে ভয় পায়। মানুষটা ঘর ঝোপড়ি ছেড়ে দিয়েছে। শিউজির পূজা হয় না। শুখা ফুল পাতা পড়ে আছে। ঘড়ায় পানি নেই। লোকটা কেবল ঘুরে বেড়ায়। বিড় বিড় করে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কোনও গাছের নিচে দাঁড়ায়। পাখির দিকে তাকিয়ে থাকে। কাঠবিড়ালির ডাক শুনলে চমকে ওঠে। ভাঙাচোরা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে কাঁদে। চোখ বেয়ে ঝর ঝর ঝর আঁসু গড়ায়। বলে, সত্যনাশ হয়ে যাবে। কোই রুখতে পারবে না। দুনিয়া খতম হয়ে যাবে।

তারা ভয়ে কুঁকড়ে যায়। নিজেরাই শিউজির মাথায় পানি ঢালে, ফুল চড়ায়। মাথা নুইয়ে প্রণাম করে। ই আপদ তাড়িয়ে দে দেওতা। মহারাজকে দিলমে শান্তি এনে দে।

কিন্তু জনকরাম শেষরাতের জ্যোৎস্নায় পাহাড় চূড়ায় বসে শীতে কাঁপতে থাকে। মন্দিরের পাশে একা ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে কখনও ঘুরে বেড়ায়। শুকনো কাঠকুটো জেলে শরীর গরম করে। কিন্তু শান্তি পায় না। চারিদিকে ঘোরালো চোখে তাকায়। ফাঁকা বন জঙ্গল, হাড়গোড়ময় পাহাড়, গর্তের ভিতরে চাপা অন্ধকার। আকাশে দুই হাত তুলে বিকট শব্দে হা হা করে কাঁদে। তার কান্না লাওলি ঝোরার দুই পারের বস্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। থমথমে ভয় ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। মা

ছেলেকে কোলে টেনে নেয়। মনে মনে বলে, পাপ নিও না মাতাজি। পেটের খাতির তোমাকে চোট দিচ্ছি।

পাহাড়ি চট্টানে জনকরামের ত্রিশূলের ঠং ঠং। সে ভাবে এই তার অস্তিত্বের শেষ লড়াই। নিজেকে প্রতিষ্ঠার লোভে একদিন রাতের আঁধার একা ছুটে এসেছিল। তারপর অপেক্ষা, ভুখের যন্ত্রণা, কষ্ট। নিজের গুণেই সে খাতির পেয়েছিল। আপন হিম্মতে সে বিশ-ত্রিশটা গাঁয়ে পহেলা মানুষ। নিজের হিম্মতে সারা তল্লাটের ঝড় তুফান বিপদ আপদ আগলে রেখেছিল। আবার এক কঠিন লড়াই। এবং ধরমই তার শেষ হাতিয়ার। কেবল আর দুটো রাত বাকি।

আজ ফাগুয়ার পহেলা রাত। পাহাড় চূড়ায় আবার গাঁওলি মানুষের ভিড়। ধরতিমাই-এর পুজো দিতে মেলা দেখতে এসেছে। ওদিকে পাহাড়ে প্রায় অর্ধেক খোবলানো। সেখানে বিশাল গহ্বর। চুনা পাথর ওঠাতে ওঠাতে ক্রমশ পাতালে নেমেছে। তবু ধরতিমাই-এর উপর মানুষের অগাধ বিশ্বাস। সিমেন্ট কারখানার বাবুরাও মন্দির বাঁচিয়ে গোঁড়াখুঁড়ি করে। জায়গার অভাবে মেলা পাহাড়ি ঢালে ছড়িয়ে পড়েছে। পুজোয় নাচ গান উৎসব হয়। নানা গাঁয়ের মানুষ মিলে মিশে একাকার। লাওলি ঝোরার ওপারে নওয়া বস্তির মেয়ে মরদেরাও হাজির। জোয়ান ছেলেমেয়েরা মাথায় টিয়া হড়িয়ালের পালক গুঁজে উজালা রঙের শাড়ি কাপড় শক্তভাবে জড়িয়ে সেজেছে। পুজো শেষ হলে তারা নাচ গান হল্লায় মেতে উঠবে। কোম্পানিও দুদিনের ছুটি দিয়েছে। চারিদিকে ফুর্তির মেজাজ।

জনকরাম আজ এক বিশেষ মানুষ। তাকে দেখে ভিড় সরে যায়। মানুষ জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। গোড় পড়ি মহারাজ ব'লে অভিবাদন জানায়। কিন্তু জনকরাম কোনও কথা বলে না। কারও দিকে তাকায় না। শীতের রাতে লাওলি ঝোরায় স্নান সেরে খোলা শরীরে ঠক ঠক কাঁপতে থাকে। শরীর দুর্বল, পায়ে জোর পায় না। কাঁপতে কাঁপতে কোনও রকমে মন্দিরের দরজায় বসে। বিশাল দুটো প্রদীপ জেলে দেয়। ছোট মন্দিরের ভিতরে দুই প্রদীপের জলন্ত শিখায় দেবীমূর্তি দৃশ্যমান। আজ জনকরামের সঙ্গে কেউ কথা বলে না, পাশে দাঁড়ায় না। তারা বিশ্বাস করে, আজ মহারাজের শরীরে দেওতা ভর করে। সে আর মানুষ থাকে না।

প্রচুর চাল ফল তেল ঘি পুজোর নৈবেদ্য এসেছে। মন্দিরের ভেতরে জায়গা হয়নি। বাইরে কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় থরে থরে সব সাজানো। জনকরাম

পুজোয় বসে। মন্ত্র পড়ে। তু ধরতিমাই কি পাতাল ভৈরবী আমার মালুম নেই। লেকিন তু আমার আখরি হাতিয়ার। আজ তোকে জাগতে হবে মাই।

মন্ত্রের সঙ্গে সে দেবীমূর্তির শরীরে তেল ঘি ছড়ায়। সারা মন্দিরময় তেল ঘি-এর ছড়াছড়ি। তেল ঘি-এর প্রলেপ মন্দির চুইয়ে ঝরে পড়ে। এবার শেষ পূজা, মহাযাগ। রাতের কোলাহল ছাপিয়ে ভয়ঙ্কর শব্দে ধামসা বাজে। পাহাড় থেকে পাহাড়ে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে। সব মানুষ মন্দিরের আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। ধরতিমাই কি জয় শব্দে আকাশ মুখরিত।

হঠাৎ দেবীমূর্তির শরীরময় দাউ দাউ আগুনের শিখা। সেই আগুন মন্দিরে ছড়ায়। ভীষণ শব্দে পাথর ফাটতে থাকে। স্তম্ভিত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে জনকরাম চিৎকার করে, ধরতিমাইকে দেখ। তোদের পাপের নতিজা দেখ। মাতাজির শরীরে গাঁইতি মারলি, আঁখের সামনে টোড়ফোড় দেখলি। অব আপনা সামাল। ই গাঁও, ঘর, আদমি বাচ্চা সব খাক হয়ে যাবে। মার কাছে মাফি মাঙ। ওয়াদা কর, কভি গাঁইতি মারবি না, টোড়ফোড় করতে দিবি না।

মানুষ ভয়ে কেঁদে ওঠে। পাহাড় থেকে দৌড়ে নিচের দিকে পালায়। শুকনো পাতায় ছাওয়া মেলার অস্থায়ী দোকানপাট দাউ দাউ জ্বলতে থাকে। কে কত তাড়াতাড়ি নিরাপদে পালাতে পারে, এই চেষ্টার হুড়োহুড়ি। কেবল ভুখন জনকরামের দিকে এগিয়ে আসে। চিৎকার করে বলে, ইসব ঝুট, নকলি আছে। আমরা মাতাজির লড়কা বাচ্চা। আমাদের তরক্কি হলে মাইজি খুশ থাকবে। আমরা পাক্কা মন্দির···

তার কথা শোনার জন্য আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই। কেবল মুখোমুখি জনকরাম।

সেই রাতেই নওয়া বস্তির মানুষ মাথায় সংসার নিয়ে রামগড় স্টেশনের দিকে হেঁটে যায়। তাদের চোখে মুখে অমঙ্গলের ভয়। কোম্পানিকে বাধ্য হয়ে পুলিসের সাহায্য নিতে হয়। পরেরদিন দুপুর নাগাদ পুলিস সদলবলে আসে। কিন্তু জনকরামকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল পাহাড় চূড়ায় পোড়া মন্দিরের পাশে দেখা যায়, ভুখনের বুকে গাঁথা জনকরামের সেই ভারি ত্রিশূল।

হাত

আদিনাথ ভট্টাচার্য

মাঝে মাঝে এমন হয়। শীততাপনিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত ঠাণ্ডা ঘরে নরম রিভিলভিং চেয়ারে বসে অখণ্ড মনোযোগে বিবেচনা এবং সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সম্বলিত নথিপত্র দেখতে দেখতে হঠাৎ সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। রিপোর্ট, টার্গেট, প্ল্যানিং, পরবর্তী বোর্ড মীটিং, আসন্ন বিদেশ সফর, বিবাহবার্ষিকীর রজতজয়ন্তী উদযাপনের সময়োচিত পরিকল্পনা ও আয়োজন, এম. আই. টি. তে জ্যেষ্ঠপুত্রের গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষার্থে যাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি মহৎ সব উপাদানে গঠিত যে অভ্যস্ত অতিপরিচিত বাস্তব জগৎ তা সহসা ঝাপসা হতে হতে বিলীন হয়ে আসে, একটা উদাস করা ধূসরতার আক্রমণ সব-কিছু ওলটপালট করে দেয়, রোদবৃষ্টি ঝড়ে কেবলই উড়তে থাকা সামুদ্রিক পাখির পাগলামি মাথার মধ্যে নড়ে চড়ে। ঠিক মৃগী রোগীর মতো, এক মুহূর্ত আগেও টের পাওয়া যাবে না পরের মুহূর্তে বাস্তব চৈতন্যের অবলুপ্তি ঘটতে চলেছে। রেন অ্যাণ্ড কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অপরেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাঝে মাঝে এমন হয়।

মাঝে মাঝে, কিন্তু ঘন ঘন নয়। কচিৎ কদাচিৎ ন-মাসে ছ-মাসে হয়তো একবার। প্রতিবার আক্রমণের তীব্রতাও একরকম থাকে না, কোনোবার কম কোনোবার বেশি। কম হলে খানিকটা মানসিক বিপর্যয় ঘটে ঠিকই, কিন্তু অপরেশ সেটা আত্মস্থ করে নিতে পারেন এবং যেহেতু তাঁর স্তরবদ্ধ নিজস্ব সমাজ-সংসারে নিরুচ্চার এবং নিষ্ক্রিয় ভাবান্তর লক্ষ্য করার মতো ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বিরল সেই কারণে পুরো ব্যাপারটা সকলের অগোচরে থেকে যায়। কিন্তু এক-আধবার আক্রমণ বেশ তীব্র হয়। তখন তাঁর ভাবান্তর অলক্ষিত থাকে না, আচার আচরণ ব্যবহারে সুস্পষ্ট কক্ষচ্যুতি ধরা পড়ে, তাঁর পরিচিত গণ্ডীর মানুষজন সন্দিগ্ধ দুর্বোধ্যতার কলরব মুখর হয়ে ওঠে—দুয়েকদিন এরকম থাকে, তারপর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে আসে।

বছর চারেক আগে শেষবার এ রকম ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছিল। সেবার

তাঁর অনতিস্বচ্ছল কৈশোর তাঁকে গ্রাস করেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সাল। উত্তরবঙ্গের একটা মফস্বল সহর। জেলা স্কুলে ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। তার স্কুলমাষ্টার বাবা, সারাদিন ঘরকন্নার চাপে ব্যতিব্যস্ত মা, ভাই-বোন, পিসি মামা মাসি—তাদের ছেলেমেয়েরা, স্কুলের সহপাঠীরা, গ্রামাঞ্চলে একফালি ধানী জমি, রাত থাকতে থাকতে ঘুম থেকে উঠে গরুরগাড়ি চেপে শিশির-ভেজা মেঠো রাস্তা বেয়ে বাবার সঙ্গে কখনও কখনও ফসল তোলার সময় সেই জমিতে যাওয়া। অপরেশ অকস্মাৎ সেই সময় বদ্ধ জগতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন এবং পুরো এক সপ্তাহ সেখানে আটকা পড়েছিলেন। সমস্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে ছুটি নিয়ে মেজো ভাইয়ের বাড়িতে দুর্গাপুরে একদিন কাটিয়ে এসেছিলেন, বৈদ্যবাটিতে ছোটোভাই এবং নৈহাটিতে দিদির বাড়ি সকাল থেকে সন্ধ্যা অতিবাহিত করেছিলেন। ভাই-বোনেরা আনন্দের চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময় বোধ করেছিল, কারণ সম্পর্ক ক্ষয়ে যেতে যেতে যখন প্রায় বিস্মৃতির পর্যায়ে উপনীত, সেই সময় সম্পূর্ণ খোলামেলা উদার আন্তরিকতায় ভরপুর হয়ে দূরের মানুষ রাশভারি অপরেশের আবির্ভাব তাদের কাছে এতই অপ্রত্যাশিত ছিল যে প্রাথমিক বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠতে তাদের অনেক সময় লেগেছিল। তারা প্রথমটায় খোলসের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছিল। সসম্ভ্রম যত্ন-আত্তির মধ্যে কোনো ত্রুটি ছিল না কিন্তু দূরত্ব ছিল। কিন্তু অপরেশের অনায়াস অন্তরঙ্গতা এবং বাল্য-কৈশোরের বিচিত্র অনুষঙ্গ সব বরফ গলিয়ে দিয়েছিল, সব দূরত্ব মানসিক বাধা কেটে গিয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে জমে ওঠা ধুলোর আস্তরণের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা ঝকঝকে নিটোল সম্পর্কের আয়নায় সকলের হারিয়ে যাওয়া আনন্দের আন্তরিক মুখগুলো প্রতিফলিত হয়েছিল! প্রত্যাশা এবং প্রতিশ্রুতি ছিল—নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে এই আনন্দের রেশ বজায় থাকবে। কিন্তু চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই অপরেশ আত্মস্থ হয়েছিলেন এবং যদিও তাঁর ভাইবোনেরা তারপর যাতায়াতের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিল, ক্রমবর্ধমান শীতল ঔদাসীন্যের চাপে আন্তরিকতার প্রত্যাশা এবং প্রতিশ্রুতি মরে গিয়েছিল। গত চার বছর অপরেশের আর কোনো যোগাযোগ ঘটে নি। রেন অ্যাণ্ড কোম্পানির কর্ণধার অপরেশ আবার তাঁর অভ্যস্ত মাপা কক্ষপথে ফিরে এসেছিলেন যার পরিধিতে বর্তমান এবং কেন্দ্রবিন্দুতে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যেখানে অতীতের কোনো স্থান নেই।

কিন্তু আজ, এই কিছুক্ষণ আগে, একান্ত অনন্যচিত্তে গভীর একনিষ্ঠতায় যখন

তিনি কোম্পানির সাবসিডিয়ারি গঠন সংক্রান্ত মেমোরেণ্ডামে ফাইন্যাল টাচ দিচ্ছিলেন তখন একেবারে বিনা নোটিশে তাঁর মগ্নচৈতন্যে মৃদু বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো কী যেন একটা চমক দিয়ে গেল। অভিনিবেশের সংবদ্ধতায় একটু চিড় খেয়ে যায়। সাত নম্বর আর্টিকেলের বয়ানে ঘষামাজা সংশোধন করতে উদ্যত হয়েছেন, ঠিক তখনই এই ঘটনা। পারস্পরিক চিন্তা খানিকটা এলোমেলো হয়ে যায়। অপরেশ নিজের উপরেই কিঞ্চিৎ বিরক্ত বোধ করেন, ঈষৎস্খলিত চিত্তকে শাসন করে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। একটা সিগারেট ধরান, বেয়ারাকে ডেকে ভারী পর্দাগুলোকে আরও ভালো করে টেনে দিতে বলেন যাতে বাইরের আলো হাওয়া শব্দ একদম ঘরে না ঢোকে।

কিন্তু সব চেষ্টা বিফল হয়। আপাত দুর্ভেদ্য পরিবেশের বর্ম ভেদ করে একটা ধূসর সততসঞ্চরণশীল বিপরীতগামী সামুদ্রিক পাখি অকস্মাৎ তাঁর চৈতন্যে ঢুকে পড়ে। চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত অপরেশ কিছু বুঝতেও পারেন না। ঠিক মৃগীরোগীর মতো। যখন বুঝতে পারেন তখন আর কিছু করার নেই। তাঁর চৈতন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত বাস্তব জগৎ এখন ক্রমশ বিলীয়মান, ধূসর বিপরীতগামী পাখির আত্মার তিনি এখন সহচর।

পাখি তাঁকে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণের জগতে নিয়ে চলে। ১৯৫৩ সাল। প্রেসিডেন্সি কলেজ···অর্থনীতি বিভাগ···হিন্দু হোস্টেল···অনুপ সত্যেন দেবাশিস আর···। অপরেশের মাথার ভিতরে জ্যোৎস্না-ধোওয়া বিচিত্র পাখপাখালির স্বরেলা ডাক বয়ে নিয়ে আসা শিরশির বাতাস বইতে থাকে। পি. এ.-কে ডেকে বলেন—'ব্যক্তিগত কাজে বেরুচ্ছি, আজ আর ফিরব না।'

সদ্য কেনা কনটেসার বিশেষ অর্ডারে তৈরি গাঢ় কোমল সীটে গা এলিয়ে অপরেশ চোখ বুজে বসে থাকেন। সদা সতর্ক ড্রাইভার ষ্টিয়ারিংয়ে হাত লাগিয়ে নির্দেশের অপেক্ষা করে। কিন্তু কোনো নির্দেশ আসে না! বিস্মিত ড্রাইভার স্বাভাবিক সাহসের মাত্রা অতিক্রম করে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে—'কিধার চলনা, সাব?'

অপরেশ কিঞ্চিৎ সময় নেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলেন—'কলেজ স্ট্রীট'।

বৌবাজার ক্রসিং ছাড়িয়ে গাড়ি কলেজ স্ট্রীটে ঢুকে পড়েছে। এখন মন্থর দ্বিপ্রহর। উৎসুক অবাক চোখ মেলে অপরেশ রাস্তার দুপাশের বাড়িঘর দোকান-পাট মানুষজন দেখতে থাকেন। নোংরা ঘিঞ্জি বিশৃঙ্খল নাগরিক বিন্যাস ছাপিয়ে

একটা ফিসফিসে সুরভিত ভেজাভেজা বাতাস তাঁকে আপ্লুত করে। হেয়ার স্কুল-প্রেসিডেন্সির রেলিং ঘেরা মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বলে ওঠেন—'গাড়ি থামাও।'

প্রেসিডেন্সির গেটের সামনে গাড়ি থামে। ভিতরে ঢুকিয়ে অপেক্ষা করতে বলে অপরেশ গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। প্রেসিডেন্সি কলেজের পুরানো মেন বিল্ডিং। বিশাল চওড়া সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে যান। দোতলার বারান্দায় রেলিং ধরে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। বারান্দা বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেন—বারো নম্বর ঘর যেখানে ইকনমিকস অনার্স-এর ক্লাস হত। এখন নাকি অর্থনীতি বিভাগ উঠে গেছে বেকার বিল্ডিংয়ে, এই ঘরটা মেয়েদের কমন রুম। তবু তিনি যেন একটা ঘোরের মধ্যে সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। অপস্রিয়মান বেশ-কিছু মুখের মিছিল বিস্মিত অথবা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁকে নিরীক্ষণ করে চলে যায়। সচকিত অপরেশ ধীর পদক্ষেপে সেখানে থেকে ফিরে এসে বিশাল চওড়া সিঁড়ি বেয়ে আবার রাস্তায় নেমে পড়েন।

অপরেশ এখন পুরোপুরি আক্রান্ত। কলেজ প্রাঙ্গণের বাইরে এই অবেলায় বেরিয়ে এসে নিজেকে ক্লাস পালানো ছাত্রের মতো মনে হয়। তাঁর ভীষণ ইচ্ছে করছে বন্ধুবান্ধব নিয়ে কফি হাউসে বসে জমিয়ে আড্ডা মারতে। কিন্তু তিনি নিঃসঙ্গ, সম্পূর্ণ একা। একবার ভাবলেন কফি হাউসে গিয়েই খানিকক্ষণ বসে থাকেন, তারপর মনে হল—নাঃ, নিঃসঙ্গতার বিষণ্ণতা আর রুক্ষতা তাতে আরও তীব্র হবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অতীশের কথা মনে পড়ল। একসঙ্গে পড়ত। পড়াশুনায় ভালো ছিল, কিন্তু খুব গরীব ঘরের ছেলে, ট্যুইশনি করে পড়ার খরচ চালাত। রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমে কষ্ট করে থাকত। এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগত, কারুর সঙ্গে তেমন ভাবে মিশতে পারত না। এমনিতে ঝট করে তাকে মনে পড়ার কথা নয়, কিন্তু বছর দুয়েক আগে সে একবার অপরেশের অফিসে দেখা করতে এসেছিল। অপরেশ প্রথমে তাকে চিনতেই পারেন নি, তারপর কলেজের সূত্র ধরে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর একটু একটু করে মনে পড়েছিল। এসেছিল একটি বিশেষ তদ্‌বির নিয়ে—তার ছেলে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যাদবপুর থেকে পাস করেছে। রেন অ্যাণ্ড কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়েছে কয়েকজন অ্যাপ্রেন্টিস ইঞ্জিনিয়র নেবে, অপরেশ যদি একটু দেখে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যে রকম আচরণ করতে হয়, অর্থাৎ পদমর্যাদা সুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে অনুকম্পা-

মিশ্রিত সহানুভূতি মিশিয়ে অস্বস্তি কাটানো—অপরেশ তাই করেছিলেন। বলেছিলেন—'সিলেকশন বোর্ডে তো আমি একা নই, ইন্টারভিউটা একটা বড় ফ্যাক্টর। যাই হোক, নাম ঠিকানা রেখে যাও, মোটামুটি ইমপ্রেস করতে পারলে দেখব।' কথায় কথায় অতীশ বলেছিল সে বি.এ. পাস করেই সংসারের চাপে চাকরিতে ঢুকতে বাধ্য হয়েছিল, এ.জি. বেঙ্গলে। এতদিনে অডিট অফিসার হয়েছে, ছেলেটা দাঁড়িয়ে গেলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারে। একটা ব্যাপার অপরেশকে বিস্মিত করেছিল—কলেজ আমলে যে ছেলে প্রায় কারুর সঙ্গেই মিশতো না, সে বর্তমানে সহপাঠীদের অনেকের সম্পর্কেই ডিটেল খোঁজখবর রাখে। তার কাছ থেকে পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের কে কোথায় আছে কী করছে অনেক খবর সেদিন পেয়েছিল।

অতীশের ছেলের রেন অ্যাণ্ড কোম্পানিতে চাকরি হয় নি। অথচ অপরেশ তাঁর আয়ত্তাধীন প্রভাব একটু খাটালেই হয়ে যেতে পারত। এতদিন পরে আজ এইমাত্র তজ্জনিত একটা অপরাধবোধ অতিসূক্ষ্ম কাঁটার মতো তাঁর স্বস্তির মধ্যে বিঁধে গিয়ে তাঁকে বিব্রত করতে থাকল। অপরেশ ঠিক করলেন, এ. জি. বেঙ্গলের অফিসেই যাবেন, সেখানে অতীশকে খুঁজে বার করবেন।

অতীশকে অফিসে পাওয়া গেল। তার কাছে অপরেশের আগমন এতই অভাবিত এবং অলৌকিক প্রায় যে সে খানিকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকে। অপরেশই পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করেন—'হঠাৎ পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে কেমন যেন হয়ে গেল, অফিসের কাজে মন বসাতে পারলাম না, বেরিয়ে পড়লুম। কোথায় যাই ভাবতে ভাবতে তোমার কাছেই চলে এলুম।' তাঁর কণ্ঠের আন্তরিকতা অতীশকে স্পর্শ করে। তবুও সে পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারে না, কথা আটকে যায়, থেমে থেমে অস্ফুটস্বরে বলে—'তুমি আমার কাছে আসবে, এ তো প্রায় অবিশ্বাস্য।'

—'চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না? দরকার হলে গায়ে হাত দিয়ে পরখ করতে পারো।'—অপরেশ মৃদু হেসে বলেন—'তারপর, হাতে সময়-টময় আছে? চলো বাইরে কোথাও গিয়ে বসি, নিছক পুরানো দিনের কথা, গল্পগুজব।'

প্রায় জোর করেই অতীশকে নিয়ে বেরিয়ে এসে অপরেশ আবার গাড়িতে ওঠেন। ড্রাইভারকে নির্দেশ দেন—'চলো আবার কলেজ স্ট্রীট, কফি হাউস।'

কোণের দিকে একটা খালি টেবিল পেয়ে যান। কথা শুরু হয়। প্রথমেই

অপরেশ অস্বস্তির কাঁটা তুলে ফেলতে চেষ্টা করেন—'তোমার ছেলের ব্যাপারটায় সেই সময় ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারি নি। তা, এখন ও কী করছে?'

—'তোমাদের আশীর্বাদে একটা পাবলিক সেক্টর আণ্ডারটেকিংয়ে চাকরি পেয়েছে। প্রসপেক্ট মোটামুটি ভালো।'

অতীশের কথায় কি কোনো খোঁচা আছে? মনে হতেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর অপরেশ গঙ্গোপাধ্যায় পুনরুজ্জীবিত হতে হতে পলকে মিলিয়ে যায়। নাঃ, এ ভালোই হয়েছে। আমি একটা কোম্পানির সর্বময় কর্তা, কাউকে চাকরি দেবার চাকরি খাবার অসীম ক্ষমতা আমার—এই ভাবটা এই মুহূর্তে কিছুতেই সুরে মেলে না। তাছাড়া আমি অনুগ্রহ করছি, অতীশ অনুগৃহীত বোধ করছে এমন একটা অবস্থা এখন একেবারেই বেমানান হত, তাঁর তাৎক্ষণিক অস্তিত্বকে বিব্রত বিস্রস্ত করে দিত। ভালোই হল। এরকম ভাবতে পেরে অপরেশ স্বস্তি বোধ করেন। ধীরে ধীরে আন্তরিকতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। তাঁর কাছে বর্তমান এখন মায়া, সুদূর অতীত এখন বাস্তব। কলেজ জীবনের পুরোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা—কে কোথায় আছে, কী করছে, আহ্, সবাই যদি আবার এই টেবিল ঘিরে ভিড় জমিয়ে এই কফি হাউস গুলজার করা যেত।

একসময় কথায় কথায় অতীশ বলে—'মণিকাকে মনে পড়ে? তোমার সঙ্গে তো বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তোমাদের সম্পর্ক নিয়ে কলেজে বেশ একটা···' বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে অতীশ অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

অপরেশ চমকে ওঠেন। তাঁর চৈতন্যের গভীরতম স্তরে যেন নিঃশব্দে একটি বিস্ফোরণ ঘটে, একটা আস্তরণ হঠাৎ ধ্বসে পড়ে, ফাটল সৃষ্টি হয়। সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে কলকল জলধারা বেরিয়ে আসতে আসতে নদী হয়ে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। উন্মনা হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে বসে থাকেন। তারপর টেবিলের উপরে রাখা অতীশের হাতটা হঠাৎ চেপে ধরে আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বলেন—'মণিকা, মণিকাকে মনে পড়বে না, তা কি কখনও হয়? সে কোথায় কেমন আছে জানো নাকি?'

অপরেশের এই আকস্মিক ছেলেমানুষি আবেগে অতীশ বিস্মিত হয়। বলে—'জানি। খুব ভালোভাবেই জানি। আমাদের পাড়াতেই থাকে, মা আর মেয়ে। একটা গার্লস স্কুলে টীচার। লাইফটা খুব স্যাড। জানোই তো ইউনিভার-সিটিতে পড়তে পড়তে ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। হাজব্যাণ্ড ছিল ইলেকট্রিক্যাল

এঞ্জিনিয়র, দুর্গাপুরের কোনো একটা বড় ফ্যাক্টরিতে। বিয়ের পাঁচ-ছ বছর পরে হঠাৎ এক অ্যাকসিডেণ্টে কারখানাতে কাজ করতে করতেই ভদ্রলোক মারা যান। দুবছরের মেয়ে নিয়ে মণিকা কলকাতায় চলে আসে, বাপের বাড়িতে। গার্লস স্কুলে মাষ্টারিটা পেয়ে যায়। তারপর মেয়ে একটু বড়ো হতে কমপেনসেশনের জমানো টাকাকড়ি দিয়ে আমাদের পাড়ায় বাড়িটা কিনে উঠে আসে। তাও প্রায় বছর দশেক হল। যখন প্রথম ওকে আমাদের পাড়ায় দেখি, আমি ওকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু ও আমাকে চিনতে পারে নি। সংকোচ কাটিয়ে একদিন নতুন করে আলাপ করলাম। খুব খুশি, বলল, 'যা হোক তবু একজন পরিচিত পাওয়া গেল, জোর বাড়ল।' তারপর থেকে আমাদের বাড়ির সঙ্গে ওর যোগাযোগ, আমার স্ত্রীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা। দেখা হলে তোমার কথা ওকে বলব।'

অপরেশ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। চোখ দুটো যদিও তাঁর খোলা, তবু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে বর্তমান পারিপার্শ্বিক তাঁর কাছে অবলুপ্ত। তাঁর দৃষ্টি গভীর অন্তর্মুখী, মুখে বিষণ্ণ প্রশান্তির রহস্যময় হাসির রেখা। মৃদু কণ্ঠে বলেন—'ওর ঠিকানাটা দিতে পারো?'

অতীশ মণিকার ঠিকানা বলে, অপরেশ লিখে নেন। তারপর দুজনে কফি-হাউস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন।

বাইরে কলকাতার ধোঁয়াটে সন্ধ্যা। 'তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি'—অপরেশ বলেন—'চলো তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

অতীশের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও অপরেশ ড্রাইভারকে যাদবপুর হয়ে সন্তোষপুরের দিকে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দেন, যেখানে অতীশের বাড়ি। সন্তোষপুর অ্যাভি-নিউ দিয়ে চলতে চলতে বাঁ দিকে একটা দোতলা বাড়ি দেখিয়ে অতীশ বলে—'এইটা মণিকাদের বাড়ি। একতলাটা ভাড়া দিয়েছে, দোতলায় থাকে।' আরও খানিকটা এগিয়ে অতীশের বাড়ি। গাড়ি থামে। অতীশ বলে—'একটু নেমে গেলে হত না? মানে···।'

—'আজ থাক, আর একদিন দেখা যাবে। নতুন করে যোগাযোগ যখন হল।'

ফেরার পথে হালকা গোলাপী রঙের দোতলা বাড়িটার পাশ দিয়ে আসতে আসতে অপরেশ অস্ফুটে বলে ওঠেন—'একটু থামাও।' সদা সতর্ক অনুগত ড্রাইভার ব্রেক কষে। অপরেশ দ্বিধাগ্রস্ত। বাড়িটা তাঁকে চুম্বকের মতো টানছে।

কিন্তু রাত প্রায় সাড়ে আটটা। যতই হোক, তাঁর দীর্ঘকালের সযত্নলালিত মাত্রাবোধ তাঁকে নিবৃত্ত করে। মিনিট খানেক গাড়িতে নিশ্চল বসে থেকে ড্রাইভারকে নির্দেশ দেন—'সোজা বাড়ি চলো।'

ঘোরের মধ্যে অপরেশ বাড়ি ফেরেন। বাড়ি বলতে রাসেল স্ট্রীটে কোম্পানির বিশাল কোয়ার্টার। খাস বেয়ারা দরজা খুলে দেয়। ঝকঝকে কার্পেট মোড়া দীর্ঘ হলঘর, সুবিস্তৃত লাউন্জ, স্টাডি, রেসিডেনসিয়্যাল চেম্বার, অ্যাণ্টিরুম ইত্যাদি ক্লান্ত পদক্ষেপে পার হয়ে তাঁর নিজস্ব বেডরুমের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। বেয়ারা হুকুমের প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করে। অপরেশ একধরনের বিরক্তিমিশ্রিত অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁর এখন কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, কারুর সঙ্গে নয়। নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার ভ্রূকুঞ্চিত করে বেয়ারার দিকে তাকান। হুজুরের এ দৃষ্টির অর্থ বেয়ারা বোঝে। অর্থাৎ, যে-কোনো কারণেই হোক সাহেবের এখন কথোপকথনের মধ্যে প্রবেশ করার মেজাজ নেই, যদি অতিপ্রয়োজনীয় কিছু জানানোর মতো কথা থাকে, বলে চলে যাও। কাছে এসে বেয়ারা প্রথম যে তথ্যটি নিবেদন করে তাতে অপরেশ মনের মধ্যে তাৎক্ষণিক অথচ অপরিমিত স্বস্তি অনুভব করেন। মেমসাহেব বাড়িতে নেই, লেডিজ ক্লাবে মীটিং আছে, ওখান থেকেই ডিনার সেরে ফিরবেন, একটু রাত হবে, সাহেবের ডিনার রেডি আছে। দ্বিতীয় তথ্যটি অবশ্য খানিকটা বিরক্তি উদ্রেক করে : চেয়ারম্যান আগরওয়াল সাহেব ফোন করেছিলেন, জরুরি দরকার, বলেছেন সাহেব ফিরলেই যেন তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। চেয়ারম্যানের নির্দেশ, কর্ম অতএব এখানে স্বেচ্ছাধীন নয়, ইচ্ছা না থাকলেও কথা বলতেই হবে।

রিসিভার তুলে অপরেশ ডায়াল করেন। চেয়ারম্যান অতি অল্প কথার মানুষ, কিন্তু তবুও প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে কথাবার্তা হয়। কথা বলতে বলতে অপরেশের চোখমুখের শান্ত বিষণ্ণতার ঘোর কেটে গিয়ে উদ্ভাসিত উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে। 'থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ স্যার, আয়্যাম সো গ্রেটফুল, গুড নাইট স্যার' বলে তিনি কথা শেষ করেন। চেয়ারম্যান এই মুহূর্তে যে সুসংবাদটি তাঁকে দিলেন তার মর্মার্থ এই যে আগামী সোমবার অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি স্থাপনের বিষয়টি আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হবে এবং যে সিদ্ধান্তটি অপরেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল কর্তৃপক্ষ অনেক বিবেচনার পর

স্থির করেছেন যে শ্রীঅপরেশ গঙ্গোপাধ্যায় হবেন এই সাবসিডিয়ারি কোম্পানির প্রথম চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সিদ্ধান্তটি একান্ত গোপনীয় এবং আগামী সোমবার প্রকাশ্য ঘোষণার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই গোপনীয়তা পুরোপুরি অটুট রাখতে হবে। যেহেতু অপরেশই 'পারসন কনসার্নড' সেই কারণে বাধ্য হয়ে তাঁকে 'কনফিডেনশে' নিতে হয়েছে। 'বাট ইউ মাস্ট কীপ ইট টু ইয়োর-সেলফ অ্যাণ্ড ইয়োরসেলফ ওনলি, নট ইভন শেয়ার উইথ ইয়োর ওয়াইফ। ইউ নো হোয়াই।'

ডিনার সেরে আলো নিভিয়ে অপরেশ শুয়ে পড়েন। এই মুহূর্তে তিনি সুখ-স্বপ্নে বিভোর। শুধুমাত্র যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতাকে সম্বল করে পঞ্চাশ পেরোনোর আগেই তিনি একটি বিখ্যাত মালটি ন্যাশনাল সংস্থার একটি স্বয়ংশাসিত সাবসিডিয়ারির সর্বময় কর্তা। সামনে এখনও অনেক সময়, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় চৈতন্যের ভেলা ভাসিয়ে দিতে দিতে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

তন্দ্রার মধ্যে অপরেশ ডানার শব্দ শোনেন। সেই সামুদ্রিক পাখিটা। এতক্ষণ কোন্ আবছায়ায় ঝিমোচ্ছিল, হঠাৎ ডানা ঝাপটে আবার উড়তে শুরু করেছে। একটি হালকা গোলাপী রঙের দোতলা বাড়ি পেরিয়ে রোদবৃষ্টি ঝড় গলি ঘুঁজি যানজট কোলাহলের বিস্তৃত প্রান্তর ছাড়িয়ে বিরাট চওড়া সিঁড়ির প্রাচীন অট্টালিকা অতিক্রম করে পাখি উড়তে থাকে, উড়তেই থাকে। স্নায়ু উপস্নায়ু বেয়ে ডানার শব্দ ধীরে ধীরে তার রক্তে মিশতে থাকে। তারপর একসময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙে তখন বর্ষণমুখর ধূসর অস্পষ্টতায় আকাশ পৃথিবী একাকার। এয়ারকণ্ডিশনার বন্ধ করে অপরেশ নিজের হাতে বাইরের দিকের জানালা খুলে দেন। কত কাল বাদে এই জানালা খোলা হল মনে পড়ে না। বৃষ্টিভেজা একরাশ শিরশিরে হাওয়া ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সঙ্গে নিয়ে আসে বিচিত্র স্বরশব্দের রহস্যময় অর্কেস্ট্রা যার মধ্যে আছে বাঁশির সুর, নদীর কলতান, অরণ্যের ফিসফিস, শিশিরের নৈঃশব্দ্য এবং নির্ভুলভাবে বিপরীতগামী এক সামুদ্রিক পাখির ডানার শব্দ। খোলা জানালার সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে অপরেশ সেই স্বর-লহরীতে ডুবে যান। এটা যে একটা নতুন দিন, নিয়মমাফিক তাঁর যে অনেক কিছু পরপর করার আছে খেয়াল থাকে না। দরজায় মৃদু করাঘাতে তাঁর ঘোর কাটে। বেড্‌টী নিয়ে ওয়েটার হাজির। প্রাত্যহিকতার শৃংখলাবদ্ধ আর একটি নতুন দিনের সচেতনতায় নেমে আসেন অপরেশ।

কাল রাতের ক্রান্তিকারী টেলিফোনের কথা মনে পড়ে যায়। আজ তাঁর অনেক জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মেমোর‍্যাণ্ডাম অফ আর্টিকল তৈরি হয়ে গেছে, সেটা ছাপানোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দুদিনের মধ্যে ডেলিভারি পাওয়া যায়। পার্ক হোটেলের এক নিরিবিলি কক্ষে চেয়ারম্যান মিঃ আগরওয়াল এবং কয়েকজন মেজর শেয়ার-হোলডার নিয়ে একটি একান্ত ঘরোয়া পার্টি, উচ্চতম পর্যায়ে কিছু আলাপ আলোচনা ইত্যাদি ইত্যাদি। বহুজাতিক সংস্থাধীন একটি কোম্পানির ভাবী চেয়ারম্যান অপরেশ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রতিটি পদক্ষেপ হিসাব করে মেপে চলতে হবে। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা তাঁর দেহমনের প্রতিটি কোষকে সজীব করে তোলে। কিন্তু এই সজীবতা, সজীবতার এই অভূতপূর্ব অনুভূতি, অনুভূতির এই অপার পরিতৃপ্তিকে আপাতত সাতদিন তিনি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারবেন না।

এইভাবে অপরেশের মস্তিষ্কের জটিল ঝিলিমিলির মধ্যে দুই বিপরীতধর্মী একান্ত গোপনীয় অনুভূতি লুকোচুরি খেলে। এই খেলায় যেন তাঁর নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই। কেউ জানবে না তাঁর মাথার ভিতরটা একটা ভুলভুলাইয়ার গোলোক ধাঁধা হয়ে গেছে যেখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড় পরস্পরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করার খেলায় মেতেছে।

সময়মত—সময়ের খানিকটা আগেই—অপরেশ তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষে কাগজপত্র নিয়ে বসেন। আজ তাঁর অনেক কাজ। মেমোর‍্যাণ্ডামটা সম্পূর্ণ ঘষামাজা করে প্রিন্ট কপি তৈরি করান। সেটা ছাপতে চলে যায়। অবগতি, বিবেচনা এবং সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা বিভিন্ন রিপোর্ট রিটার্ন চিঠিপত্র প্রস্তাব ইত্যাদি যথারীতি গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা করে নির্দেশ লিপিবদ্ধ করেন। তারপর বেলা বারোটায় পার্ক হোটেলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। লাঞ্চ সহযোগে একান্ত ঘরোয়া বৈঠক ঘণ্টা তিনেক চলে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয় আলোচিত হয় এবং প্রায় সব বিষয়েই চেয়ারম্যান অপরেশের মতামত জানতে চান। তাঁর মতামত অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সারাক্ষণ তিনি আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর থাকেন। কিন্তু বৈঠক শেষ করে গাড়িতে এসে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই একধরনের অবসাদ তাঁকে অধিকার করে। এখন আর অফিসে ফিরতে ইচ্ছে করে না। শূন্যদৃষ্টিতে ইউনিফরম পরা ড্রাইভারের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন—'তুমি চলে যাও। আমি নিজেই ড্রাইভ করব।' বিস্মিত ড্রাইভার সাহেবের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে নিঃশব্দে চলে যায়।

অপরেশ স্টীয়ারিংয়ে বসেন। গাড়ি চলতে সুরু করে। পার্ক স্ট্রীট, ক্যামাক স্ট্রীট, বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, গোলপার্ক ঢাকুরিয়া হয়ে এগোতে থাকে। যাদবপুর। বাঁ দিকে স্টেশন রোড ধরে রেল লাইন পেরিয়ে সন্তোষপুর। সন্তোষপুরে এসে অপরেশ থমকে দাঁড়ান। কে তাঁকে এখানে নিয়ে এল! তাঁর মনে হয় তিনি যেন এক বেতনভুক ড্রাইভার, অদৃশ্য মালিকের নির্দেশে গাড়ি চালাচ্ছেন। সেই মালিক তাঁকে আরও একটু এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয় যেখানে একটি হালকা গোলাপী রঙের ছোট দোতলা বাড়ি পড়ন্ত বেলার সোনালী রৌদ্রে ঝলমল করে।

রাস্তার ধারে একফালি খালি জায়গায় গাড়ি দাঁড় করান। কোট আগেই খুলে সীটের উপর রেখেছিলেন। এখন টাইটাও গলা থেকে খুলে ফেলেন। তারপর গাড়ি থেকে নেমে লক করে ধীর পদক্ষেপে সবুজ রঙ-এর বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে চলেন। বন্ধ দরজার সামনে খানিকক্ষণ গভীর স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে থাকেন। অবশেষে একসময় দরজার কোণে লাগানো কলিং বেলের সুইচে মৃদু চাপ দেন। অপেক্ষা করেন। ভিতরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা পায়ের শব্দ শোনা যায়। দরজা খোলে। খোলা দরজার ফ্রেমে আটকানো মূর্তির দিকে অপরেশ নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন। এও কি সম্ভব! তিরিশ বছরের কল্লোলিত তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সময়ের সমুদ্র পার হয়ে অবিকল একই প্রতিমা কী করে তাঁর নাগালের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। তাঁর কণ্ঠে অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি বেরিয়ে আসে—'মণিকা!'

প্রতিমার ঈষৎ উদ্ধত অধরোষ্ঠের ভাঁজে তিরিশবছর আগেকার অবিকৃত হাসির রেখা ফুটে ওঠে—'আমার মা। আমি কণিকা। আপনি?'

বিহ্বল অপরেশ এতক্ষণে ঘটনাটার খানিকটা ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়ে ধাতস্থ হন। তবুও আরো কিছুক্ষণ নিশ্চল নীরবতায় তার মুখের থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারেন না। তারপর একজন আত্মবিস্মৃত পরিবেশ নিরপেক্ষ মানুষের মতো প্রায় আত্মগত মৃদুকণ্ঠে বলেন—'তুমি মণিকার মেয়ে, মণিকা তোমার মা। আমি ভাবলাম বুঝি···' অপরেশ কথা শেষ করেন না।

—'কি ভাবলেন?' মেয়েটির মুখে রহস্যময় চাপা হাসি ফুটে ওঠে। সেই হাসিতে মথিত সমুদ্রের অতলতা থেকে হারিয়ে যাওয়া বিমূর্ত স্মৃতির স্তূপ ভেসে ওঠে। অপরেশের বুকের মধ্যে মোচড় দেয়।

—'তুমি একেবারে ঠিক অবিকল মণিকার মতো, তিরিশ বছর আগেকার মণিকা।' কথাগুলো বলতে পেরে অপরেশ একটু সহজ হালকা বোধ করেন—'আমার নাম অপরেশ। অপরেশ গঙ্গোপাধ্যায়। মণিকার সঙ্গে আমি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, ও আমার বন্ধু ছিল। তারপর তিরিশ বছর কেটে গেছে, ওকে দেখি নি। হঠাৎ তোমাদের খবর পেলাম, খুব ইচ্ছে হল একবার দেখা করি।'

অপরেশের কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতা এবং প্রচ্ছন্ন আবেগ মেয়েটিকে স্পর্শ করে। সে সহজভাবে বলে—'আপনি ভিতরে আসুন। মা'র ইস্কুল থেকে ফেরার সময় হয়ে গেছে, এক্ষুনি এসে যাবে। ততক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে গল্প করি, আমি তো মার কোনো পুরোনো বন্ধুকে কখনও দেখি নি।'

অনেক কথা হয়। কণিকা এ বছরেই ইংরেজি নিয়ে এম. এ. পাস করেছে। মার অভিমত, মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, ঘর সংসার তার পর এবং স্বেচ্ছাধীন। কণিকা একটি মনমত ভদ্র কাজের খোঁজে আছে। কথা প্রসঙ্গে অপরেশের ব্যক্তি পরিচয়ও জানা হয়ে যায়। অপরেশের মনে হয় তাঁর পরিচয় জানার পর মেয়েটি যেন অকারণ ব্যস্ততা দিয়ে একধরনের কুণ্ঠা এবং সংকোচ আড়াল করতে চেষ্টা করছে। এমন সময় কলিং বেল বেজে ওঠে। 'ওই বুঝি মা এলো।'—বলে ঝট করে উঠে পড়ে—'আমি দরজা খুলে দিয়ে আসি।'

এইমাত্র যে তরুণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সে অনেক আনন্দ-বেদনা-ব্যাকুলতার গন্ধ ছড়িয়ে গেল। সেই গন্ধে বিভোর হয়ে অপরেশ বসে থাকেন। পদশব্দে তাঁর ঘোর কাটে। চোখ তুলে তাকান। সামনে শুভ্রবসনা মধ্যবয়স্কা এক নারীমূর্তি—কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া, চিবুকে কপালে ভাঁজ, বিস্রস্ত চুলের এখানে ওখানে সাদার প্রলেপ, চোখে ক্লান্তির ছাপ। কিন্তু ক্লান্ত চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় কৌতুক-কৌতূহল-আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রণ আর ওষ্ঠাধরের কোণে ফুটে ওঠা হাসির রেশ যেন চেনা মনে হয়। অপরেশ উঠে দাঁড়ান—'মণিকা, তুমি?' তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন যুগপৎ একধরনের প্রশ্ন অনুযোগ এবং অবিশ্বাস ফুটে ওঠে যার ব্যঞ্জনা এইভাবে করা যেতে পারে—তোমার এরকম আবির্ভাব আমি আশা করি নি, তুমি কত পালটে গেছ, তুমি মণিকা কিন্তু সত্যিই কি তুমি মণিকা?

—'আমি সত্যিই ভীষণ, ভীষণ অবাক হয়ে গেছি, এতদিন বাদে হঠাৎ তুমি আমার ঘরে আসবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। যাক, আমাকে চিনতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল,

তোমার মুখ দেখে কিন্তু তাই মনে হচ্ছে। রাস্তায় আমাকে দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারতে না তো।'—মণিকার কণ্ঠস্বর এবং কথাবলার ধরন কিন্তু আশ্চর্যরকম ভাবে অপরিবর্তিত আছে, তিরিশ বছরের ব্যবধানে বিন্দুমাত্র পালটায় নি। কথা শুনতে শুনতে অপরেশ শিহরণ বোধ করেন। তারপর ধীরে ধীরে প্রায় যেন পরিহাস-ছলেই বলেন—'হলফ করে বলতে পারব না রাস্তায় হঠাৎ দেখলে তোমাকে চিনতে পারতাম কিনা। সত্যি, চেহারায় তুমি কত পালটে গেছ; তবে যদি কোথাও দেখা হত আর তুমি একটু হাসতে দুটো কথা বলতে, তাহলে কিন্তু নির্ভুল ভাবে চিনে নিতে পারতাম। কারণ, তোমার কথা আর হাসি কিন্তু পালটায় নি।'

—'সময়, অপরেশ, সময়। তিরিশটা বছর, ভেবে দেখ তো। তিল তিল করে পালটাতে পালটাতে পরিচয়ের সীমানা পেরিয়ে গেছি। তুমিও তো কম পালটাওনি। অবশ্য তোমাকে দেখলে আমি বোধহয় যে কোনো জায়গায় চিনে নিতে পারতাম —অন্ততঃ চেহারায়। মনে হয়, সময়ের সমুদ্র পার হতে তোমাকে অত বেশি ঝড়-ঝাপটায় পড়তে হয় নি।'

এমনি করে শুরু হয়। পুরানো অনুষঙ্গ ফিরে ফিরে আসে। মাঝে মাঝে মন কেমন করে, উদাস হয়ে যায়, সূক্ষ্ম বেদনাবোধ, আনন্দ। সময় কেটে যায়। কখনও কণিকা এসে যোগ দেয়, মাকে এত উচ্ছল হতে সে কোনদিন দেখেনি। সে কৌতুক বোধ করে, মন্তব্য করে—বান্ধবীর মতো, মেয়ের মতো নয়। অপরেশ কণিকার চোখে চোখ রেখে মণিকার কণ্ঠস্বর শোনেন। মণিকার অনুষঙ্গ, কণিকার অবয়ব। তিনি ভাসতে থাকেন। ভাসতে ভাসতে ভারী হয়ে ওঠেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ সংক্রামিত, সম্পৃক্ত।

দিনের আলো ফুরিয়ে আসে, ঘরের মধ্যে রাতের আলো জলে। একসময় মণিকা বলে—'এইটুকু সময়ে আমরা কত কাছাকাছি এসে গেলাম, তুমি আমি কণিকা। অথচ, ভেবে দেখো, ঠিক এই সময়ের তোমাকে আমরা চিনি না, তুমি আমাদের চেনো না।'

—'কিন্তু আমি যে চিনতে চাই, তোমাকে কণিকাকে।'

—'এখন তোমার মনে হচ্ছে চিনতে চাও, কিন্তু সেটা কি আর সম্ভব?

—'আমি সময়ের বাধা পার হতে চাই।'

—'চেষ্টা করে দেখো।' মণিকা সেই চির পুরানো হাসি ঠোঁটে মেখে বলে। তারপর একটু থেমে একটু ভেবে বলে—'অনুরোধ করব কিনা ভাবছি, মানে,

অনুরোধ করাটা উচিত হবে কিনা। তবুও মনে যখন এসেছে বলেই ফেলি। অনেক দিন বাদে দেখা, পিছন ফিরে জীবন দেখতে ভালোই লাগছে। রাতও হল। আমাদের মতো করে খাওয়াদাওয়ার অভ্যেস তোমার নেই জানি, কিন্তু যদি আজ রাতে আমাদের সঙ্গেই রাতের খাওয়াটা সেরে যাও।'

—'তুমি এত কুণ্ঠা বোধ করছ কেন? এ তো আমার পরম আনন্দ।'

মণিকা উঠে ভিতরে যায়, কণিকা বসে থাকে। তিরিশ বছর আগেকার মণিকার প্রতিমূর্তি নিয়ে কণিকা বলে—'আপনি আর মা কথা বলছিলেন, আমার কী ভালো যে লাগছিল। জানেন, আমার মা খুব দুঃখী। আবার আসবেন তো?'

আবেগে অপরেশের গলা ভারী হয়ে আসে।—'আসব বই কি, রোজ আসব, নিজের জন্য আসব। যখন আসব তোমার মায়ের পাশে তুমিও থেকো কিন্তু।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে কী ছিল কে জানে, কণিকা একটু থমকে যায়। তারপর তার মুখে একটা দীপ্তি ফুটে ওঠে, চোখে সলজ্জ কটাক্ষ। সে যেন কাছে সরে আসে। অপরেশের হাতের আঙুল থরথর করে কাঁপে। তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছা হয় হাত বাড়িয়ে দিতে, কিন্তু তিনি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কিছুতেই হাত তুলতে পারেন না।

কণিকা আরও একটু কাছে সরে আসে। দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে প্রায় ফিসফিস করে বলে—'কাকাবাবু, আমার একটা চাকরির খুব দরকার। আপনার তো অনেক ক্ষমতা, পারেন না আমার একটা চাকরি করে দিতে? আর মাকে কিন্তু বলবেন না, আমি আপনাকে চাকরির জন্য বলেছি।'

অপরেশের আঙুলের থরথর থেমে যায়। এখন তিনি সহজে হাত তুলতে পারেন, কিন্তু তিনি জানেন এ হাত তিনি আর বাড়াতে পারবেন না। স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলেন—'হ্যাঁ, আমি পারি। তুমি একটা দরখাস্ত আমার কাছে পৌঁছে দিও। আর আগামী সোমবারের পরে যে-কোনো দিন আমার অফিসে দেখা কোরো। হয়ে যাবে।'

আগামী সোমবার অপরেশের চেয়ারম্যান হিসেবে অভিষেক।

মণিকা ঘরে ঢোকে। খাবার তৈরি।

তারা খসার সময়

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

লোড-শেডিংয়ের টপিকটা ঢ্যাবঢ্যাবে তবলা। নিত্যদিনের ব্যাপার। তবু কথা বলার কিছু না থাকলে সকলেই বাতিল তবলায় চাঁটি মারে। ওরাও তাই করছিল খানিক আগে। ছাড়া ছাড়া আনতাবড়ি বোলের পর হঠাৎ লহরা :

—অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন।

—হ্যাঁঃ, আলো থাকলেই বা কী, আর গেলেই বা কী, আমাদের তো আর লেখাপড়া করতে হবে না।

—ধর্, একটা মেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমপত্র লিখছে কিংবা পড়ছে, এমন সময়ে বাত্তি ফুস্। সাঁঝের পূরবীতে বেআঁচকা কোমল গান্ধার, কেমন হয় তাহলে?

—আহ্, হোয়াট আ ফ্লাইট অফ ইম্যাজিনেশান। শালার প্রেম একেবারে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। অমনি শুরু হল মেণ্টাল মাস্টারবেশান।

—তার জন্যে দুঃখ কেন, তুই না হয় হাতেকলমেই শুরু করে দে।

—ধুস্ রাখ্ তো বাজে কথা। আমরা কেউ প্রেমপত্রটত্র লিখি না, পাইও না। এখন প্রেম কথাটা শুনলে মনে হয় খালি পায়ে কুকুরের অবদান মাড়িয়ে ফেলেছি।

—ছ্যাটস্ বেটার। আমার মায়ের এক দাদু ছিল, সে বুড়ো কিন্তু আশি বছর বয়েসেও সন্ধের মৌতাতের পর গাইত—পিরিতের পাঠশালাতে পড়তে যাব আলেফ পে বে।

—একেই বলে জীবন রসিক। আশি বছর বয়েসেও মার্কারি ভেপারের আলো জালিয়ে রেখেছিল বুড়ো। আর আমাদের জীবনে পঁচিশ পাওয়ারের বালব্ জলতে না জলতেই পাকাপাকি লোড-শেডিং।

—আচ্ছা, সান্তালদি, ব্যাণ্ডেল, কোলাঘাট, ডি. পি. এল—

—চন্দ্রপুরা, পত্রাতু, কোরবং, কোটা—

—সবগুলোতে যদি একসঙ্গে ব্রেক-ডাউন হয়, তাহলে কেমন দাঁড়ায় ব্যাপারটা।

—উঃ, দারুণ হবে। মেলাবেন তিনি মেলাবেন, ঝোড়ো হওয়া আর পোড়ো বাড়িটার ওই ভাঙা জানালাটা। সত্যিকারের বিপ্লব। স্ট্রাইক আর লক-আউট, প্রেম আর অপ্রেম, ঘরকন্না করা সুখি চাকুরেরা আর আমাদের মতো ফালতুরা সব মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে এক। একেবারে সব ক্যাণ্টার হয়ে যাবে।

—বেঁচে থাকো লোড-শেডিং চিরজীবী হয়ে তুমি।

হঠাৎ নৈঃশব্দের এক থাবড়ায় কথাবাজির চরকিটার ঘুরনপাক বন্ধ। দূরে বড় রাস্তায় দোকানঘরের লণ্ঠন, পেট্রোম্যাক্স আর এমার্জেন্সি লাইটের ফুটকি। রুবি সিনেমার জেনারেটারের ভ্যাট ভ্যাট। তার শব্দ মস্ত মাঠটা পাড়ি দিতে গিয়ে কাহিল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশ হুমড়ি খেয়ে এখন আরো নীচে। তারাদের জৌলুসে বেশ বাড়বাড়ন্ত। আকাশে লোড-শেডিং হলে কেমন হয়—একজনের মনে আলতো করে ছুঁয়ে গেল ভাবনাটা। আর তিনজনের মন বেবাক ফাঁকা। কথায় ঘাটতি; ওদের চার জনের চোখ অসংখ্য আলোকবর্ষের শূন্যতা পেরিয়ে যাচ্ছিল না। এমনই হয়, ওদের বা ওদের মতো অনেকের। এমন কিছু কাজ নেই যার মাথায় উদ্দেশ্যের ফলা বসিয়ে বল্লম বানানো যায়। ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত সময়টা ভরাট করাই সমস্যা। কারুর আগাম প্ল্যানিং নেই। প্ল্যানিং করার মতো স্বপ্নও নেই। জিজ্ঞাসা করলে চট করে বলতে পারবে না গতকাল বা পরশু এই সময়টা কী করছিল। দিনগুলো সব কুমোর বাড়ির এক ছাঁদের পুতুল। একটাকে আরেকটার সঙ্গে আলাদা করে চেনা যায় না।

—একটা তারা খসল।

—খসল বুঝি, আমি দেখি নি।

—তুই তো কিছুই দেখতে পাস না। মঞ্জু সুবীরকে বিয়ে করার পর বুঝলি তুই মঞ্জুর দুটো নৌকোর একটা, তাও পা তুলে নেবার পর।

—তা ঠিক। আমি আবার একটু গোলা আছি। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে চাকরির এ্যাপয়ণ্টমেণ্ট লেটারটা আমার নামের ডুপ্লিকেট ছেলেটার কাছে চলে গেল কারসাজি করে। সেটা টের পেতে আমার তিন মাস লেগে গেল।

—চিঠিটা যদি তোর ঠিকানায় ঠিক সময়ে পৌঁছত, তাহলে দেখতিস তোর বদলে সুবীরেরই লাথি-খাওয়া নৌকোর হাল হত।

—কী জানি, হবেও বা। আমি আজকাল কিছু ভাবতে পারি না। ভাবতে ইচ্ছাও করে না। আসলে ইচ্ছেগুলোই সব মরে যাচ্ছে।

—ইচ্ছের কথায় মনে পড়ল। এই যে এক্ষুনি একটা তারা খসল, তোরা কেউ কিছু উইশ করেছিলি?

—উইশ মানে?

—ডাবলিউ, আই, এস, এইচ—উইশ, উইশ মানে ইচ্ছে।

—তারা খসলে বুঝি উইশ করতে হয়?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও শুনেছি তারা খসার সঙ্গে সঙ্গে উইশ করতে পারলে সেই ইচ্ছে নাকি ফলে যায়।

—যত্তো সব রাবিশ, অমাবস্যার রাত্রে আকাশে চাঁদ ওঠে না, অতএব রসগোল্লা খাইতে মিষ্ট লাগে।

—ফ্যালাসি অফ পোস্ট হক আর্গো পস্টার হক। কত কাল আগে পড়েছি, দেখ্, এখনো কেমন মনে আছে।

—যা, যা, তোর মুরোদ জানা আছে, তাও যদি পি ডিভিশান না পেতিস।

—দিস ইজ আনফেয়ার, তুই কিন্তু ওকে বিলো দা বেল্ট হিট করলি।

—ধুস্, আমাদের বেল্টের আবার ওপর আর নীচ। ওপরে হৃদয় নামক সাহারা মরুভূমি আর নীচের ধনসম্পত্তি তো সদ্যোজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ।

—এবং অব্যবহৃত।

—জিতা রহো, জোর লাগতাই ছেড়েছিস একখানা। হৃদয়ের অকথিত বেদনা একেবারে বঁড়শি দিয়ে টেনে বের করেছিল।

—আমি না হয় পি ডিভিশান পেয়েছিলাম, তোর ফার্স্ট ডিভিশানটা কোন কাজে লাগল শুনি, অঙ্কে তো লেটারও ছিল একটা।

—কারেক্ট, তাই ওর রাদার ফ্যাট পশ্চাদ্দেশের নীচে গদি আঁটা রিভলভিং চেয়ারের বদলে ডাকবাংলোর সামনের এই টেকো মাঠের ধুলো।

—তোরা কোন দিন টু দা পয়েণ্ট কথা বলতে পারিস না। ধান ভানতে শিবের গীত। কথা হচ্ছিল তারা খসার সময় উইশ করা নিয়ে।

—যত্তো সব বাজে কথা।

—তুই তো বলবিই। সাহেবি স্কুলে তো আর পড়িস নি। গুরু তো হরি পণ্ডিতের টিনের চালার গোয়াল ঘর থেকে।

—শুভেন্দুও তো ওখান থেকেই পয়দা। এখন রাইটার্সে স্থয়িং ডোরওয়ালা ঘরে বসে। সেণ্ট অগাষ্টিনে গলায় লাল টাই ঝুলিয়ে কয়েক বছর ঘষটে তোর হলটা কী?

—অবজেকশান, অবজেকশান, নো পার্সোনাল অ্যাটাক প্লিজ।

—তোর বাপ ছাতার কাপড়ের কোট গায়ে দিয়ে কোর্টে যায় বলে তুইও কি—

—অবজেকশান এগেন, লিভ মাই পুওর ফাদার অ্যালোন, নো বাপ তোলা প্লিজ।

—এই জন্যেই বাঙালির কিছু হল না। কী কাজে, কী কথাবার্তায়, সব সময়ে বেলাইন।

—বাঙালি জাগো।

—নেতাজী ফিরে এস।

—ওঃ হেল্।

—মাইরি তোর ইংরিজিখানা দেখলে মনে হয় সাহেব বাড়ি থেকে নিলামে-কেনা খাটে তোর বাপ-মার ফুলশয্যা হয়েছিল।

—আর তোর বাপ-মা কিসের ওপর শুয়ে তোর জন্ম দিয়েছিল? নড়লে ক্যাঁচ চড়লে কোঁচ ছারপোকাভর্তি তক্তপোষে?

—কোন খামোখা বাপ-মাদের নিয়ে পড়লি? আয় বরং আমরা তারা খসার জন্যে উইশ করি।

—সঙ্গে সঙ্গে করতে না পারলে উইশ ফলে না।

—কী ফলে, কতখানি ফলে, সবাই জানে। দেখিই না কার কী উইশ।

—আবার ইংরিজিয়ানা? ইচ্ছে কথাটা বলতে বুঝি জিভে পক্ষাঘাত হয়?

—আচ্ছা বাবা উইশ নয়, ইচ্ছেই না হয় হল। এখন শুনি এই মুহূর্তে কার কী ইচ্ছে।

—আ০বা০। ০য দি০। ই০চ্ছা০। ০ক র০। আ০বা০। ০আ সি০। ফি০রে০। ০০০ ০। আ০বা০। ০য দি০।

—বাঃ, বেশ তো গাইছিলি। থামলি কেন? গানটাও যদি মন দিয়ে শিখতিস।

—আবার বাজে কথা। যত লাইনে আসার চেষ্টা করি ততই বেলাইনে চলে যায়। ব্যস, এবারে এক এক করে বল্ কার কী ইচ্ছে।

চারটে মুখে একসঙ্গে কুলুপ। চারটে মনের মধ্যে ইচ্ছের টিকিটে ঠাসা লটারির ব্যারেল ঘুরছে বনবনিয়ে। চার জোড়া চোখের সামনে আবার অজস্র আলোক-বর্ষের সরল শূন্যতা। এই নিখিল বিশ্বচরাচর কী বিরাট। কিন্তু চিবুকটা ক' ডিগ্রি তুললেই আকাশের উপুড়করা ঢাকনায় চোখের নজর আটক। কত বড়, আবার কত ছোট। এই ঘেরাটোপের তলায় কত কী। কোটি-কোটি-কোটি-কোটি ইচ্ছের ভিয়েন। ফুটছে, টগবগ করে ফুটছে। অর্বুদ-অর্বুদ-অর্বুদ-অর্বুদ ইচ্ছের ঘেঁষাঘেঁষি। প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন ইচ্ছের জন্ম। রক্তবীজের ঝাড়। মরে না, কমে না। বাড়ছে তো বাড়ছেই। সবগুলো পৌঁছতে চায় একটাই লক্ষ্যে। সেই লক্ষ্যবস্তুর ওপর মোটামুটি একটা ছাপ মারা যায়: নিরাপত্তা। পায়ের তলার মায়ের কোলের মত নিশ্চিন্ত আশ্রয়; যেখান থেকে পড়ে যাবার ভয় নেই। সেখানে পৌঁছবার রাস্তাতেই যত গণ্ডগোল। পুরো পথটাই তীর্থ-ক্ষেত্রের গলি। জলে, কাদায়, গোবরে, পায়ের তলায় পেষাই ফুল আর পাতায় মিশে এক প্যাচপ্যাচে কার্পেট। এক পা এক পা করে এগোন; গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে সমানে হড়কে যাবার ভয়। অনিশ্চয়তা—অন্যের পা মাড়িয়ে ফেলার সঙ্কোচ, যা কাটাতে না পারলে নিজের পা-ই মাড়াই হবে অন্যের উদ্যোগী পায়ের তলায়। অন্তহীন এক নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা। সকলেই রোমান এরিনার খেলোয়াড়। মনের সব আহা-উহুকে গলা টিপে না মারতে পারলে নিজের ইচ্ছেকে জেতানোর চেষ্টায় জলাঞ্জলি। একেকটা ইচ্ছের গায়ে একেক ধরনের স্বার্থের তবকমারা। সবারই আগে পৌঁছবার তাড়া। কিন্তু জানে বাজিমাত করবে অল্প কজন। তবু চেষ্টার কামাই নেই।

—টক্, টক্, টক্, টক্—

—ওটা আবার কী হচ্ছে?

—কুইজ কনটেস্টের ঘড়ির শব্দ।

—ইওর টাইম ইজ রানিং আউট, চাম্।

—কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও, তারই রথ নিত্যই উধাও—

—আবার বেলাইন?

—আচ্ছা বাবা, চুপ করলাম।

—কী রে তোরা ? এত ভেবেচিন্তে একটা ইচ্ছে বের করতে পারলি না ?

—এত ইচ্ছের মেলা। শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী, কারে রেখে কারে বলি।

—যা হোক একটা বলে ফ্যাল-না।

—তুই বল্-না বাতেলা না মেরে।

—আমারও তো একই প্রবলেম।

—মনের মধ্যে ভালো করে খুঁজে ছাখ না। দরকার হলে ডুবুরি নাবা।

—ডু ব্ ডু। ব্ ডু ব্। ডু ব্ সা। গ রে ০। আ মা র।
ম ন ০। ০ ০ ০। ০ ০ ০ II ০ ০ চ। রা চ র।
পা তা ল। ফুঁ ড়ে ০। ০ ০ চ। রা চ র। পা তা ল।
ফুঁ ড়ে ০। পা বি ০। ০ কি রে। র ত্ ন। ধ ০ ন। II
ডু ব্ ডু। ব্ ডু ব। ডু ব্ সা। গ রে ০। আ মা র।
ম ন ০। ০ ০ ০। ০ ০ ০। II

—তাহলে গানই চলুক।

—তুই কে রে ? ঈশেন না সত্যবাহন ?

—হে বালকবৃন্দ, তোমরা পরস্পর অর্থহীন বিবাদে কালক্ষেপ না করিয়া তোমাদের হৃদয়রূপ সমুদ্রের গভীর তলদেশ হইতে ইচ্ছারূপ রত্ন আহরণে সচেষ্ট হও।

—বালক বলছিস কী রে ? চানস্ পেলে এ্যাদ্দিনে বালকের জন্ম দিতে পারতাম।

—ফের বেলাইন ?

—আচ্ছা বাবা চুপ করলাম।

—কীরে, তুই আবার হাত তুললি কেন ?

—আমি আমার ইচ্ছেটা বলব স্যার ?

—ন্যাকামি রাখ্, বলে ফ্যাল্।

—কাচের চুড়ি ভাঙার মতো ইচ্ছে করে অবহেলায়
ধর্মতলায় দিনদুপুরে পথের মধ্যে হিসি করি।

—এ আবার কি বলে রে ? পাঁচ আইন ভাঙার দায়ে পড়বি যে !

—আরে ছ্যা ছ্যা, বললি তো বললি, তাও আবার অন্যের কাব্যি ধার করে!

—বৎস, ধর্মতলা পর্যন্ত যাবার প্রয়োজন কী ? ইচ্ছে করলে উক্ত মহৎ কার্যটি এখানেই করতে পার।

—কিন্তু তাহলেই তো ইচ্ছাপূরণ হয়ে গেল। কিন্তু তারপর ? ইচ্ছের শেষ মানে তো বেঁচে থাকারও শেষ। ইচ্ছেকে বাদ দিয়ে জ্যান্ত আলুপটলের মত বেঁচে থাকতে ভয় করবে না তোর ?

—ওব্ বাবা, এ যে ডীপ ফিলজফি কপচাচ্ছে !

—অর্ডার, অর্ডার।

—এই ছাতার কাপড়ের কোটের বাচ্চার মুখে একটা প্লিকিং প্লাস্টারের টুকরো আটকে দাও।

—ল্যাংগুয়েজ প্লিজ।

—একটা নয়, দুটো।

—আমরা সবাই পাগলা ব্রহ্মার মত কাণ্ড করছি।

—এটা তো হেভি দিয়েছিস। কিন্তু শুরু তোমাকে তো নিজের মল্লিনাথ নিজেকেই হতে হবে। তুমি আরেকটু বিশদ হও।

—মানে, ব্রহ্মার চারটে মুখ একসঙ্গে কথা বললে যা হয় আমরাও তাই করছি।

—আমরা যখন ব্রহ্মারই অংশ, তখন ব্রহ্মজ্ঞানীর মত আমাদের লুকোন ইচ্ছে-গুলোর ধ্যান করি না কেন ?

—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্যে তো উপকরণ দরকার। সেটা এই মুহূর্তে মিলবে কোত্থেকে ? রেস্ত কোথায় ?

—চিনি খান যিনি, চিনি জোগান চিন্তামনি। আমাদের মধ্যে একজন তিন মাস অন্তর দেড়শো টাকার মালিক হয়। সেই দিনটা গেছে কাল। সুতরাং চব্বিশ ঘণ্টা পরে সিগারেটের ধার শোধ করেও তার পকেটে এখনো কিছু থাকার কথা।

—তুই ঠিক খেয়াল করেছিস তো ! ব্যাটাচ্ছেলে দিব্যি চেপেচুপে বসে আছে !

—কাফ্ ইট আপ, চাম্। সঙ্গে আছে, না কেষ্টর দোকান থেকে আনতে হবে।

—কবে তোদের বাদ দিয়ে টেনেছি যে এত কথা শোনাচ্ছিস। নে, বানা, তোর হাতটা এ-ব্যাপারে বেশ পাকা।

একটা সিগারেটের প্যাকেট আর কাগজে-মোড়া ছোট পোঁটলা এগিয়ে এল। দক্ষ হাতের কেরামতিতে সিগারেটগুলো তামাক উগরে ফাঁকা। তামাকের জায়গা নিল কাগজে জড়ান বস্তুটা।

—স্কোয়া—ড্, ফিকস্ সিগারেটস্।

মুখে একজন এন. সি. সি.-র বাচ্চা বললেও চারটে সিগারেট প্রায় একসঙ্গে চার জোড়া ঠোঁটে আটক। এই ড্রিলটা গোড়ার দিকে মজার ব্যাপার। বাঙালির একতা দেখাবার কাজটাকে প্যারেডের ছকে ফেলে খেলাটার শুরু। তখন পয়লা কম্যাণ্ড : স্কোয়া—ড্, ওপন্ ইওর ফ্লাইজ। পরের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ধারাপাতের প্রতিযোগিতা—কারটা বেশি দূরে গিয়ে পড়ে কিংবা সব চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

—স্কোয়া—ড্, লাইট ইওর স্টিকস্।

আগে মজা পেত হিল ক্লিক করার মত এক সঙ্গে চারটে দেশলাইয়ের কাঠির ঘষায়। এখন হাতের নড়াচড়া নেহাতই অভ্যেসের বশে। দু ঘণ্টা ধরে চিবোন চিউয়িং গামে মিষ্টি যতটা, এই যৌথ কাজটিতে এখন উৎসাহ ততটাই। আগে দলটা ভারি ছিল। এখন চারজনে ঠেকেছে। তবু অন্ধকারের মধ্যে অল্প আগুপিছু করে জ্বলল চারটে সিগারেট। একজনের দুটো দেশলাইয়ের কাঠি লাগল।

—ইনহে—ল্, ডীপলি।

জোরে টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে একজনের মাথার মধ্যে উল্টোপাল্টা ঢেউয়ের টাল : সকালে দুখানা বাসি রুটি আর চা, তার পর আরো বার কয়েক চা। পেটের সেই অবাধ্য—এবং অনিবার্য—চাহিদাটার সমানে ঘ্যানঘ্যান। আড়াইশো গ্রাম সেদ্ধ চালডাল হলেই চলে যায়। কিন্তু যে দরজা দিয়ে সকালে বেরিয়ে এসেছে, এখন ফিরতে গেলে সেটা অনেক ছোট। বেশ খানিক মাথা হেঁট না করলে ঢোকা শক্ত।

—এবারে কী কম্যাণ্ড হবে? স্কোয়াড্, স্পিক আউট ইওর উইশেস্ ওয়ান বাই ওয়ান?

—ইচ্ছে কি হারানো গরু?

—নাকি গেছোদাদার জ্ঞাতিগুষ্টি?

—তার মানে?

—মানেটা চন্দ্রবিন্দু জানে।

—গেছোদাদাকে তো চন্দ্রবিন্দু হিসেবমত এগোলে এক সময়ে না এক সময়ে ক্যাচ কট্ কট্ করা যায়। কিন্তু ইচ্ছেরা তো বহুরূপী। তাদের পাকড়ানোর চেয়ে খালি হাতে মাছি ধরা সহজ।

—তুমি শালা কানামাছি হয়ে চরকির মত ঘুরবে। আর ওরা তোমাকে সমানে ঠুকরে দে ছুট। তখন কবন্ধ হয়ে হাতড়ে মর।

—তবে?

—কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

—ফের ধারকরা কাব্যি?

—আচ্ছা বাবা, ঘাট মানছি। আমি এখন আরেকটি মোক্ষম টান দিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ হয়ে ধ্যানস্থ হচ্ছি। তোমরাও চাপল্য প্রদর্শন না করে মামনুসর।

—ওকে বস্।

—কাছেই কোথায় বিয়ে বাড়িতে সানাই বাজছে। বিসমিল্লার রেকর্ড, বেহাগ।

—বেহাগ তো নয় বসন্ত রাগ।

—ওঃ হেল্।

—কেন, সানাইয়ের শব্দ কানের মধ্যে গরম শিসে ঢেলে দিচ্ছে?

—ওঃ, স্টপ দিস্ ধানাই-পানাই এ্যাবাউট সানাই।

—কারুর বিয়েতে যদি সানাই না বেজে নাড়ি কাঁপিয়ে ককিয়ে ওঠে এয়ার রেডের সাইরেন আর তার সঙ্গে যদি সঙ্গত করে ডজন খানেক ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টা? দারুণ হয় মাইরি তাহলে।

—ক০বে। ০ফু০। টি০বে। আ মা র। বি০০। য়ে০র। ফু ল০। ০০০।

—স্টাইলটা ভালই রপ্ত করেছিস, এবারে সনাতন দাস বাউলের চেলা হয়ে ভিড়ে যা।

—ওঃ, ব্যাক টু দা ভয়েড্ এ্যাহেড্ অফ্ স্কোয়ার ওয়ান এগেন। ছুস্ শালা, তোদের উইশ করতে বলাই ভুল হয়েছে।

—তোরা চুপ কর সবাই। রামগড়ুরের লাগছে ব্যথা। প্রভু রজনীশ, তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর। তোমার সঙ্গে আমরা সকলেই ট্র্যান্‌সেন্‌ডেন্টাল মেডিটেশানে যোগ দিচ্ছি।

স্বগত চিন্তা—এক

আমি একটা বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠি পেয়েছি। বেশ দামি কার্ড। সঙ্গে আলাদা ক' লাইন লেখাও আছে। হাতের লেখা দেখলে মনে হয় যে লিখেছে তার সঙ্গে কাগজ কলমের সম্পর্ক কম। অনেক বানান নিজের মত করে লেখা।

গুরুচণ্ডালী দোষও আছে। দুটোই এসেছে আমার নামের ডুপ্লিকেটের কাছ থেকে। অনেক আমড়াগাছি করে লিখেছে আমার কাছে ও সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। চাকরিটা ফোকটে পেয়ে গিয়ে আর যা যা পাবার সব তাড়াহুড়ো করে গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। কনফারমেশানের তোয়াক্কা না করেই চাকরির তিন মাসের মধ্যে বিয়ে। অবশ্য সরকারি চাকরি পাওয়াটাই যা শক্ত। পেয়ে একবার গেলে সেটা সেই কালো কম্বল তথা ভাল্লুকের মত পানেওয়ালাকে আঁকড়ে থাকে। এই বিয়ের নেমন্তন্ন পাবার খবরটা ওদের কাউকে দিই নি। সবাই হাসবে।

রিটন্ টেস্ট ভালই দিয়েছিলাম। তবু ইন্টারভিউয়ের চিঠি পাবার আশা করি নি। হাজার হাজার ছেলে পরীক্ষা দেয়। চাঁদের সংখ্যা যদি দশটা হয় তাহলে দশ হাজার বামন হাত বাড়িয়ে রয়েছে। আমি সেই দশ হাজারের একজন। আমি সব দিক দিয়েই অতি সাধারণ মাপের মানুষ। এমন কোন বিশেষ গুণ নেই যা দিয়ে অন্যের নজর কাড়তে পারি। স্কুল-কলেজের পরীক্ষাগুলো তরে গেছি এক রকম করে। স্বাস্থ্যটা আমার বরাবরই ভাল। খাটবার ক্ষমতা আছে। অন্তত তখন ছিল। বুদ্ধির ঘাটতিটা খেটে পুষিয়ে দিয়েছিলাম। এই পরীক্ষাটার আগে রোজ চোদ্দ-পনেরো ঘণ্টা করে পড়েছি। বাবা-মা পর্যন্ত অনেক সময় আমাকে বই বন্ধ করতে বলতেন।

জেলা সদরে এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জে নাম লিখিয়ে হাপুগাইছি। একবার কার্ড রিনিউ করতে গিয়ে ডুপ্লিকেটের সঙ্গে আলাপ। তখনই বুঝেছিলাম বুদ্ধিমান আর চালাক দুটো কথার মানে আলাদা। ডুপ্লিকেট চালাক ছেলে। আসলে অসম্ভব ধূর্ত। এ ধরনের ছেলেরা ভালো মানুষদের বোকা বলে। নিজেকে ঢেকে চেপে রেখে অন্যের পেটের কথা টেনে বার করতে ওস্তাদ। এ সব যারা পারে, তাদের এক ধরনের পাটোয়ারি বুদ্ধি থাকে। ডুপ্লিকেটের সেটা ভাল রকমই ছিল। দুজনেরই এক নাম। আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বয়েসেও দু-চার মাসের ফারাক। চেহারায় অবশ্য অনেক গরমিল। আমি এ্যাভারেজ বাঙালির চেয়ে একটু বেশি লম্বা। গায়ের রঙও দু পোঁচ বেশি পরিষ্কার। এক মাথা ঘন চুল। শিশি-বোতলের ক্যাপ যত শক্তই হোক না হাতের এক মোচড়ে তা খুলে দিতে পারি। কাঁচা আখ দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে খেতে পারি স্বচ্ছন্দে।

ডুপ্লিকেটের এসব ব্যাপারেই অনেক ঘাটতি। শুধু রোগা, বেঁটে আর কালোই

নয়, এই বয়সেই চুলের ফাঁক দিয়ে মাথার চামড়া দেখা যায়। চোখ দুটো গর্তে ঢোকানো। কুঁত কুঁত করে তাকায় আর খিক খিক করে হাসে। চলে যাবার পর খেয়াল হল আমার অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত তার অজানা নেই। আমি শুধু জানি দুজনেরই এক নাম। পরীক্ষাগুলোও একই বছরে পাশ করেছি। পাশের ধরনও দুজনের একই রকম। এর বেশি আর কিছু জানি না। এমন কি ডুপ্লিকেট কোথায় থাকে তাও খেয়াল করে জেনে নিই নি।

আমার জীবনে পাওনার ঘরে অনেক ফাঁক। কিন্তু অভাববোধকে বেশি আমল না দেওয়ায় কষ্টও কম। মঞ্জু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে আমার ফাঁক-ফোকর যেটুকু ছিল তাও বুজে যেত। ইন্টারভিউটা দিয়ে আমার বিশ্বাস হয়েছিল আমি আর চাকরি একে অন্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যানের শেষ কথা ছিল—এই ধরনের আউটডোর ওয়ার্কের জন্যে আপনার মত স্ট্রং ফিসিকের লোক দরকার। সবাই শুনে বলল এ্যাপয়ণ্টমেণ্ট লেটার এল বলে। কিন্তু কোন দিনই তা এল না। আমার চেনা একটি ছেলে একই সঙ্গে পরীক্ষা আর ইন্টারভিউ দিয়েছিল। সে কিন্তু চাকরিতে ঢুকে গেল।

আসল খবরটা পেলাম সেই ছেলেটির ই কাছে। আমার এ্যাপয়ণ্টমেণ্ট লেটার একাধিক কুশলী হাতের প্যাঁচে চলে গেছে ডুপ্লিকেটের কাছে। তার সড়ের লোক ছিল এ অফিস আর এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ দু জায়গাতেই। দু'জনেরই এক নাম, এক কোয়ালিফিকেশান হবার সুবিধেটা পুরো উশুল করে নিয়েছে ডুপ্লিকেট রিটন্ টেস্টে ধ্যাড়ান সত্ত্বেও।

আমি ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। খবরটা জেনে কান গরম হয়ে গেল। সোজা চলে গেলাম ডুপ্লিকেটের অফিসে। তত দিনে ডুপ্লিকেট দু মাসের মাইনে পেয়ে গেছে। আমার দেখে কিন্তু এতটুকু ঘাবড়ালো না। উলটে রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করল আমি এখনো মিঃ বেকারের আণ্ডারে কাজ করছি কিনা। সোজা ওর কলার চেপে ধরে অনেকখানি রাগ আর ঘৃণা মিশিয়ে একটা চড় মেরে বললাম —আমার মাথায় যে কাঁঠালটি ভেঙেছেন তার আঠা আমি সারা জীবন ছাড়াতে পারব না। আপনার কষ্টটা সে তুলনায় সাময়িক।

অফিসের লোকজন হই হই করে ছুটে এল। ডুপ্লিকেটের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছিল। সকলের চোখের রাগি প্রশ্নকে গ্রাহ্য না করে বললাম—অপরাধের

তুলনায় শাস্তিটা বেশি হয়েছে না কম হয়েছে সেটা বরং ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন আপনারা। আমি দরকার হলে জেলে যেতে রাজি আছি।

ডুপ্লিকেটের রুমালশুদ্ধু ডান হাত রক্ত মুছতে ব্যস্ত। বাঁ হাত নেড়ে আর যন্ত্রণায় অস্পষ্ট কতগুলো শব্দের সাহায্যে সকলকে কোন রকমে বোঝাল আমার কোন দোষ নেই। আমাকে যেন কেউ কিছু না বলে। বুঝেছিল আমি কথা বললে ওর স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। আমি থমকে যাওয়া অনেকগুলো চোখের প্রশ্নকে পাত্তা না দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।

ক'দিন পরেই মঞ্জু সুধীরকে বিয়ে করল। গ্লিলের ফার্নিচার বানানোর কারখানা আছে সুধীরের। ব্যাঙ্কের টাকায় তার ব্যবসার ফলফলাও অবস্থা।

আমি আর কোন চিঠি পাই নি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে। তবে কনফার্মড বেকার হিসেবে তিন মাস অন্তর দেড়শো টাকা সরকারি খরচাও পাই। এই প্রথম শুনলাম তারা খসার সময়টা কল্পতরুর চেহারা নেয়। জলদেবতা সোনার কুণ্ডুল হাতে উঠে আসেন। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

স্বগত চিন্তা—দুই

রাণীদি গাইছিল—না চাহিলে যারে পাওয়া যায় তেয়াগিলে আসে হাতে। দিবসে সে ধন হারায়েছি, আমি পেয়েছি আঁধার রাতে।

দেখতে ভাল নয় রাণীদি। মুখে একটা আলগা ঝকঝকে ভাব আছে। গায়ের রঙ শ্যাম বর্ণ বললেও একটু বাড়িয়ে বলা হবে। কনুইয়ের কোঁচকানো চামড়া আর কণ্ঠার হাড় আমার নজর এড়ায় না। বাঙালি মেয়ে পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চি লম্বা হলে অনেক পুরুষকেই তার পাশে বেঁটে লাগে। আমাকেও। রাণীদি কুঁচবরণ রাজকন্যা নন ঠিকই; কিন্তু তার মস্ত বড় এক ঢাল খোলা চুলের সঙ্গে বর্ষার মেঘের উপমা বেমানান হয় না। সব মিলিয়ে আহা মরি করার মত কিছু নয়। কিন্তু রাণীদি যখন গানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেন তখন মনে হয় সারা শরীরে প্রার্থনার মগ্নতা। সেই মুহূর্তে রাণীদি আমার চোখে সুন্দর হয়ে ওঠে।

সুরের সঙ্গে কথাগুলো গীতবিতানের পাতা ছেড়ে শেকড়শুদ্ধু উপড়ে আসে। নিজেদের মেলে ধরে। জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির সঙ্গে মিলেমিশে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদকে নতুন করে চেনায়। রাণীদির গানের সঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথের

হাত ধরে হাঁটছিলাম। রাণীদি আর আমার সম্পর্কটা বলে বোঝানো শক্ত। এই গানটাকে আতস কাচ মনে করলে যা নিজের কাছেও অজানা, তার ওপরেও বেলা বারোটার মেঘমুক্ত সূর্যের আলো। কিন্তু মেঘ জমতেও দেরি হয় না। তার সঙ্গে কিছু বা রহস্যের আলো আঁধার। একবার আমীর খাঁ সাহেবের একটি প্রোগ্রামের ক্যাসেট শুনেছিলাম। রাগ ভাটিয়া। আফ্রিকার জঙ্গলে শুনেছি শেষ রাতের আগে অন্ধকারের মধ্যে ফাটল ধরে অল্পক্ষণের জন্যে। আকাশ একটু ফিকে হয় কি হয় না। তাকে বলে ফল্‌শ ডন্—নকল উষা। সেই ফুটি-ফুটি আলো উঁকি দিতে না দিতেই অন্ধকারে চরাচর আবার ছয়লাপ। যত রহস্য অন্ধকারে, তার চেয়ে বেশি ছমছমে অস্পষ্টতা সেই অতি ক্ষীণ আলোর স্বল্পস্থায়ী ইশারায়। আমীর খাঁ সাহেবের গলায় ভাটিয়ায় সেই আলো-অন্ধকারের রহস্যময় ভাবভালবাসা। শুদ্ধ মধ্যমের জোরাল আবির্ভাবে সেই অস্ফুট আলোর আবাহন, বন্দনা। কিন্তু সে আলো থাকার জন্যে আসে নি। তীব্র মধ্যম আর তার অনুষঙ্গে শুদ্ধ ধৈবত আর নিষাদকে দুলিয়ে তার সপ্তকের কোমল ঋষভে কেঁদে ওঠে সেই আলোর বিদায়বেদনার তীব্র আর্তি।

রাণীদির সঙ্গে আমি এই না-আলো, না-অন্ধকার, আনন্দ-ভয়-রহস্যে মেশা একটা সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে গেছি। সেটা রাত্তিরের ব্যাপার। তাও রোজ নয়। তার সুযোগও নেই। তবু ওই সময়টুকু রাণীদি আমাকে, আমি রাণীদিকে জড়িয়ে ধরে দুটো শরীরের দূরত্ব ঘুচিয়ে দিই। একটা ভীষণ ঝাঁঝালো আনন্দের নেশায় পেয়ে বসে দুজনকে। কখন যে ঘটে যাবে ব্যাপারটা তার জানানি থাকে না আগের থেকে। কিন্তু দুজনেই টের পাই একসঙ্গে। রাণীদির একটা বিশেষ তাকানোর ধরন আছে। সেই তাকানোতেই অনেক না-বলা বাণী ঘন যামিনীর পার থেকে বেরিয়ে আসে। মনের মধ্যে তার প্রক্রিয়া শুরু হয় নিঃশব্দে। শরীর তাততেও সময় লাগে না। তখন প্রতিটি লোমকূপই চুম্বক। আমারও, রাণীদিরও। রাণীদিই আমার জীবনে প্রথম নারী। এখনো পর্যন্ত দ্বিতীয়ার দেখা পাই নি। চেষ্টাও করি নি। তবে এটুকু বুঝি রাণীদিকে আমি ভালবাসি না। আসলে ভালবাসা কী আমি তাই জানি না।

বছর খানেক আগে রাণীদি রেডিওতে বি-হাই থেকে এ গ্রেডে উঠেছে। টেলিভিশানে কালেভদ্রে প্রোগ্রাম পায়। তিন বছর ধরে রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে গাইবার জন্যে ডাক পায়। এখন ধরাধরি ছাড়াই রেকর্ড,

ক্যাসেট বেরোয়। বোশেখ মাসটা তো প্রায় রোজই কোন না কোন জায়গায় রাণীদির প্রোগ্রাম থাকে। এ-ছাড়াও মাসে দু-তিনটে খেপ থাকে। বাড়িতে ক্লাশ, এখানে আর কলকাতায় গানের স্কুলের বাঁধা রোজগার তো আছেই। এই মফঃস্বল শহরেও লোক বাড়ি বয়ে আসে কনট্যক্ট করতে। কথা বলি আমিই, রাণীদির আনঅফিশিয়াল ম্যানেজার।

রাণীদির একদা-গায়ক স্বামীকেই কেউ মনে রাখে নি। লোকটার নানান স্মৃতিচিহ্ন রাণীদির শরীরের নানান জায়গায় পাকাপোক্তভাবে থেকে গেছে। রাণীদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বছর পাঁচেক। অথচ এই লোকটিই একদিন রাণীদির সারা আকাশ জুড়ে ছিল। জীবনের প্রথম কুড়িটা বছরের সঙ্গে আস্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে-থাকা ঘরদোর, সেখানকার মানুষজন, কেউ ধরে রাখতে পারে নি রাণীদিকে। সোজা বেরিয়ে এসেছিল। পরের বছর ছয়েক তার জের টানতে হয়েছে। রাণীদির নামডাক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি না লোকটা মানুষজনের মন থেকে একটু একটু করে মুছে যেতে লাগল। রাগ আর ঈর্ষা কুরে কুরে খেয়ে লোকটাকে একেবারে অমানুষ করে দিল। এই সব লোকের সঙ্গে মদের সহজেই বন্ধুত্ব হয়। হলও তাই। রাণীদি তখন লোকটার থেকে কেরিয়ারকে অনেক বেশি ভালবাসে। দশ বছরের মেয়ে চুমকিকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দিয়ে রাণীদি একদিন লোকটাকে পস্টাপস্টি বলল : চললুম। মুরোদে কুলোলে মামলা কোরো। বলে চলে এল যে শহর থেকে একদিন বেরিয়ে গিয়েছিল সেখানেই। কিন্তু ছেড়ে যাওয়া বাড়িতে কোন দিনই যায় নি। সেখানকার লোকজনই বরং যেচে আসে রাণীদির কাছে, হাত পাতে। লোকটা—কী আশ্চর্য—রাণীদির আর খোঁজ করে নি। বেঁচে আছে কিনা কে জানে।

আমি বলতে গেলে রাণীদির অন্নদাস। ছাত্র, ম্যানেজার, বডি গার্ড, চোরা প্রেমিক—এক সঙ্গে অনেকগুলো ভূমিকা পালন করি। কোনটাই খুব স্পষ্ট নয়। মোটামুটি থাকি অবশ্য নিজের ডেরায়। সেখানে অনেক লোকের ঘেঁষাঘেঁষি আর চোরা চাউনিতে বাতাস সব সময় বিষিয়ে থাকে।

রাণীদি কখনো আমার সঙ্গে ঢিলেঢালা মেজাজে গল্প করে না। ফুরসতও নেই। যখন খুব ঘনিষ্ঠ হয় তখন কোন কথাই বলে না। বলার দরকারও হয় না।

রাণীদির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব একটা লুকোছাপা নেই। ওরা তিনজন

আগে এ নিয়ে আমাকে অনেক ঠাট্টা করত। আমি অল্প কথা আর জোরাল হাসি দিয়ে আমার চারপাশে পাঁচিল গেঁথেছি। ওদের কোন কৌতূহল, কোন প্রশ্ন আজ পর্যন্ত সে পাঁচিল টপকাতে পারে নি। আমিও চলছে-চলুকের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে বেশ আছি। বি. এসসি.-টা যে পাশ করেছিলাম তা বেমালুম ভুলে গেছি।

রাণীদি খেপ পেলে আমিও ল্যাংবোট হিসেবে গাইবার সুযোগ পাই। রাণীদিই করে দেয়। ও পাঁচশো পেলে আমিও পঞ্চাশ পাই। এক সময় নিজের ভাল ভয়েসকে দেবব্রত বিশ্বাসের গলাকে কার্বন কপি করার কাজে লাগাতাম। এখনো তাই করি। জি শার্পের খাদ মধ্যমে স্বচ্ছন্দে গলা নাবে। তবে জানি এখন আর আলাদা করে গায়ক হিসেবে নিজেকে চেনাতে পারব না। অন্তত যত দিন রাণীদির ছত্রছায়ায় আছি।

আমার বর্তমানটা একটু একটু করে অতীত হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতকে বর্তমান দাঁতে কাটছে রোজই একটু একটু করে। এক সপ্তাহ পরে কী হবে জানি না। জানার ইচ্ছেও নেই। ইচ্ছে করতে কেমন ভয় ভয় করে। তাহলে তারা খসার ভীষণ মুহূর্তের মুখোমুখি হলে কোন ইচ্ছেকে তুলে ধরব? আমার সে রকম কোন ইচ্ছা আছে কি? এই প্রশ্নটার মশাল ধরিয়ে তার আলোয় দেখতে পাচ্ছি রাণীদিকে। সমস্ত প্রাণ মন ঢেলে রাণীদি গাইছে : আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারি নি তোমারে নাথ।

স্বগত চিন্তা—তিন

কাগজটার নাম দিয়েছিলাম কাটুম কুটুম। কভারে অবনীন্দ্রনাথের খামখেয়ালি ফসলের একটা ছবিও ছিল। ভেতরটাও কাটুম কুটুমে ভর্তি। আমার মত আরো কয়েকজনের রক্তের কলস্বর চেহারা নিত, নেয় কবিতায়। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পাউডার মেখে সেগুলো গিয়েছিল বড় কাগজের হাটে বিকোতে। ফিরে এল প্রত্যাখ্যানের কালিঝুলি মেখে। তখন রাগে, দুঃখে, অভিমানে রক্তের মধ্যে নতুন করে ঝড়। আরো কিছু রাগি কবিতার জন্ম। এই সব দিয়েই দু মলাটের মধ্যের দু' ফর্মা—ডিমাই সাইজের-ভরে দিয়েছিলাম। হাবু মিত্তির কনট্রাকটর, জগদ্ধাত্রী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, বিছানা-বালিস-মশারির দোকানের মালিক রামধন হাটি আর ঝাড়াই মশলার স্টকিস্ট অনন্ত জানার কাছে তারপর বিজ্ঞাপনের

জন্যে হাঁটাহাঁটি। বাটা, ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন, ইউকো ব্যাংক এদের বিজ্ঞাপন কি করে হাতাতে হয় জানা নেই। প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপনের আয় থেকে দ্বিতীয় সংখ্যার কাগজের দামটা উঠে যাবার কথা। বাঁধাইয়ের খরচাও কিন্তু উঠল না। তখন পরের সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের পাটই তুলে দিলাম। খুব অহংকার করে সম্পাদকীয়তে লিখলাম—চাই না বিজ্ঞাপনের মুষ্টিভিক্ষা। চাইতে আর হলও না। কাগজ বার করার চিন্তাটাই আমাদের কাছে বেল গাছ। এবং তার তলায় দাঁড়ালে আমরা সকলেই ন্যাড়া। প্রবাদ বাক্যটির মর্যাদা রক্ষার জন্যে আর ও মুখো হই নি। আমাদের আঠারো-কুড়ি-একুশ বছরের স্পর্ধা, গর্ব, পাহাড়ের চূড়োকে লাউডগার মত নমনীয় ভাবা—কাটুম-কুটুমের ইস্তেকাল হওয়া ইস্তক ভিজে বারুদ। অনেক রকম দুঃখ, হতাশা, ব্যর্থতা, গ্লানি একটা স্যাঁতস্যাঁতে কুয়াশার পর্দা টাঙিয়ে রাখে অষ্ট প্রহর। কখনো সখনো পর্দাটা ফুটো হয়ে যায় হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে। বড় কাগজে হঠাৎ একটা কবিতা ছাপা হওয়া, কবি সম্মেলনে কবিতা পড়ার আমন্ত্রণ পাওয়া। এমনি একটা আমন্ত্রণ আমাকে দিয়েছিল একটা নিটোল মুক্তোদানা দিন। সেই দিনটা আমাকে পরে উপহার দিয়েছে এক স্মরণীয়—এবং জাপটে ধরে আদর করার মত—বিষাদ।

জায়গাটার ভেতরে বাইরে মুঠি পাকানো ছোটবড় টিলা, পাহাড় বলে দেয় পশ্চিম বাংলার খানিকটা সাঁওতাল পরগণার আঁচলচাপা। তা সেই পাথুরে সহরেও আ মরি বাংলা ভাষা আমার বয়েসী কিছু ছেলের মধ্যে কবিতার ফসল ফলায়। এদের অনেকেই আমার চেয়েও ছন্নছাড়া। কারুর চামড়ার পার্স নেই। রাখার দরকারও পড়ে না। এদের মধ্যে যে ছেলেটিকে সুনীলদা, শক্তিদাও ডেকে কথা বলেন তার তাবৎ পার্থিব সম্পত্তি একটা সাইড ব্যাগের মধ্যে ধরে যায়। এই ছেলেটিই আরো কজনকে জুটিয়ে বছরে একবার মিউনিসিপাল হল জোগাড় করে, মাইক ভাড়া করে নিজেদের কবিতা শোনাতে, অন্যের কবিতা শুনতে। ছেলেটির জহুরি বলে নাম আছে। তার কার থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে মনে হল জাতে উঠেছি।

অটোগ্রাফ বিলোনো কবিরা প্রায় কেউই আসেন নি। সুনীলদা বিদেশে, আসার প্রশ্ন ওঠে না। এলেন শুধু একজন, যাঁর বেপরোয়া জীবনযাত্রা তাঁর কবিতার মতই কবিযশোপ্রার্থীদের আকর্ষণ করে। হাঁড়িয়া, মহুয়া, হুইস্কি, রাম সবের প্রতিই জ্যেষ্ঠ কবির অপক্ষপাত ভালবাসা। কবিতার এই স্ট্যাগ পার্টিতে বিপরীত

লিঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধির চোখে চোখ পড়তেই বুকের মধ্যে রক্তের গান শুনতে পেলাম। এই প্রথম। চেনা গানের কলি প্রশ্ন হয়ে বন্ধ ঘরে চড়াই পাখির মত মাথা কুটতে লাগল : বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে / সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না॥ সেলাম জানালাম রবীন্দ্রনাথকে।

এত হালকা-পাতলা যে একটা মাঝারি কালবোশেখির ঝড়ের সামনে তুলোর পুতুল হয়ে যেতে পারে। গাঢ় রঙের শাড়ি-ব্লাউজে সন্ধ্যার আগুয়ান অন্ধকারের স্বচ্ছন্দ শরিক। কিন্তু দু' চোখে যমজ সমুদ্র; তার পাড়ে অশ্রুভরা বেদনার কাজল। মিউনিসিপাল হলের চৌহদ্দির বাইরে ছড়িয়ে গেল সেই চোখের দৃষ্টি যখন শুনলাম ঝাপসা, অল্প ভাঙা গলায় আমার, আমাদের কথা :

পৃথিবী তোমার বিষে নীল বত্রিশ নাড়িতে / আমার স্বপ্নের লাগে ফাঁস। / তোমার বেজন্মা যত পঙ্গপাল সন্তানেরা শুষে নেয় দুষ্প্রাপ্য বাতাস। / আমার নিজস্ব বায়ু, সামান্য আকাশ, / একান্তে বাঁচার মত স্বাদু অবকাশ, / লুটেরারা কেড়ে নেয়, রাখে না কিছুই, / কোথায় বসাব ভালবাসার দোপাটি চারা, কোথা পাব ভুঁই?

তার আগেই আমার কবিতা লোকাল কবিদের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। নামটা নিয়মমাফিক দুহাত জোড় করার সময়েই জেনেছি : অনুত্তমা। ভুল, ভুল। ওই রকম অতলান্ত যার দু চোখ, কণ্ঠে যার অত তীব্র অভিযোগ, সে কখনো অনুত্তমা হতে পারে না।

জ্যেষ্ঠ কবিকে প্রধান চুম্বক বলে সবার শেষে রাখা হয়েছিল। আমি তার আগেই বেরিয়ে এসেছিলাম। বাইরে থেকেই লাউড স্পিকারের চোঙা থেকে ঠিকরে-আসা নেশায় অল্প টালমাটাল জ্যেষ্ঠ কবির জোরাল গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। বাইরের কম্পাউণ্ডে দু-তিনটে ওয়াটার ট্যাংকার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণামের স্টাইলে উপুড় হয়ে রয়েছে। আমি তাদেরই একটির হাতলের ওপর বসলাম। আলোর থেকে খানিকটা দূরে। অনেকক্ষণ সিগারেট খাই নি। পকেটে হাতড়ে বুঝলাম সিগারেটের প্যাকেটটা ঠিকই আছে, কিন্তু দেশলাই নেই। কেউ নিয়ে পকেটস্থ করেছে। আঙুলে ধরা সিগারেটের ডগার দিকে তাকিয়ে আছি, ফশ করে দেশলাই ধরানোর শব্দ। আলোর উল্টো দিকে বলে মুখের জায়গায় অমাবস্যা। আমি তাকিয়েই আছি দেখে অস্পষ্ট ভাঙা ভাঙা গলায় শুনলাম : আমার আঙুলে ছ্যাঁকা লাগার আগেই ধরিয়ে নিন।

নিলাম। ধোঁওয়া ছেড়ে বললাম, আপনার হাতে ছ্যাঁকা লাগলে নিজের ডান হাতের আঙুল ঠাণ্ডা মাথায় পুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতাম।

—সাজানো কথা আগে শুনতে ভাল লাগত, এখন লাগে না,—চুলের ওপর আলো, তার নীচের অন্ধকার কথা বলে উঠল।

—তাহলে ভাল করে সাজাতে পারি নি। পারলে আপনার আগের ভাল-লাগাটা ফিরিয়ে আনতে পারতাম।

—এটা আগের চেয়ে ভাল হয়েছে,—ছোট্ট একটা হাসি ঘষটে গেল, আপনি দেখছি কথাবাজি ভালই পারেন।

—আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই পারি।

—এটা কিন্তু চাটুকারিতা হয়ে গেল।

—আমার কাছে এটাও একটা সার্টিফিকেট। সময়, সুযোগ, ব্যক্তি বুঝে চাটুকারিতা করতে পারাটা আজকের দিনে একটা বড় কোয়ালিফিকেশান।

—কিন্তু আপনার পুরো চেষ্টাটাই যে ব্যর্থ হয়ে গেল সময়, সুযোগ আর ব্যক্তির ত্রহস্পর্শ যোগ ঘটল না বলে।

—সেটা তো চাটুকারের ভাববার কথা, আপনার নয়।

—তাহলে তিনটের সবগুলোই আপনার মনের মত হয়েছে?

—সব চেয়ে ইমপর্টেন্ট ফ্যাকটর হল ব্যক্তি। তিনি তুষ্ট হলে আর দুটো, সময় আর সুযোগ, দুই আর একে তিন হয়ে যায়।

—যদি বলি আপনার কথায় আমার রাগ হচ্ছে আপনি আমাকে ব্যঙ্গ করছেন বলে।

—তাহলে আমার বুকের মধ্যে এতক্ষণ ধরে যে কাঁপুনিটা সমানে চলছে সেটা কথার মধ্যে চলে আসবে। আমি তোতলাতে তোতলাতে বলব, পি-প্লিজ, আপনি, রা-রাগ করে চলে যাবেন না।

—আপনি দেখছি সাংঘাতিক লোক। কবিতা লেখা আর চাটুকারিতা—দুটোর মধ্যে কোনটা আপনার বেশি ভাল লাগে।

—আপনি যেহেতু ইন্টারভিউ নিচ্ছেন না তাই সত্যি কথাটাই বলব। আসলে দুটোর কোনটাই আমি পারি না, দ্বিতীয়টা তো একেবারেই নয়।

—তাহলে এতক্ষণ ধরে কী করলেন?

—প্রথমে যেটা বলেছিলেন সেটাই ঠিক। কথাবাজিই বটে। স্রেফ কথার চক্করে আপনাকে আটকে রাখবার চেষ্টা করছিলাম।

—কিন্তু কেন?

—আপনার কবিতা আমার ভীষণ ভাল লেগেছে বলে। আরো ভাল লাগল আপনি অসংকোচে আমার সিগারেটটা ধরিয়ে দিলেন বলে। বাই দা বাই, আপনি কি সিগারেট খান বলে দেশলাই রাখেন, না শুধু দেশলাই?

—শুধু দেশলাই।

—সেটা কি হাতে সিগারেট, দেশলাইহীন বিপন্নকে সাহায্য করার জন্যে?

—না, আমি যে ঘরে থাকি তাতে ইলেকট্রিক নেই।

—ও, সরি, এ সম্ভাবনার কথাটা আমার একেবারেই খেয়াল হয় নি।

—সেটা আপনার দোষ নয়। আপনি আমার কিছুই জানেন না।

—তা ঠিক। যতটা জানলাম, ততটা কিন্তু স্বচ্ছ এবং সাবলীল।

—আপনি কিছুই বোঝেন নি। আমি স্বচ্ছও নই, সাবলীলও নই। অন্ধকার ঘোরাল হয়ে উঠল কথাগুলোর মধ্যে পাহাড় ভাঙার শব্দে।

আমি ঢোঁক গিললাম। বুকের মধ্যে একটা বরফের টুকরো গলতে লাগল।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে বললাম, একটা মানুষের মধ্যে সব সময়েই অনেকগুলো মানুষ থাকে ভালোয় মন্দয় মিলিয়ে। আপনার যেটুকু জানলাম, বুঝলাম তাতেই আমার অনেকটা ভরে গেল। আপনি কোথায় অস্বচ্ছ, কোথায় অসাবলীল সেটা না হয় অজানাই থাকল।

ভাঙা গলায় একটা চাপা হাসির পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল। অন্ধকারটা ভীষণ নিষ্ঠুর গলায় অন্য মানুষ হয়ে বলল, মানে তুই হলি রসিক নাগর যে মধুটুকু লুটেই কেটে পড়তে চায়। বিষটা চাখবি না? চাঁদের উলটো পিঠটায় কী আছে জানতে ইচ্ছে করে না তোর? একটা সাপিনী হিসহিসিয়ে উঠল।

বুঝলাম কথার ট্র্যাপিজের খেলায় আমার পা টলছে। বেসামাল হলেই আছাড়। তবু এক ভয়ংকর নেশা একটু একটু করে পেয়ে বসছে আমাকে। আরেক আমি আমার হয়ে কথা বলল, তুমি যদি হাত ধরে চেনাও তাহলে চিনব।

—ভয় পাবি না?

—তোমার হাতে হাত রেখে তোমার আশ্চর্য সুন্দর চোখে চোখ রাখতে পারলে ভয় কিসের,—গলার আওয়াজ চেষ্টা করে সোজা রাখলাম।

—আমার ভীষণ লোভ হচ্ছে।

—কিসের লোভ?

—আপনার কথাগুলো বিশ্বাস করতে, অন্ধকার আগের চেয়ে স্বচ্ছ।

—তা করুন না, আমিও আগের আমিতে ফিরে গিয়ে বললাম, আপনি বিশ্বাস করলে তো আমি বেঁচে যাই।

—কিন্তু আমি যে পাগল।

—আমিও আরেক কিসিমের পাগল। খ্যাপা আর খেপিতে মিলবে ভাল।

—আমি কিন্তু এখন কথাবাজি করছি না। আমি দু বছর এ্যাসাইলামে ছিলাম। একবার চল্লিশটা কামপোজ খেয়েছিলাম, আরেকবার বাঁ হাতের কবজির শিরা কেটেছিলাম। তবু মরি নি। এর পরেও আমার হাতে হাত রাখবেন?

লাউড স্পিকারের চোঙা দিয়ে এক রাশ হাততালি নুড়ি হয়ে আছড়ে পড়ল। শেষ হল জ্যেষ্ঠ কবির দীর্ঘ কবিতা।

খেপির জীবনের সিংহ তোরণ দিয়ে বেরিয়ে যাবার তিন নম্বর চেষ্টাটা ব্যর্থ হয় নি। যে দুয়ারটুকু পার হতে এত সংশয়, এত ভয়, এত ভাবনা, তা সে অনায়াসেই পেরিয়ে গিয়েছিল। মাস কয়েক পরে। আমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

অনেকে খেপিকে প্রশ্রয় দিত ভালবেসে। তাই কাগজে খবরটা ক'লাইন বেরিয়েছিল। তাতে বয়েস দেওয়া ছিল আঠাশ। আমার আরো কমই মনে হয়েছিল। আর লেখা ছিল তিনি অবিবাহিতা ছিলেন।

খবরের কাগজটার ওপর দিকের একটু ফাঁকা জায়গায় খেপির জন্যে আমার সেই সময়টুকু কয়েকটা লাইনের মধ্যে উজাড় করে দিয়েছিলাম ঝড়ের মত কলম চালিয়ে :

কখন তুমি কেমন করে ফুটেছিলে দেখি নি তো / ভোরের মৃদু আলোয় যখন হারিয়ে গেলে / তখনই ঠিক বুকের মধ্যে বোবা দুঃখ / উথাল-পাথাল। কবিয়ালের আর্তিটুকু / নিংড়ে নিয়ে সাদা কালির প্রশ্নে আকাশ / ছেয়ে গেল : জীবন এত ছোট কেনে।

খেপি তোর হাত ধরে তোর চাঁদের উলটো পিঠ চিনব বলেছিলাম। পারি নি। আজ চাইলে তুই আমার হাত ধরবি খেপি?

স্বগত চিন্তা—চার

ড্যাম ইট, ড্যাম ইট, ড্যাম ইট। ড্যাম ওয়ান এ্যাণ্ড অল।

একা থাকলেই আমার রক্তের মধ্যে কাঁকড়া বিছের সার ল্যাজ উঁচিয়ে দৌড়োয়। এমনিতেই আমি একা। অনেকের মধ্যে থাকলেও অনেক সময় আপনা হতেই একটা ঘেরাটোপে ঢাকা পড়ি। তখন আসপাশে যারা থাকে তাদের দেখতেও পাই না, তাদের কথা শুনতেও পাই না। তখন আমার বদলে একটা বছর চারেকের ছেলে সারা বাড়ি মাকে ডেকে কেঁদে বেড়ায়। তাকে পরে তার গোরিলার মত চেহারার বাপ বুঝতে শিখিয়েছিল তার মা মারা গেছে। কলকাতার হাসপাতালে। আস্তে আস্তে চুপ করে গেছে। সেণ্ট অগাস্টিনের হোস্টেলে থাকার সময় অন্য ছেলেদের মা-বাবাকে দেখলে বুঝতে পারতো তার জীবনে একটা মস্ত ফাঁক আছে। গোরিলামার্কা বাবা টাকা পাঠিয়ে খালাস। গোরিলা এবং গোরিলার বাবা বক রাক্ষস দুজনেই খানদানি ডিবচ্। বক রাক্ষস সিনেমার ভিলেনমার্কা জমিদার, গোরিলা জাঁহাবাজ উকিল। গরীব লোকের বেশি সম্পত্তির সঙ্গে জড়ানো গোলমেলে মামলা জলের দরে কিনে নেয়। পরে লাঠি আর পয়সার জোরে সেই সম্পত্তি গাপ। এই সব করে মেলাই পয়সা করেছে। বাপের কাছ থেকে পেয়েছে নানান বয়েসি মেয়েছেলে নাড়াঘাঁটার সখটা। এ ছাড়াও এখানে একটি, কলকাতায় একটি, দুটি বাঁধা জলপাত্র আছে। লোকে বলে এই সহরের পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়েসের কিছু গাবদাগোবদা ছেলের বাপও ওই গোরিলাই। আমিই অবশ্য একমাত্র অফিসিয়াল ছেলে।

বক রাক্ষস শেষের দিকে কয়েক বছর বিছানার সঙ্গে সাঁটা। শরীরের হাল যাই হোক, মনে সে তখনো এ্যারেবিয়ান নাইটসের বাদশা। মাঝবয়েসি একটি বিধবা তার কম বয়েসে বক রাক্ষসের পাশ বালিস হত। পরে প্রক্সি দিত তার মেয়ে। সেই মা আর মেয়ের জিম্মাতেই শেষ জীবনটা ছিল বকরাক্ষস। এই মেয়েই আমার চোদ্দ বছর বয়েসে মেল অর্গানের প্রপার ফাংশানটা শেখায়। তার আগেই মৃত্যু ভীম হয়ে বক রাক্ষসকে পেড়ে ফেলেছিল। প্রথম প্রথম ভালই লাগত। তারপর গা ঘিন ঘিন। এক দিন ঘেঁসে আসতেই ধাক্কা মেরে ফেলে দিলাম। পরে মেয়েটা গোরিলাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছিল তার পেটে আমার বাচ্চা আছে বলে। গোরিলা মুখে কিছু বলে নি। তাকেও না, আমাকেও না। কদিন পরে সহরের বাইরে ধান ক্ষেতে তার বডিটা পাওয়া গেল।

পোস্ট মর্টেমে পেটে কোন বাচ্চা পাওয়া যায় নি। গোরিলা যে আমার বাবা এ্যাণ্ড প্রোটেকটার, তার ইনডিরেকট্ প্রমাণ মধ্যেমাঝে পেয়েছি। মেয়েটার জন্যে আমার কোন কষ্ট হয় নি।

আই. সি. এস. ই. পাস করে বাড়ি চলে এলাম। এইট্টি পার সেন্টের মত মার্কস পেয়েছিলাম। তবু কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছে করল না। গোরিলা পয়সা-কড়ির দিক দিয়ে আমার সঙ্গে বিশেষ চিপ্পুসি করে নি। এখনো করে না। তবে আমিই আর চাই না। নেহাত ঠেকায় পড়লে বকুল মাসিকে বলি। বকুল মাসি, শুনেছি আমার মায়ের লতায়-পাতায় কি রকম বোন, এক সময়ে গোরিলার মিসট্রেস, এখন হাউস-কিপার। ছেলেপুলে নেই। কেন জানি না, আমাকে বাবাবাছা বলে আমার মাথার গায়ে হাত বুলোতে ভালবাসে। আমার মায়ের পার্টটা বুঝতে পারি ওর খুব পছন্দ। আমিই পাত্তা দিই না। লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্যে গোরিলা আমাকে কিছু বলে নি। এক বাড়িতে থাকলেও তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাত বড় একটা হয় না। হলেও কথাবার্তা কম।

সেণ্ট অগাস্টীনে পড়ার সময় স্কুল অর্কেস্ট্রায় ট্রাম্পেট বাজাতাম। ব্রাদার বার্নাড আমাকে যত্ন করে শিখিয়েছিল বাজনাটা। স্কুল থেকে পাকাপাকি চলে আসার সময় আমার সঙ্গী ট্রাম্পেটটা আর এডি ক্যবার্টের এক গাদা রেকর্ড। তখন নোটেশান না দেখেও অনেকটা বাজাতে পারতাম বাখের ব্যাণ্ডেনবার্গ কন্‌চেরটো নাম্বার টু কিংবা হেইডেনের কন্‌চেরটো ইন এফ্। অনিচ্ছা আস্তে আস্তে বাজনাটাকে দূরে ঠেলে দিল। এখন হাত দিই কালেভদ্রে। বাখ আর হেইডেন দূরের মানুষ। বাজালে বড় জোর চেরি এণ্ড পিংক এ্যাপল্ ব্লসম্ কিংবা কাম সেপ্টেম্বর। ব্রাদার বার্নার্ড বলতেন, ইউ হ্যাভ ন্যাচারাল ট্যালেণ্ট ফর দিস ইনসট্রুমেণ্ট, নেভার স্টপ প্র্যাকটিসিং ইট। গত ছ মাসের মধ্যে বাজনার বাকশটা খুলি নি।

মাকে আমার মনে পড়ে না। কিন্তু নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে একটা অস্পষ্ট আভাস পাই। গোরিলার সঙ্গে আমার চেহারার কোন মিল নেই। গোরিলা লম্বায় শিকস্ ওয়ান, আমি ফাইভ সেভ্‌ন্। গোরিলার বুকেপিঠে লোমের ঠাসবুনোট। আমার বডি হেয়ার নেই। গোরিলার গায়ের রঙ পুরোন তামার পয়সার মত। আমাকে মোটামুটি ফর্সা বলা চলে। গোরিলার মত আতার বিচি চোখ, চ্যাটালো নাম, শুঁয়োপোকা ভুরু, নিগ্রয়েড্ ঠোঁট কোনটাই

আমার নেই। তবে গোরিলার মাসিভ্ চেহারা আমাকেও এক ধরনের স্টার্ডিনেস দিয়েছে। ওয়েল-মাসলড্ কমপ্যাক্ট বডি।

আমি বুঝি অনেক মেয়েই আমাকে চোখ দিয়ে চাটে। দু-চার জন কাছে ঘেঁষারও চেষ্টা করেছে। একজন অনেকটা কাছেও এসেছিল, চেয়েছিল আমাকে জানতে, বুঝতে। আমার ছোঁড়া ফাক্ ইউ, ড্যাম ইউ ঢিলপাটকেলের ঘা খেয়েও। তখন আমি বললাম, আই হেট ইউ। ও বলল, তুমি সব সময় এত রেগে থাক কেন? তোমার চেহারাটা এ্যাপলোর, কিন্তু মেজাজটা বিগ, ব্রলিং, ক্রুড্ লাম্বারজ্যাকের। মুখের ভাষাটাও তেমনি। হোয়াট্স্ এ্যাকচুয়ালি ইটিং ইউ? মনের মধ্যে রাগ পুষতে পুষতে একদিন ওভারলোডেড্ বয়লারের মতো ফেটে যাবে যে। তার আগে কিছু স্টীম তো বার করে দাও।

বুঝলাম এর টাইপটা আলাদা। বললাম, আমার রক্তের মধ্যে ডিবচারির বিষ। আমার বাপকে তো চেনো। চেহারায় যতই ডিস্‌সিমিলিয়ারিটি থাকুক না কেন, বেসিকালি আয়্যাম আ চিপ ফ্রম দা সেম ব্লক। আমার মা পর্যন্ত ভেগে গিয়েছিল ফ্রম দা ফ্ল্যাম টাচ অভ্ দিস ব্রুট। আমার তখন চার বছর বয়েস। আমার কান্না তার পায়ে শেকল পরাতে পারে নি। তুমিও পালাও।

—তুমি তাহলে কী চাও?

—টু কিল দা গোরিলা হু ইজ এ্যাকসিডেণ্টালি মাই ফাদার। আমার সে মুরোদ নেই, আই ল্যাক দা গাট্স্।

—পুওর, পুওর বয়।

—ডোণ্ট ট্রাই টু মাদার মি। এক ঝাপড়ে বদন বিগড়ে দেব।

—টোটালি লস্ট কেস—ব'লে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গিয়েছিল, আর আসে নি।

আমার একটা টাইম মেশিন চাই। তাতে চড়ে আমি ফিরে যাব আমার চার বছর বয়েসে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে একটি সুন্দরী মেয়ে, মাস্ট বি আ প্যারাগণ অভ বিউট, ছুটে পালাচ্ছে। আমিও ছুটে গিয়ে তাকে বলব, মম্, টেক্ মি উইথ ইউ, আই অলশো হেট দ্যাট গোরিলা। সে কি থেমে আমাকে কোলে তুলে নেবে না? বলবে না খোকা তুই আমাকে এত ভালবাসিস?

ড্যাম ইট, ড্যাম ইট, ড্যাম ইট। ড্যাম ওয়ান এ্যাণ্ড অল। উঃ শালা, ব্ল্যাডারটা ফেটে যাচ্ছে। পেচ্ছাপ করে যদি সারা পৃথিবীটাকে ভাসিয়ে দিতে পারতাম!

—কিরে উঠলি কেন? ইচ্ছের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিস নাকি?

—না, এই মুহূর্তে আমার একটাই ইচ্ছে। টু হ্যাভ আ গুড্ লিক।

—মানে?

—মুখ্যু কোথাকার। মুতবো রে শালা প্রাণ ভরে মুতবো।

—বোঝো ব্যাপার, সেন্ট অগাস্টিনে পড়া সাহেব এত উইশ ফুয়িশ বলে শেষে বিশ্বকর্মার পুত্র চামচিকে।

—আরেকটা করে ধরালে হোত, একটায় ঠিক জমলো না।

—তাহলে আরো তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে।

—সে কিরে? কেন?

—বেকার ভাতার দেড় শো টাকা তার আগে তো পাওয়া যাবে না।

—নারে, সক্কাল থেকে বেরিয়েছি বাড়িতে ক্যাচালের পর। সারা দিন পেটে অন্ন নেই। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।

—রাত্তিরে কোথায় খাবি।

—তুই তো আর খাওয়াবি না, তাই যেখানে রোজ অসম্মানের ভাত খাই সেখানেই খাব।

—ব্যাটা মুতব বলে গেল কোথায়?

—মুততে মুততে গেল ডুলি, ডুলি গেল সে কমলাপুলি, কমলাপুলির টিয়েটা, স্থযিমামার বিয়েটা।

—হাঁরে, বিয়েবাড়িটা কেমন নিরুম মনে হচ্ছে। সানাই বাজছে না। কোন সাড়াশব্দ নেই। শাঁখ নেই, উলু নেই।

—তাতে তোর কি? বর যদি নাও আসে, তোকে তো আর অপরাজিতর অপুর মত চটজলদি বর হতে বলবে না।

—বাজে কথা রাখ, তাহলে উইশ বল, ইচ্ছে বল, আমাদের কিছুই নেই?

—তাৎক্ষণিক ইচ্ছে হয় তো আছে। যেমন আমার প্রায় বারো তেরো ঘণ্টা অনশনের পর দারুণ খিদে পেয়েছে। ভূতের রাজার বর পেলে বলতাম, লে আও বিরিয়ানি, লে আও চিকেন চাপ। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারছি না, ভবিষ্যৎ আমার কাছে স্রেফ অভিধানের একটা শব্দ।

—কবিদের নিয়ে এই বিপদ, কথা বললেই ইমেজারি চলে আসে।

—আরে গেল তো গেলই, হিসি করতে গিয়ে একেবারে রাবণমূত্র নদী বইয়ে দেবে নাকি?

—সেটা আবার কী?

—দেওঘরের কাছে একটা নদী আছে। রাবণ নাকি মহাদেবকে ঘাড় থেকে নাবিয়ে শুশ্রূষা করতে বসেছিল। তা রাবণের মত মহাবলীর ব্যাপার তো। তাই থেকে নদীই হয়ে গেল।

—আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের গল্পগুলো বেশ মাইরি। একবার মনে কর ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্মের গল্পটা। ডীপ থ্রোট মার্কা দুর্দান্ত একশ্ রেটেড্ ফিলম্ হতে পারে। কোথায় লাগে মলয়ালম সফট্ পর্ণো ছবি।

—আরে, ব্যাটাচ্ছেলে দেখ চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে। হিসি করতে গিয়ে আসল জিনিশটা খুইয়ে এল কিনা কে জানে?

—কীরে? কী হল?

—শীগগীর চল্,—হাপরপড়া নিঃশ্বাসের ধাক্কায় কথাগুলো এলোমেলো—একটা মেয়ে অন্ধকারের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। সামথিং টেরিবল্ মাস্ট হ্যাভ হ্যাপনড্।

—থাক পড়ে। যাই, আর পরে পুলিশ বলুক তোমরা শালা গ্যাং রেপ করেছ।

—নারে, মনে হচ্ছে কিছু খেয়েছে। পশিব্লি পয়জন্।

—তুই বুঝলি কি করে?

—দেশলাই জেলে দেখলাম শি ওয়াজ ফ্রথিং এ্যাট দা কর্ণার অভ হার মাউথ।

—ওরে বিলেত না গিয়ে সাহেব, শাদা বাংলায় বল্।

—মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে।

—ঝোলালে, তা তুই মরতে ওখানে গেলি কেন?

—অন্ধকারে মেয়েটার গায়ে পা লেগে পড়ে যাচ্ছিলাম।

—চল্,—হঠাৎ একটা মন-ঠিক-করা গলা।

—কোথায়?

—মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব।

—তুই তো সারা দিন খাস নি, এই হ্যাঁপার মধ্যে যাবি?

—তাই বলে একটা মেয়ে মরে যাচ্ছে জেনেও আমরা পালিয়ে যাব?

—লেট্‌স্ গো, সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

—আমরা যতক্ষণ কথা বললাম, মৃত্যু হয় তো মেয়েটার দিকে আরো কয়েক পা এগিয়ে এল।

—বারে কবি বাঃ, ডায়ালগ দেবার অভ্যেসটা গেল না।

—তাহলে আমরা দুজনে যাই, তোরা টস কর যাবি কি যাবি না।

—ভারি মুরোদ, পারবি দুজনে তুলতে? শ্মশানে নিতে হলেও চারজন লাগে।

বলতে বলতে চারজনে চারটি ছিলেছেঁড়া ধনুক। হরিণ-পায়ে ছুটে গেল চার জোড়া পা। অন্ধকার মাঠের মধ্যে এক চাঙ্গড় অন্ধকার নিথর হয়ে শুয়ে। দু-তিনটে দেশলাইয়ের কাঠি একসঙ্গে জ্বলে উঠতে সামান্য একটু ঘোলাটে আলো।

—সর্বনাশ, এ যে দেখছি বিয়ের কনে! মুখে চন্দনের ফোঁটা।

—ওই বিয়ে বাড়িটার নয় তো।

—আরে, কোন না কোন বিয়ে বাড়ির হতে তো হবেই।

—কিরে, হয়ে গেল নাকি? নড়াচড়া তো করছে না।

দু-এক লহমা আগুপিছু করে দেশলাইয়ের কাঠিগুলোর আয়ু শেষ। আবার নতুন করে জ্বালতে হল। একজন মেয়েটির নাকের নীচে আঙুল রেখে বলল, না, নিঃশ্বাস পড়ছে এখনো।

—যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। নে, তোল।

—কোথায় ধরব?

—হ্যাকা, এক ফোঁটা একটা মেয়ে। আমি একাই পারব।—বলেই পাঁজা-কোলা করে তুলে ফেলল সব চেয়ে জোয়ান চেহারা যার। নতুন বেনারসী শাড়ি খড়খড় করে উঠল। সোনার চুড়ির রিনটিন। টোকো ঝাঁঝালো বিয়ের ফেনা চন্দন আর পারফিউমকে পুরোপুরি ঢাকতে পারে নি।

—আশ্চর্য, তুই-ই বলছিলি পুলিশের হাঙ্গামার কথা।

—হাঙ্গামা হলে ওর ছাতার কাপড়ের কোটপরা বাপ দেখবে।

—কিন্তু ওর গোপন প্রেমিকটি কোথায়?

—তুই তাকে খোঁজ তাহলে, আমি চলি।

—দাঁড়া, সকলেই যাব।

—ওকে বাঁচাতেই হবে। শি ইজ ট্রাইং টু এসকেপ ফ্রম দা ক্লাচেস অভ আ গোরিলা। নেভার সে ডাই মম্, আ'উইল সেভ ইউ।

—খেপি, তুই নিশ্চয় বাঁচবি, তোকে বাঁচতেই হবে।

—কি বলছিস তোরা?

কেউ জবাব দিল না। যার দু'হাতের মমতায় মেয়েটা লেপটে, সে যেন ওজন টেরই পাচ্ছিল না। বাকি তিনজনেও ছুটছিল। একজন সামনের জনকে ঠেলা দিয়ে বলল, তুই দৌড়ে যা, একটা সাইকেল রিকসা ঠিক করে রাখ। চার-জন কেউ এগিয়ে গেল না। নিভু-নিভু জীবনকে উত্তাপ দেবার জন্যে একসঙ্গেই রইল চারজন। অন্ধকার হার মেনে ওদের চোখে এনে দিল তিমিরহননের দৃষ্টি। চারজনের নীরব প্রার্থনা একজোট হয়ে প্রতিজ্ঞার চেহারা নিল: তুমি কে আমরা জানি না। জানতে চাই না বেঁচে থাকাটা তোমার কাছে এত তেতো হয়ে গেল কেন। নানান ভাবে হেরে গিয়েও আমরা তোমার মত পালিয়ে যাবার সোজা রাস্তাটার দিকে যাই নি। এক রকম করে বেঁচে আছি। তোমাকেও আমরা বাঁচাবই।

বলগা ছাড়া পায়ের দৌড়ে ডাক বাংলোর মাঠের বিস্তার ফুরিয়ে এল। ওদের ঘন ঘন নিঃশ্বাসে মৃত্যুর মুখে চ্যালেঞ্জের ঝাপটা। ওপর থেকে লক্ষ কোটি তারা দেখছিল এই অলৌকিক শোভাযাত্রা: একটা ধুকপুকে জীবনকে বাঁচাবার জন্যে চারটে ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা জালার বেপরোয়া অভিযান। অলক্ষ্যের সেই দর্শকরা ছুঁড়ে দিল একটি তুচ্ছ ভগ্নাংশ। ছোট্ট আগুনের একটা ফুলকি আকাশে আঁচড় টেনে আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ল। ওরা দেখতে পেল না। বড় রাস্তায় উঠতে না উঠতে অন্ধকার ফুসমন্তরে নাপাত্তা। সারা সহর আলোর বরণমালা নিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

আবহমানের ছবি

কিন্নর রায়

মধ্য-বৈশাখের রোদ লাগা ভোর। পাছদুয়ার পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বাঁ-পা এবং জলে ডান-পাটি ডুবিয়ে, কোমর থেকে পিঠ মাথা গলা বুক ঝুঁকিয়ে এনে, লালচে নতুন গামছায় কালো সর্ষে ধুতে ধুতে উমা টের পেল অক্ষয় তৃতীয়ার পৃথিবী বড় তাড়াতাড়ি গরম হয়ে উঠছে।

নতুন গামছায় কালো সর্ষে প্রায় দু-আড়াই সের। সঙ্গে সামান্য হলুদ, তেজ-পাতা, জিরে, ধনে—সব মিলিয়ে বারো রকম মশলা প্রায়। বোঁটাঅলা সবুজ কাঁচা আম, গিলা ফল—সবই গামছার বুকে। জলে ডোবানো ওঠানো, হাতের পাতা দিয়ে ঘষে ঘষে ধোয়াধুয়ির সঙ্গে সঙ্গে তাদের নানা বর্ণে রোদের মনোরম কারুকাজ।

উল্টোদিকে তারই মুখোমুখি, অথচ স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পূর্ণ বিপরীত শরীর বিন্যাসে দাঁড়িয়ে দেড় বছরের ছোট জা শৈল গামছার দুটি খুঁট বাঁ হাতে ধরে, ডান হাতে জলের ভেতর সর্ষে আর অন্যান্যদের রগড়াতে রগড়াতে প্রায় মন্ত্রের উচ্চারণে বিড় বিড় করে বলছিল—চিনি চিনি, মধু মধু হইও। বারো বারো বচ্ছর থাইকো। হগ্‌গলের ভালো দেইখো···। আর এই শব্দমালা, জলে নাড়ানাড়ির সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের জলে ভেসে থাকা দুই নারীর ছায়া ক্রমাগত ভাঙছিল। এই একই স্বর, একই কথা ফুটে উঠছিল উমার কণ্ঠেও।

সবে কুড়ি পেরনো দুই সন্তানের জননী উমার ফর্সা ঘাড়ে রোদ আর পুকুর-পাড়ে বিশাল নিমের ছায়ার আশ্চর্য কাটাকুটি। কখনও গালেও। আর গালে এই রোদ-প্রহারে আবছা এক লালিমাও। সে তুলনায় শৈল তো কালোই, কিংবা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

উমার কালীঘাটের পট হেন শারীরিক মানচিত্রের পাশে শৈল একহারা, ছিপ-ছিপে দীর্ঘাঙ্গী। এককথায় আধুনিকের স্লিম। উমার পাতলা, ভিজে, লালচে চুলে আটকে থাকে হলুদ হলুদ বুড়ো নিমপাতা। শৈলর দীর্ঘ কেশের এলো খোঁপায়

সদ্য স্নানের চিহ্ন। বাড়িতে ফিরে মেলে দিতে হবে, নইলে শুকোয় না। দুর্গন্ধ হয়। তার কানের পাশে যে শুকিয়ে ওঠা আলগা মতো ঝুরো চুল, সেখানে পুকুর থেকে সর্ষে ধোয়া জল ছিটকে এসে লেগে আছে। হঠাৎ দেখলে শাদা পোখ-রাজের উপমা মনে আসতে পারে।

ঘাটের ওপর পিতলের মাজা কলসি। স্বর্ণবর্ণে রোদের বাহারি কারুচিত্র। এবং পাশে দাঁড়ানো প্রায় নির্বিকার, সর্বাঙ্গ শাদায় মোড়া যে দীর্ঘাঙ্গিনী, তার আভরণহীন হাত, কান, গলায়, ছেলেদের মতো ছোট করে ছাঁটা চুলে বৈধব্যের রিক্ততাই। শিবানী, মুখে মুখে যার নাম শিবি—বছর আড়াই বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে। সম্পর্কে উমা ও শৈলর আপন ননদ। বয়েস চব্বিশ পঁচিশ। তার তিনটি সন্তানের দুটি মৃত। একটি জীবিত। অবশিষ্টটি এবাড়ির আশ্রয়ে।

এ নারীর শাদা পোশাক, আভরণহীন শারীরিক বিন্যাস যেন বা কোনো শ্বেত পাথরের শোকস্থাপত্য, যার গায়ে দুই অথবা চার লাইনের এপিটাফ। তার আয়ত গভীর চোখে বেদনার স্থির কাজলে এবং দৃষ্টি নিক্ষেপেও এক সকরুণ শোকযাত্রার স্থির চিত্র।

মাত্র তিন মাস আগে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের নেতা সূর্য সেনের ফাঁসি হয়ে গেছে। অথচ ১৯৩৪-এর এই অক্ষয় তৃতীয়ায় ফরিদপুর জেলার উপোসিতে তেমনই কাস্থন্দির আয়োজন। যেমন প্রতিবছর, এ সময়েই। তিন নারী গামছায় বাঁধা সর্ষে ধুয়ে কলসিতে পুকুর জল ভরে বাড়ির উঠোনে পৌঁছে যায়। সেখানে গোবর মাটি ল্যাপা অনেকখানি জায়গায় ঐ ভিজে গামছাটি পেতে তারা সর্ষে এবং মশলাদের শুইয়ে দেয়। তীব্র রোদ জল টেনে নিতে থাকে। আর ঐ কলসির জল, যাকে আর জল বলা যাবে না, বলতে হবে মধু, ঢেলে দেয়া হয় পরিষ্কার উনোনের আঁচে বসানো মাজা বিশাল পিতলের হাঁড়িতে। তাপে বাষ্প হয় জল অথবা 'মধু'।

হৈমবতী হাঁড়ি থেকে ঘুঁইয়ে ওঠা বাষ্প ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরীক্ষা করেন জল, যাকে আর জল না বলে মধুই বলা হচ্ছে, আঁচে ঠিক তৈরি হচ্ছে কিনা।

তীব্র তাপে সর্ষে শুকিয়ে ওঠে। আগুনের হলকা হাঁড়ির ভেতর জলকে নির্দিষ্ট মাপের জায়গায় পৌঁছে দেয়। ঢেঁকি ঘরে অনেকগুলি পায়ের পারা পড়ে। সর্ষে কোটা হয়ে যায়। তারপর সেই ফুটন্ত জলের ভেতর সর্ষে এবং নুন। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝাঁঝে নাক জলে, চোখও। খেজুর গাছের পাতা ফেলে দেয়া সরু

কাঠটির সাহায্যে স্নান সেরে আসা, পরিষ্কার কাপড় মোড়া হৈমবতী কাসুন্দি নাড়েন, নাড়েন। এবং পাশে কখনও শিবি, কখনও শৈল বা উমা।

হৈমবতীর সংসার এরকম। বিজয়, অন্নদা, অক্ষয়—তাঁর তিন পুত্র—তাদের তিন বৌ সৌদামিনী, উমা, শৈল। বিজয়ের চারটি সন্তান। তিনটি বেঁচে আছে। বড় মেয়ে, তারপরের ছেলেটি নেই। তারপর আবার ছেলে এবং কোলেরটি মেয়ে, তার বয়েস মাত্র মাস আড়াই। সেই আড়াই মাসের নবজাতিকার শরীর কেমন যেন অপুষ্টি-আক্রান্ত, আট মাস গর্ভবাসের পরই তার পৃথিবীর আলো দেখা। এবং সৌদামিনী ঘোর সূতিকায়। সৌদামিনীর বড় মেয়ে উত্তমার বয়েস এগারো।

উমার দুটিই পুত্র সন্তান। এবং শৈল এখনও মা হতে পারে নি, ফলে তার মানসপটে ক্বচিৎ বিষাদ। দেবতার আশীর্বাদী ফুল, মালা, সন্ন্যাসী, ব্রত, উপোস—কিছুই তাকে এখনও সন্তানবতী করতে পারে নি। আর শিবি-র জীবিত সন্তানটি পুত্র। মৃতদের একজন পুত্র, একজন কন্যা।

বেশ কম বয়েসেই বিধবা হয়েছিলেন হৈমবতী। এশিয়াটিক কলেরায় মারা গেছিলেন দুর্গাশঙ্কর। সন্তানরা সকলেই তখন ছোট ছোট। নিজের স্থির বুদ্ধি এবং মানসিক স্থৈর্যে তাঁর সংসার সামলে নেয়া। এবং তখন অবশ্যই পাশে পাশে দুর্গাশঙ্করের আট বছরের বড়দাদা শিবশঙ্কর আর দুর্গাশঙ্করের থেকে তিন বছরের ছোট ভাই কালীশঙ্কর। যৌথ পরিবারে নানান ভালো-মন্দের ভেতর হৈমবতী তাঁর জীবনের এই বিশাল ঝঞ্ঝা-পর্বটুকু একটু একটু করে সামলে নিয়েছিলেন।

রোদ তার আপন নিয়মে ঝলসে দিচ্ছিল চরাচর। উঠোনে সেই গোবর নিকনো জায়গাটিতেই পিতলের হাঁড়ি থেকে মাটির হাঁড়িতে ঢালা কাসুন্দি রাখা হয়েছিল। তার মুখে পরিষ্কার কাপড়ের ঢাকনা। হাতায় হাতায় ঝাঁঝালো সর্ষের জল তুলে তুলে ঢেলে দেয়া হাঁড়ির মুখের ঐ ন্যাকড়ার ওপর। রোদের তাপে তাপে তারা যেন বা বাতাসা। অনেক অনেকটা সময় পরে তাদের চেঁছে চেঁছে তুলে রাখা নতুন মাটির ঘটে। তার মুখে নতুন মাটির খুরি, ঢাকনা হিসেবে। তার ওপর আবার ন্যাকড়ার বাঁধন।

তারপর চালের সঙ্গে টাঙানো ছিকায় তুলে রাখার আগে নতুন দুব্বোর গুছি নিয়ে বলা, দুব্বা দিয়া রাজার মুখ বাঁধলাম, রানীর মুখ বাঁধলাম।

সমস্ত পর্বটিই গ্রথিত অত্যন্ত ধীর লয়ে, দীর্ঘ সময় ধরে। ছিকায় কাসুন্দির ঘট টাঙানো দেখতে দেখতে হৈমবতীর মনে পড়ল আর তিনদিন পরে ঘট নামিয়ে

কাসুন্দির সাধ দিতে হবে এবং সেও অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে, স্নানের পর ধোয়া কাপড়ে। উলু শাঁখ এবং কিছু প্রচলিত উচ্চারণের পর ঘট ফিরে যাবে সেই শূন্যে, ঝুলন্ত অবস্থানে। তারপর রথ কেটে গেলে নিস্তারিনী পুজোর দিন এই ঘট নামবে। তার ভেতর শুকনো শুকনো কাসুন্দি। ভাতের ঘ্রাণ, আস্বাদ সবই পাল্টায় তার সঙ্গ গুণে।

ঘটের অবস্থান দেখতে দেখতে হৈমবতীর মনে পড়ল দুর্গাশঙ্কর বড্ড ভালো-বাসতেন আম-কাসুন্দি। কালো পাথরের চ্যাটালো খাদার বুকে চাক চাক কাটা খোসা ছাড়ানো শাদা কাঁচা আমের টুকরোরা কাসুন্দির সোনালি স্পর্শে অন্য কোন মাত্রা পেয়ে যায়। এবং এভাবেই প্রায় তেঁতুল-কাসুন্দিও।

ছিকার দড়িতে কাসুন্দির ঘট ঝুলিয়ে রাখছিল অক্ষয়। আর হৈমবতী তখন দুর্গাশঙ্করকেই দেখতে পাচ্ছিলেন, এমনকি অক্ষয়ের সিঁথি ও গোঁফের ডিজাইনেও দুর্গাশঙ্করই। চোখের পাতা ভারি হলো হৈমবতীর। রগড়ে ফেললেন। এবং পাতা নিংড়ে জলই, জলের রেখা। একি সর্ষের ঝাঁক, নাকি চালের বাতা থেকে ঝরে পড়া কুটো? নাকি স্মৃতিভার? হৈমবতী কি এখনও দুর্গাশঙ্করের মায়ায়?

হাতের উল্টোপিঠ নয়, আঁচলকেই জল নিরোধী করে তুললেন হৈমবতী। তিনি জানেন মানুষকে একাই বাঁচতে হয় আর যা সামনে আসছে তাকে যতটা পার সহজভাবে মেনে নাও, এ সবই অবশ্য প্রকৃতির পাঠশালায় শিখে নেয়া।

নতুন ঘট ছিকাতে স্থির। অক্ষয় ধীরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। হৈমবতীও। এই মধ্য বৈশাখে তৈরি করা কাসুন্দি রোদে দিতে দিতে গৃহস্থর বর্ষার সঞ্চয় হয়ে উঠবে, অন্যতম ব্যাঞ্জনও। যেমন শীতের শেষে পাকা তেঁতুল বাঁটিতে কুটে বিচি বের করে হাতে হাতে দলা পাকিয়ে, সামান্য সর্ষের তেল মাখিয়ে মাটির হাঁড়িতে হাঁড়িতে রেখে দেয়া। মুখে পরিষ্কার ন্যাকড়ার ঢাকনা। সেই সময়ই গুড়ে ফুটিয়ে তেঁতুলের আচারও। ওপরে ভাজা মশলার গুঁড়ো। আর এই গরমে কাঁচা আম দিয়ে নানাবিধ আচার, গুড় এবং চিনিতে। সবই তো গৃহস্থের সঞ্চয়। এসবই রাখা অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতা আর নিষ্ঠার সঙ্গে। যেন বা গৃহদেবতা, নারায়ণ শিলা বা বাণলিঙ্গ।

যাদের বাড়ি কাসুন্দি হয় না, বিশেষ করে মুসলমানেরা কাল পরশু থেকেই বাড়িতে আসতে আরম্ভ করবে বাটি নিয়ে। ওদেরও কাসুন্দি দিতে হবে—এক হাতা এক হাতা, এমন প্রায় সারা বছরই। এ নিয়ম আবহমানের। যেমন ওরা

বিজয়া দশমীর দিন হৈমবতীকে একটাকা দিয়ে প্রণাম করে জোড়া নারকেল নিয়ে যায়।

এমন নানা ভাবনার সুতো বুনতে বুনতে হৈমবতীর উঠোনে পৌঁছে যাওয়া। তীব্র রোদ কাসুন্দির নতুন হাঁড়ির গায়ে, তারপাশে ছোট্ট একটি ছায়া। বাতাসে মিষ্টি ধুলোর গন্ধ। আর বোধহয় কোনো ফুলের। কি ফুল, কি ফুল! বার বার স্মৃতি ঝাঁকিয়েও হৈমবতী মনে করতে পারলেন না।

২

এই শেষ রাতের অন্ধকারে তলপেটের তীব্র ব্যথায় কুঁকড়ে যেতে যেতে শিবি বুঝতে পারে তার ঋতু শুরু হওয়ার সময় এসেছে। অথচ এই পঁচিশে, এই আভরণহীন বৈধব্য যন্ত্রণায় এ প্রাকৃতিক নিয়মের তো কোনো দরকার নেই। কেবলই জ্বালা শুধু, গভীরে এবং মনে করিয়ে দেয়া এখনও সে-কোনো নারী-ই। উর্বরা নারী-ভূমি।

মেঝেতে লম্বা বিছানায় হৈমবতী শিবি আর অনাথ, বেঁচে থাকা একমাত্র সন্তানটি, যাকে নিয়ে কখনও শিবির ছোট ছোট স্বপ্নের ঢেউ। এই প্রচণ্ড তলপেট মোচড়ানি, আসন্ন ঋতুপর্বের পূর্বাভাস শিবিকে সন্ত্রস্ত করে। তিন দিনের রক্তপাত, শারীরিক অস্বস্তি, শুধুই কাপড় পেতে ভূমিশয্যা, তেল না মাখা সবই তো প্রথানুগ। তারপর কলা গাছের খোসায় তৈরি ক্ষারে মাথা ধুয়ে পূর্ববর্তী স্বাভাবিকে ফিরে এসেও শরীরে কি এক দহন জ্বালা। এ লজ্জার কথা শিবি কাকে বলে!

ঋতুকালে সধবা রমণীও তো কাপড় পেতে একক ভূমি শয্যায়, রুক্ষ স্নান ও কপালে সিঁদুর না নিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করে। তিন রাত্রি স্বামী সঙ্গহীন নারী আবার তো স্বাভাবিকে ফেরে—ক্ষারে মাথা ধুয়ে, কপালে-সিঁথিতে সিঁদুর এঁকে রক্তিম তাম্বুল রেখায় উদ্ভাসিত ঠোঁটে। তখন সে আবার স্বামী সহবাসে নিজেকে ধন্য করে, শরীর-দহন ফেরে শীতল-বিন্দুতে।

আর শিবি এই অন্ধকারে তার নারীত্বের যন্ত্রণা শরীরে নিয়ে ক্রমাগত শারীরিক অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে। মাথার বালিশ চেপে ধরে তলপেটে। কিছু পরে হৈমবতীকে ঠেলে জাগিয়ে তার সমস্যাটি জানাতে চায়। কি ভেবে যেন জাগায় না।

শিবি এই যন্ত্রণার মুহূর্তেও পৌঁছে যেতে পারে ধাউনকায় তার শ্বশুরবাড়ির

চৌহদ্দিতে। যেখানে তার স্বামী বিষ্ণু মারা যায় পান বসন্তে। এখনও যেন শ্বশুরবাড়ির অম্বিকা মন্দির, যেখানে পাথরের অষ্টভুজা দুর্গা—যাঁর পরিচিতি অম্বিকা নামেই, স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে। ঘিয়ের মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রদীপের হলুদ মতন আলোয় দেবীর কষ্টি পাথরের শরীরে অষ্ট ধাতুর ত্রিনয়ন, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ। কল্যাণ-করুণার বদলে দৃষ্টিতে যেন কিছু ভয়ই। আর সেই মন্দির গৃহে কোনো শব্দ ছুঁড়ে দিতে পারলেই প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। তারও কেমন যেন এক আকর্ষণ আর আতঙ্কও। কিছুদূরে বুড়ো শিবের মন্দির। বিশাল, দীর্ঘ শিবলিঙ্গ। মাথায় কোনো ছাদ নেই। এর পেছনেও এক প্রচলিত মিথ। বুড়ো শিব নাকি মাথার ওপরে ছাদ মেনে নেন নি। বহু দিন আগে একবার ঢেকে দেয়ার পর স্বপ্নে দেখা দেয়া সেবায়েতকে। তারপর প্রচলিত ধারা অনুযায়ী দেবতার পদাঘাতেই নাকি মন্দিরের ছাউনি নিশ্চিহ্ন। এখন ছাদ বলতে আকাশ। সেখান থেকে শীতের হিম, বর্ষার বৃষ্টি, অন্য ঋতুর রোদ, নক্ষত্রের আলো, হাওয়া ঝরে পড়ে দেবতার মাথায়। পাশে বিশাল বিশাল বেল গাছ। নাগকেশর ফুল গাছ। অহো, হাওয়ায় তার সুঘ্রাণ মিশে থাকে। বিল্বপত্রে নিয়মিত দেবতার সেবা।

আর গাজনের দিনে বুড়ো শিবের সামনে পাঁঠা বলি। গাজন-সন্ন্যাসীদের বাণ ফোঁড়া, কাঁটা ঝাঁপ। জিভে ফোঁড়া লোহার বাণ খুলেই দিব্যি বুড়ো শিবের প্রসাদী মাংস আর ভাত খেয়ে নেয়া গাজন-সন্ন্যাসীদের। দুর্গা পুজোয় অম্বিকার উৎসব। চারদিন ধরে ভোগ, পাঁঠা বলি। ঢাক-ঢোলের তীব্র বাদ্যি।

রাত নিশুত হয়ে গেলে খড়ম খটখটিয়ে বুড়ো শিব নাকি অভিসারে যান অম্বিকার মন্দিরে। তার আগেই প্রথম প্রহরের শেয়ালেরা ডেকে গেছে। নাগ-কেশর ঝরে যায় ঘাসের ওপর। আর সেই খড়মের শব্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে পৃথিবী।

শিবি কখনও এই পদশব্দ শুনতে পায় নি। বিষ্ণুও না। তার বাবা-মা অথবা তাঁদেরও পিতা-মাতারা কেউ হয়ত এই খড়ম-ধ্বনি শোনাকে নিজেদের অন্তর্গত অভ্যাস করে নিয়েছিলেন। আর সেই থেকেই হয়ত সূত্রপাত এই কাহিনীটির।

যেমন আরও এক কাহিনী—ধাউনকার শ্যামা ঠাইরেনের পুকুরে পুজোর আগে নির্দিষ্ট সময়ে ভেসে উঠত পুজোর বাসন। পুজো শেষে জলে দিলেই

আবার তারা যেত ডুবে। তারপর এক ঝি মাজতে গিয়ে লোভে পড়ল। চুরি করল বাসন। তারপর আর বাসন ভাসে না। দেবী স্বপ্নে এসে জানিয়ে যান এই দোষের বিবরণ। অপরাধিনীর শাস্তি হয়।

দেবতা-দেবী মানেই তো তার সামনে পেছনে কাহিনী, উপকাহিনী। তাঁর মাহাত্ম্য। এই যন্ত্রণায় হৈমবতীকে জাগাবে কি জাগাবে না ভাবতে ভাবতে শিবি তো ধাউনকার সেই বাড়ি, অম্বিকা, বুড়ো শিবের মন্দির, নাগকেশর ফুলের গাছ ছুঁয়ে ফেলে। তার চেতনায় ভেসে আসে অম্বিকা মন্দিরের পাশে বিশাল কালো পাথর দিয়ে বোজানো সুড়ঙ্গ-পথটির ছবি।

কবে—কোন প্রাচীনকালে সেখানে নাকি তৈরি হতো মহামাষ তেল। সুড়ঙ্গপথে বন্দী করে রাখা হতো নারী, আর নপুংসকদের। দীর্ঘদিন খাইয়ে-দাইয়ে ঘিয়ে-দুধে, মাছে-মাংসে তাদের নধরকান্তি করে তোলা। তারপর এক-দিন লকলকে আগুনের কুণ্ডের ওপর মাথা নিচের দিকে করে পা বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া সেই সব স্বাস্থ্যবতী নারী আর মোটাসোটা নপুংসকদের।

আগুনের আঁচে ঝলসে যাওয়া জীবন্ত, নগ্ন শরীর থেকে তেল একটু একটু করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে নিচে রাখা বড় পাত্রের মধ্যে। আধ ঝলসানো শরীরেরা শিউরে শিউরে উঠছে যন্ত্রণায়। শরীর ভাঙা আর্তনাদ আর অস্পষ্ট গোঙানি শোনার কেউ নেই। মাটির নিচে এই সুড়ঙ্গ পথ পেরিয়ে আসা গুহা ঘরে শুধু ভিষকেরা। যারা মহামাষ তেলে বানাবে মহার্ঘ কবিরাজি ওষুধ, শুধুই ধনীদের ব্যবহারের জন্যে।

ইংরেজ আসার পর পরই নাকি পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় এই নারীমেধ-এর জায়গাটি। তারপর থেকেই অম্বিকার মন্দিরের পাশে এই বিশাল কালো পাথরটি অনেক দীর্ঘশ্বাসের চিহ্ন হয়ে স্থির।

নারীত্বের এই কষ্টে ঐ নিকষ কৃষ্ণবর্ণ পাথরটিকেও বড় বেশি মনে আসে শিবি-র। যার আড়ালে হা-হা সুড়ঙ্গ, অনেক নারী এবং নপুংসক হত্যার স্মৃতি নিয়ে। বুঝিবা পাথরেই নিজের প্রতিমা আবিষ্কার করে।

এই কষ্টের গভীরে, ফলহীন প্রাক-ঋতু মুহূর্তে বিষ্ণুচরণের আশ্লেষ, তিন-তিনটি সন্তান, তাদের প্রথম দুজনের মৃত্যু, আর বিষ্ণুর মৃত্যুর পর তিন সাড়ে তিনের অনাথকে নিয়ে এক রকম চাপে পড়েই তার চলে আসা— সবই মনে পড়ে যায় শিবি-র। হৈমবতী চান নি তাঁর একটি মাত্র কন্যা অবস্থাপন্ন শ্বশুরবাড়িতে দেওর-

ভাসুরদের গলগ্রহ, কিংবা পেটভাতার ঝি হিসেবে থাকুক। বিষ্ণুর মা-বাবার সাত মাসের ব্যবধানে মারা যান বিষ্ণুর মৃত্যুর বছর দুই আগে। আর বিষ্ণুর মৃত্যুর ঢেউতেই তো শিবি-র আছড়ে পড়া তার শৈশবের উপোসিতে।

আকাশের রঙ কি ফিকে হয়ে এল? কোথাও কি ডেকে উঠছে পাখি? তল-পেট কামড়াতে কামড়াতে নেমে আসা অস্বস্তি সামলাতে শিবি বিছানা ছাড়ল। তারপর হৈমবতীকে না ডেকেই বাইরে যাওয়ার জন্যে দরজার খিলে তার হাত ছোঁয়ানো।

৩

দোলে রে দোলে
কাঁঠাল খাইয়া ফোলে
দোলেরে মাল
চন্দনী কপাল
দুদু ভাতু খাইয়া মালোর
ভুতু ভুতু গাল

বাবু হয়ে বসা উত্তমা কোলে কাঁথার ওপরে শোয়ানো মাস তিনেকের বোনকে হাঁটু ঝাঁকিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছিল। ধীর, আরামদায়ক দুলুনি, ঘুম পাড়ানিয়া গানের সুর, কিছুই কচি প্রাণটিকে ভোলাতে পারে না। তার বুক জুড়ে স্তন-তৃষ্ণা। আর তারই চিহ্ন উৎসারিত প্রবল কান্নায়, চিল চ্যাঁচানিতে। ঝিনুক বাটি দিয়ে সামান্য সামান্য দুধ তার কান্নার ফাঁকে ফাঁকে একটু আগে গলা দিয়ে নামিয়ে দেয়া হলেও, এখন তার তৃষ্ণা মাতৃস্তনেরই।

সৌদামিনী গত রাত থেকেই আরও অসুস্থতায়। সূতিকা, রক্তশূন্যতা, সেই সঙ্গে কোনো সংক্রামক জ্বর তাকে বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে রাখে। রক্তহীন, হাত-পা-মুখ ফোলা সৌদামিনী জ্বরের ঘোরে বাচ্চাকে খোঁজে, আর বাচ্চা মায়ের স্তন।

স্থানীয় কবিরাজ এবং হোমিওপ্যাথ তাঁদের চিকিৎসা-জ্ঞানের শেষ ব্রহ্মাস্ত্রটুকু সৌদামিনীর প্রাণ রক্ষার জন্যে নিক্ষেপ করে আক্ষেপের সঙ্গে ঘাড় নাড়তে নাড়তে চলে যান।

অবশেষে জেলা শহর থেকে একজন এল এম এফও। যিনি শোলার হাট,

হাফ প্যান্ট, আলপাকার কোট ও কেড্‌স পরে আসেন। চোখে রুপোর গোল গোল শাদা ফ্রেমের প্যাঁশো। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামছে।

নিজস্ব পালকি তাঁকে বয়ে নিয়ে আসে, নিয়ে যায়। সৌদামিনীর ঘরে ঢুকেই তিনি সব জানলা দরজা খুলে দেন। কঙ্কালসার কাঠামোর নাড়ি দেখেন, কোটের ঘড়ি-পকেট থেকে গোল ঘড়ি বের করে কি যেন মেলান। বুকে পিঠে স্টেথো বসিয়ে টিপে টিপে শব্দ শোনেন। তারপর খস খস করে প্রেসক্রিপশন লিখে ঘাড় নাড়েন, ঘাড় নাড়েন। আর তা আশাহীনতাকেই ফুটিয়ে তোলে।

আর তখনই বাইরের উঠোনে রোদ খাওয়া নতুন কাস্থন্দির হাঁড়ির সামনে কোত্থেকে যেন উড়ে আসে কালো দাঁড়কাক। ডানা ঝাপটে ঝাপটে তাকে হাঁড়ির দিকে এগোতে দেখেই হুস হুস করে তাড়ায় উঠোনে দাঁড়ানো অনাথ আর অন্য বাচ্চারাও।

কাক সরে না। উড়ে বসতে চায় হাঁড়ির ওপর, বিশ্রি ডাক ডেকে ওঠে। আর কি ভেবে, কাক তাড়াতেই যেন একটি বড় ঢিল কুড়িয়ে ছোঁড়ে অনাথ। কাক ওড়ে, হাঁড়ি ভাঙে।

শহর থেকে আসা ডাক্তারকে বিদায় জানাতে উঠোনে আসা অনেকেই দেখতে পায় ভাঙা হাঁড়ির গা দিয়ে গড়িয়ে পড়া সোনালি কাস্থন্দি শুকনো ধুলোটে মাটির বুকে একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে।

স্থান-কাল-পাত্র ভুলে—কোন হারামজাদার কাম—বলেই হৈমবতীর ডুকরে ওঠা। কারণ তিনি তো তাঁর সংস্কারে অভ্যস্ত হয়ে আছেন—কাস্থন্দির হাঁড়ি ভাঙা মানেই এক গভীর অমঙ্গল, এমন কি মৃত্যুও। আর ঘরে অসুস্থ বড় বৌকে জবাব দিয়ে যাওয়া ইংরেজি ওষুধের ডাক্তার তো হৈমবতী ও তাঁর পরিবারের সকলকেই এক গাঢ় অমঙ্গলের জন্যে প্রস্তুত করে। আর তখনই কাস্থন্দির হাঁড়ি ভেঙে ফেলার বিষয়টি অকল্যাণের মূল আবহ হিসেবেই বেজে ওঠে।

ভয়ার্ত অনাথ কোথায় লুকোবে, ভাবতে পারে না। তার জন্যে প্রবল মার, না খেতে দেয়া বা যে কোনো শাস্তিই অপেক্ষা করতে থাকে। সকলেই সর্বনাশের দূত হিসেবে অনাথকে চিহ্নিত করে। আর সবে ঋতুস্নান সারা শিবি-র স্মৃতিতে তখনই ভেসে ওঠে অনাথের ছ মাস হওয়ার পর, মানতের চুল দেয়ার জন্যে নৌকো করে মাওইসার দিগম্বরী তলায় যাওয়া। সঙ্গে বাজনা বাদ্যি, ঢাক-ঢোল, আস্ত এক জোড়া বলির পাঁঠা, ঘন কৃষ্ণবর্ণ, পুজোর অন্যান্য সামগ্রী। বিষ্ণু ছিলেন, আর

ছিল ওঁর ছোট ভাই সুধা। বাড়িরই বলির খড়্গে দুটি পাঁঠার মস্তক ছেদন। এবং রক্তাক্ত বলির মুণ্ড গড়িয়ে দেয়া সেই বিশাল বট বৃক্ষের কোটরে, প্রচলিত নিয়ম এমনই। কোনো দেবী মূর্তি নয়, এক প্রাচীন বটই সেখানে দেবতার প্রতিমা।

সুধাই বলি দিয়েছিল। আর তার এ অভ্যাস মজ্জাগত। অম্বিকার সামনেও বহুবার ঘাতকের ভূমিকায়। ঝলসে ওঠা খড়্গে ছিটকে যায় ছাগমুণ্ড।

দিগম্বরী তলায় অনাথের মাথা কামিয়ে, পুজো শেষে আবারও নৌকোয় ফেরা। ফুটফুটে অনাথের মুখে হাসি আর হাসি। তখন তো তার নাম অনাথ বন্ধু, তার বাবা বেঁচে আছে, তাদের বাড়ির অবস্থা ভালো। আর এখন, এই যৌথ পরিবারে পরগাছা হিসেবে না হলেও শিকড়হীন অনাথ তার নামের বন্ধু শব্দটিকে কবেই না থুইয়ে ফেলেছে মুখে মুখে। এই প্রায় শেষ হয়ে আসা বৈশাখে কাস্থন্দির হাঁড়ি ভেঙে নিশ্চিত অমঙ্গলের বোধন তো তারই হাতে। অনাথ তাই লুকিয়ে পড়ার প্রয়াসে। যেন বা ভীত, তাড়া খাওয়া জানোয়ার। সর্ব সমক্ষে এতখানি আত্ম-খননের পর শিবি তো উচ্চারণই করে চাপা স্বরে, যেন বা অনাথকে বাঁচাতেই এবং কিছুটা আপন আত্মগ্লানি মোচনে,—হারামজাদারে একবার পাইলে হয়।

সৌদামিনীর কোলেরটি উত্তমার কোলে আবারও স্তনের নেশায় ডুকরে ওঠে। বিছানার পাশে অভ্যাসমতো শিশুশরীর না পেয়ে প্রবল জ্বরবিকারের ঘোরে এদিক-ওদিক হাতড়ে ফেরে সৌদামিনী—এলোমেলো কাঁপা হাতে। তারপর একসময় তার দু চোখের ঘূর্ণমান তারারা শিবনেত্র হতে হতে টিনের চালে শাল খুঁটির ফ্রেমে কোনো নাট বল্টুর পাশে আটকে যায়। স্থির। একটা গভীর শ্বাসের তরঙ্গ নাভি থেকে উঠে আসতে আসতে গলার কাছে হিক্কা হয়ে আটকায়। তারপর তো সৌদামিনীর সমস্ত পৃথিবীই অন্ধকার।

পালকি চড়া ইংরেজি ওষুধ লেখা ডাক্তার তখন এবাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে। পাখিদের ঘরে ফেরা ডানার ঝাপটানিতে বেলা শেষের গান। শেষ সূর্যের আলোয় এই ঘরে উপস্থিত হৈমবতী, উমা, শৈল এবং ঋতু-স্নানান্তের শিবি একটি স্থির মৃত্যুকে দেখছে। কেমন একটু বেঁকে যাওয়া হাত-পা। দু চোখে মৃত্যুর হিম-নীল। দূরে—কোন গৃহস্থ ঘরে যেন শাঁখ বাজল। একটি, দুটি তারা ফুটে উঠল আকাশে, তাদের ম্লান আলোয় যেন বা কান্না, কান্নাই শুধু। তখনই হৈমবতীর ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়া শৈল উমা ও শিবি-র। সধবা

সৌদামিনীর মতো শাঁখা, আলতা, সিঁদুর নিয়ে যেতে পারবে না, এমন দুঃখ শিবিকে আর সন্তানবতী হয়ে এভাবে যাওয়া হবে না—এ বেদনা শৈলকে বিদ্ধ করে। এই কান্নার ভিড়ে পাশের গোয়ালে লুকিয়ে থাকা অনাথও ফিরে আসে। তার পেটে খিদে, তাছাড়া অন্ধকারে তো শুধু ভয়, আর ভয়ই।

বাচ্চারা সকলেই সমবেত কান্নায়। আর উত্তমা কচি বোন সামলাতে কিছু বিহ্বল। তার কোল থেকে বোনকে নিজের কোলে এনে উমার ডুকরে ওঠা—উত্তমিরে, আমার সোনাডারে। আর তখনই উত্তমার চোখেও কান্নার সংক্রমণ। মা নেই— এমন অনুভব তলিয়ে বোঝার মতো বয়েস তার নয়। তবু কি এক সর্বনাশ, কি এক হাহাকার যেন তার জন্যেই— এরকম ভাবতে ভাবতেই আবারও ফুঁপিয়ে ওঠা উত্তমার।

৪

শিবি-র চুল লম্বা লোহার কাঁচি দিয়ে মুড়িয়ে কেটে দিচ্ছিলেন হৈমবতী। তার আগে নিজের চুল কেটেছেন। একেবারে আধুনিক বয়েজ কাট। কাল একাদশী ছিল। নির্জলা!

আর শিবি তো তার প্রাত্যহিক নিয়মে পেতলের বোখনায় সেদ্ধ করা আতপ চালের ভাতে একবেলা আহারে, মুসুর ডাল, পুঁই শাক, কলমি শাক, চিচিঙ্গা, না খেয়ে, লোহার কোনো রকম বাসন ব্যবহার না করে চালিয়ে যাচ্ছিল। নিত্য মাটির শিব গড়িয়ে, তার মাথায় ফুল-বেলপাতা, দূর কলকাতা থেকে বয়ে আনা গঙ্গাজল আর মন্ত্র সঁপে দিতে দিতে শিবি কি নিজের বৈধব্যের যন্ত্রণা ভুলে যেতে পেরেছিল? নাকি এ তার দৈনিক আত্মপ্রবঞ্চনা? দেবতা রূপী কোনো পুরুষ-প্রতীকের কাছে নিজেকে নিঃশর্ত সমর্পণ? ৭ আষাঢ়ের তিন দিনের অম্বুবাচি —মা মেয়ে দুজনেরই ফল খেয়ে থাকা শুধু আর আতপচাল বাটা। আগুনে জ্বাল দেয়া কোনো জিনিসই তাদের খাদ্য তালিকায় থাকে না এই তিন দিনে, তিন রাতে। এমন বহু সংস্কারই তো ধারাবাহিক। আর এ সংসারে মা-মেয়ে এক সঙ্গেই তার প্রতিপালক। অনুসরণকারিণী। ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেতেই হোক। ভয়ে হোক আর ভক্তিতেই হোক।

শিবি-র ঘন চুল কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে দিতে হৈমবতী তার মাথার প্রায়

শাঁস বের করে ফেলছিলেন। এই বিষণ্ণ মধ্যাহ্নে কাঁচি চালানোর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই ছিল না।

সৌদামিনীর মৃত্যু প্রায় এক মাস হতে চলল। পৃথিবী আপন নিয়মেই— বহমান। নিজেরই মেয়ের চুলে কাঁচি ডুবিয়ে ডুবিয়ে হৈমবতী তার বিধবা-চেহারাটি পাকা করে তুলছিলেন।

জৈষ্ঠের দুপুরে ভারি গলায় কাক ডাকছিল—খা-খা-খা। কাঁচির মুখ দিয়ে একটা দুটো উজিয়ে থাকা চুল ছেঁটে দিতে দিতে হৈমবতী জানালেন উত্তমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর বাবারও। কালাশৌচের এক বছর কেটে গেলেই—।

রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে আবার কাকের ডাক—খা-খা-খা।

মায়ের কথা, কাকের ডাক শুনতে শুনতে আমূল কেঁপে কেঁপে ওঠা শিবি-র। আবার সূতিকা, আবারও বৈধব্য কিংবা মৃত্যু। এমনই তো আবহমানের ছবি। হয় সৌদমিনী নয় শিবি, কখনও বা শৈলও।

হৈমবতীর হাতের কাঁচি বড় যত্নে শিবি-র মাথার বেমানান, উঁচু হয়ে থাকা চুল খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

তিনকড়ির মা ও বোন

দিব্যেন্দু পালিত

মালপত্তর রেডি করে তিনকড়ি গিয়েছিল লরি ডাকতে। আধঘণ্টা হয়ে গেছে, এতোক্ষণে তার ফিরে আসা উচিত।

মোড় ছাড়িয়ে ডানদিকে কয়েক পা এগোলেই বকেয়া রাস্তার ওপর কাঠের গোলা, সারাক্ষণ করাতকলে কাঠ চেরার শব্দ। তার পাশেই ভুজাঅলার দোকান পেরোলে নন্দীবাবুর আড্ডা। এখান থেকে যেতে আসতে বড়োজোর মিনিট পনেরো। আগে থেকে বলা আছে, ঘণ্টা খানেকের জন্যে ড্রাইভার-সমেত লরি যার দেবে নন্দীবাবু। কর্তা বেঁচে থাকতে চিঠিপত্র বুঝতে, মুসাবিদা করিয়ে নিতে প্রায়ই আসতো এখানে। কৃতজ্ঞতা ভোলে নি। তিনুকে বলেছিল লরি রেডিই থাকবে।

তাহলে এতো দেরি করছে কেন!

ছাদ থেকে নেমে এলো তৃপ্তিবালা। লরি এলে ঝটপট তুলে দেবে ভেবে জিনিসপত্র দরজার গোড়া পর্যন্ত টেনে রেখেছিল তিনকড়ি। মা ছাদে, তিনু গেছে লরি ডাকতে। মাল পাহারা দেবার জন্যে সুধা ছাড়া আর কে থাকবে!

'তিনু আসে নি?' কড়া চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তিবালা বলল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কোথায় সে?'

'দেখছই তো আসেনি। শুধু শুধু আমাকে হাটের মাঝে দাঁড় করিয়ে রাখা!'

'তুই আমাকে হাট-বাজার শেখাবি নাকি?'

তৃপ্তিবালার চোখ রাস্তায়। লাইটপোস্টের বাঁ হাতে রমেশের পানের দোকান; লোকটা ঠায় তাকিয়ে আছে এদিকে। দৃষ্টিটা খেকো। বুকের কাপড় সামলে মেয়ের দিকে তাকাল তৃপ্তিবালা। রাস্তার দিকে পিছন ফিরে পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষে মেঝেয় আঁকিবুঁকি কাটছে সুধা। লোকটার তাকানোর দুটো কারণ থাকতে পারে, ভাবল তৃপ্তিবালা। এক, সুধা। দুই, তাহলে সত্যি-সত্যিই এরা পাড়া ছেড়ে চলল!

সমস্যা দ্বিতীয়টি নিয়ে। খুব তাড়া না করলেও লোক জানাজানির ভয়ে গত-কাল থেকেই গোছগাছ শুরু করেছিল সে। সম্ভব হলে রাত্রেই চলে যেত। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। নন্দীবাবুর লরি আসবে ধানবাদ থেকে, পৌঁছুতে পৌঁছুতে মাঝরাত পেরিয়ে যাবে। তখন যাওয়া যায় না।

ঘড়ি দেখার জন্যে অগত্যা রমেশের দোকানেই তাকাতে হলো। তিনু গেছে ঠিক ন'টায়। তার মানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেল। এতো দেরি করার কী মানে হয়!

তৃপ্তিবালার অপমানবোধ প্রখর। তিনুর বাবা ছিল সংস্কৃতের মাস্টার। দু' বেলা গীতা পড়ত, ইংরিজিও জানতো। কম করেও কুড়ি বছর ঘর করেছে লোকটার সঙ্গে। এসব ভাবলে দুঃখে হাঁইফাঁই করে বুক। ওই লোকটা বেঁচে থাকলে কি বারো বছরের পুরানো পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হতো এইভাবে!

মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে ভারী ট্রাঙ্কটা আবার ঘরের ভিতরে টানবার জন্যে ঝুঁকে দাঁড়ালো তৃপ্তিবালা।

'আবার টানাটানি করছ কেন!'

'না, টানবে না!' মুখ ঝামটা দিয়ে বলল তৃপ্তিবালা, 'আমি আড়ালে যাই আর তুমি মনের সুখে হাট-বাজার করো।'

'সকাল থেকে মুখ খারাপ কোরো না বলছি!'

সুধার গলার স্বর চড়তে উল্টোদিক থেকে রমেশ হাসল। খদ্দের এসেছে। এখন তারিয়ে তারিয়ে ঘটনাটা বলবে। মোটামুটি সব ব্যাপারই ও জানে।

ট্রাঙ্কটা এতোক্ষণে টেনে এনেছে ভিতরে। তৃপ্তিবালা ভাবল আরও একটু টানে দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে।

অনটনের মধ্যে থেকে গত দু'বছরে নানারকম শারীরিক উপসর্গ দেখা দিয়েছে তৃপ্তিবালার। তার একটি মোটা হওয়া। এখন অল্পেই হাঁপায়। একটু পরিশ্রম করলেই মনে হয় পেটের খোল বুকের দপদপানি এক হয়ে উঠে আসছে গলায়! শ্বাসকষ্টে হিমসিম হতে হয়। আপাতত দরজাটা কোনোরকমে ভেজিয়ে ট্রাঙ্কের ওপরেই বসে পড়ল।

'শুধু শুধু আমাকে গাল দেওয়া। তিনু দেরি করছে আমি তার কী করব।'

'থাম!' গলার মধ্যেই একটা ঢেঁকুর চাপা দিল তৃপ্তিবালা, 'এখন আর চেঁচিয়ে নাটক করতে হবে না।'

'আমি নাটক করছি!' তিরিক্ষি হয়ে সুধা বলল, 'তুমি মরতে ছাদে গিয়েছিলে কেন? এখানে এসে ছেলের জন্যে দরজায় ধর্ণা দিলেই তো পারতে! যতো দোষ আমার!'

একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল তৃপ্তিবালা। হঠাৎ মনে পড়ল ছাদ থেকে নেমেছিল আবার ছাদে ফিরে যাবার জন্যে। তিনুর ফিরে আসার ব্যাপারে যতোটা না, তার চেয়ে বেশি সুধা ঠিক আছে কিনা দেখা। যতো দেরিই করুক, তৃপ্তিবালা জানে তিনু ফিরবেই। পালাবার হলে কবে চলে যেত। ওর ধরনটাই আলাদা। মাঝখান থেকে সুধার সঙ্গে ঝগড়া করে মেজাজ নষ্ট হলো, সময়ও গেল।

সুধার নজর তখনো তার ওপর। আড়ে মেয়েকে দেখতে দেখতে তৃপ্তিবালা ভাবল, আবার ছাদে যাবে, নাকি এখানে বসেই অপেক্ষা করবে তিনুর জন্যে? ছাদ থেকে যেটুকু দেখেছে তাতে ওরা বাড়ি আছে বলে মনে হয় না। আজ ছুটির দিন, কর্তাকে নিয়ে বোসগিন্নী সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া, বাড়ি যে ওরা আজই ছেড়ে দিচ্ছে সে-কথা তো কালই শুনেছে। আজ নিশ্চয়ই পুজো দেবে!

উঠে জল খেতে গেল তৃপ্তিবালা। অপমান বোধটা এই সময় শরীর বেয়ে তিরতির করে মাথায় ওঠে। জল খেয়ে কলসি থেকে আরও খানিকটা জল হাতের তেলোয় নিয়ে মাথায় চাপড়ালো সে।

'কী হলো!' মাকে অসহায়ভাবে ফিরে আসতে দেখে সুধা বলল, 'হঠাৎ ঝিম্ মেরে গেলে যে!'

'এমনি। তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?'

'ইস্, এমনি,! তোমার মুরোদ ঢের জানি। কিছু বলতে পারো নি তাই বলো না!'

তৃপ্তিবালার মুখে কথা জোগালো না। ভারী চোখ তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘরের জিনিসপত্রের ওপর রাখল। যা আছে তাতে লরির একটা ট্রিপই ঢের। তিনুটা সময়মতো ফিরলে এতোক্ষণে সব লরিতে উঠে যেত। সে আর সুধা যাবে রিক্সায়। তিনু ড্রাইভারের পাশে বসে, লরিতে।

মনে মনে হিসেব করে দেখল পুরানো তক্তপোষটা ছাড়া আর কিছুই ফেলে যেতে হচ্ছে না। সেজন্যে মায়া নেই। একটা পায়া ঘুণ ধরে ভেঙে যাবার পর

ছ'খানা থান ইট বসিয়ে কাজ চলত কোনোরকমে। তিনু বলেছিল ওভারটাইমের টাকাটা পেলে নতুন একটা কিনে নেওয়া যাবে। যে-পাড়ায় যাচ্ছে তার কাছাকাছি রথের মেলা বসে।

আক্ষেপ ফেলে যাবার জন্যে নয়। ভেবেছিল ওটাকেই তুরুপের তাস করে দু'কথা শুনিয়ে দেবে বোসগিন্নীকে—খাটটা রেখে গেলুম, ঝরে গেলে যেন চিতেয় তুলে দেয়। শুনে দাপাতো, হাত-পা কামড়ে মরত অপমানে। তৃপ্তিবালাকে তো আর পাচ্ছে না!

সুযোগ ফসকে গেল। মনে হচ্ছে মতলব টের পেয়ে আগেভাগেই সরে পড়েছে। আবার ছাদে ওঠার কথা ভাবতে পারল না তৃপ্তিবালা।

'ছেলেটা গেল কোথায় বল তো?'

'আমি কি জানি! তোমার অপমান করা শুনতে বসে থাকবে নাকি!'

'ফের চোপা করছিস!'

তৃপ্তিবালার যতো রাগ সব মেয়ের ওপর গিয়ে পড়ে। অসুবিধে যেন তার একার; কিংবা, তার আর তিনুর! বিদ্গির দায় নেই কোনো!

'যতো নষ্টের গোড়া তুই! তোর জন্যেই বারো বছরের পুরনো বাড়ি ছাড়তে হলো!'

'চার বছর ভাড়া দিতে পারো নি, কেসে হেরে গেছ, এসব বলো না কেন মুখ ফুটে!' বেগতিক দেখে জানলার একটা কপাট বন্ধ করে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল সুধা।

'ভাড়া তো কতো লোকে দেয় না। সবাই কি বাড়ি ছাড়ে না কেস করে উঠিয়ে দেয়!'

তৃপ্তিবালার গলা কাঁপলো, তবু বলল। এটা তার দুর্বলতার জায়গা। সুধা অমন সরাসরি আক্রমণ করবে ভাবে নি। খানিক দম নিয়ে বলল, 'এমনই কপাল, বোসগিন্নীর পায়ে ধরে যে আরও দু দশদিন থাকবো, সে উপায়ও নেই। কী দরকার ছিল ছোঁড়াটার সঙ্গে অতো মাখামাখি করার! ছেলে নিয়ে টি-টি না পড়লে বোসগিন্নী তাড়া করত না কি!'

'এখন আমার দোষ!' সুধা ভাঙলো না। আঁচলটা বুকের ওপর ভালোভাবে ঢেকে, একটু বা ভাঙা গলায় বলল, 'তুমি বলোনি বিশুদাকে জপাতে!'

'বলেছিলি বিয়ে করবে—'

'না করলে কী করব ! এখনো বলছে—'

'হাঁ ! বলছে !' বুকে হাঁপ ধরায় দু হাতে বুক চেপে খুক খুক করে কাশলো তৃপ্তিবালা। কাশি থামতে বলল, 'বয়সের ছোকরাকে বাগে আনতে দু বছর লাগে নাকি ! মাখামাখি তো কম হলো না ! এখন কী হবে ! বোসগিন্নী, তো তুলে দিয়েই খালাস। তুমি সারা জীবন আমার গলায় ঝুলে থাকো !'

'আর থাকবো না। একদিন দেখবে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছি।'

রাগ, না অভিমান, মেয়ের খবর শুনে কিছুই বুঝল না তৃপ্তিবালা। সুধা বসে পড়েছে মেঝেয়। হাঁটুতে মাথা গুঁজে নিজেকে গুটিয়ে নিল হঠাৎ। সম্ভবত এখন ও কাঁদবে। এখন ওর সামনে থাকা ঠিক হবে না। তিনু এলে আবার যেমন তেমন করে সামলে নেবে।

তিনু এখনো ফিরছে না কেন। যেতে আসতে মিনিট পনেরো। তাহলে এতো দেরি কেন !

সময় দেখার জন্যে দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়ালো তৃপ্তিবালা। দাঁড়িয়ে উঠে তাক থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল পাড়ছে রমেশ। আড়াল পড়ায় ঘড়ির কাঁটা দেখা যায় না। ছুটির রাস্তা মোড় পর্যন্ত পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই হারিয়ে গেছে আড়ালে। তিনুকে দেখতে পেল না।

'বাপ-মা না হয় পাজি। বিশু একবার খোঁজ নিলে পারতো তো !'

দরজা বন্ধ করার শব্দে উঠে দাঁড়িয়েছিল সুধা। আঁচলে চাপ দিয়ে মুখ মুছে নিল।

'কেন নেবে ! তোমার খায় নাকি !'

'খাওয়ার কথা নয়।' যতোটা সম্ভব মোলায়েম করে তৃপ্তিবালা বলল, 'ওকে কোনোদিন হেনস্থা করেছি ! বিয়ে করবে শুনে একদিন হাত পুড়িয়ে খাইয়েছিলাম, মনে আছে তোর ?'

'এখনো তার ঢেকুর উঠছে ! তোমার বাড়া ভাত হজম হবে না।' বলতে বলতে বাথরুমে গেল সুধা।

তৃপ্তিবালা বুঝল সুধার রাগ পড়ে গেছে। এখন আস্তে আস্তে সুতো গুটোনো দরকার। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার দেমাক যতোটা বেড়েছে মগজ ততোটা পাকে নি। বারো বছর আগে এ বাড়িতে আসার সময় সুধার বয়স ছিল

এগারো। ফ্রকের নিচে ইজের পরত। তখনই বাড়ন্ত চেহারা। আরও বছর তিনেক পরে বিশু চাকরিতে ঢুকলে মেয়েকে শাড়ি ধরালো তৃপ্তিবালা।

অতীত ভাবলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়। ওসব ভেবে দিন চলে না। সুধাকে ফিরতে দেখে নিজেকে সামলে নিল তৃপ্তিবালা।

'যা না, একবারটি ঘুরে আয়—'

গলায় নিঃশ্বাস আটকে কথা বললে অনুনয় ফোটে। তৃপ্তিবালা তাই করল।

সুধা বলল, 'কেন ? তাড়িয়ে তো দিয়েইছে—'

'ওর সঙ্গে কী ! তাড়িয়েছে বোসগিন্নী। এতো কাল মেলামেশা করলি—এখন গেলে কে আর দেখছে !'

'তিনু এসে পড়বে—'

'আমি দেখছি।' দরজাটা হাট করে সামনে দাঁড়াল তৃপ্তিবালা, 'পারলে বিশ পঁচিশ টাকা চেয়ে নিস। যা দেয়। কবে তিনু টাকা পাবে সে-ভরসায় আমাদের চলে না কি ! দু'বছর ধরে এপ্রেনটিসই থেকে গেল !'

সুধা বেরিয়ে যেতে পাঁজরে হাওয়া খেলল তৃপ্তিবালার। ফাঁকা বাড়ি তো কি, বয়স হয়েছে, এখন ও নিজের দায়িত্ব নিতে পারবে। মুখ দেখেই বুঝত আগেও শুয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা রাখা ঢাকা চেনে। বিশুও কম সেয়ানা নাকি ! তা ছাড়া আজই তো শেষ ! কাল থেকে আর চট করে পাচ্ছে না বিশুকে। আ-হা, যদি সত্যি-সত্যিই মেয়েটা ফেঁসে যেত এতো দিনে, তাহলে চাপ দিয়েই কাত করতে পারতো বোসগিন্নীকে। সংসারে যার যার নিজেরটা বুঝে নিতে হয়। এসব ভাবতে ভাবতে রাস্তা মুখো হয়ে দাঁড়াল তৃপ্তিবালা।

ইতিমধ্যে তিনকড়ি যদি এসে পড়ে, সুধা ভাবল, তাহলে কেলেঙ্কারীর এক শেষ হবে। যা গোঁয়ার ! রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ভাবতে ভাবতে বিশুর দোতলার দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল ও।

'আমরা চলে যাচ্ছি।' আশপাশ দেখে নিয়ে বলল, 'মাসীমারা কোথায়' ?

'দক্ষিণেশ্বরে গেল, পুজো দিতে।'

'চলে যাচ্ছি বলে !'

'তা কেন ! প্রায়ই তো যায়—'

রেজরে ব্লেড ভরছিল বিশু। রেখে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। দুটো হাত তুলে দিল সুধার কাঁধে।

'গোটা পঞ্চাশেক টাকা দেবে ?' নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সুধা বলল, 'দাও না আর তো আসছি না—'

'দেবো না বলেছি ?'

বিশু ওর হাত ধরে বিছানায় বসিয়ে জানলা বন্ধ করতে গেল। তৃপ্তিবালাকে বিশ্বাস নেই, যখন তখন ছাদে ওঠে। ফিরে এসে ব্লাউজের প্রথম বোতামটা চট-পটে হাতে খুলে দ্বিতীয় বোতামে হাত দেবে, সুধা ওর হাত চেপে ধরল।

'টাকা চাইতে লজ্জা লাগে—'

'আমার কাছেও ?'

মুখের ওপর বিশুর ক্ষ্যাপা নিঃশ্বাস আছড়ে পড়তে শরীর চিনলো সুধা। চোখ বন্ধ করে ভাবল, তিনুর চোখ নেই। থাকলে ও মানুষ খুন করত। ছোট-বেলা থেকেই ওর কান বড়ো, চোখের কোণ লাল। বাবা বলত, ছেলেটা সৎ হবে।

'এসব তো করছ! বিয়ের কী হবে ?'

'বলেছি তো করব। দরকার হলে আলাদা থাকবো।'

'ছাই! ও-কথা অনেকবার শুনেছি।'

জবাব না দিয়ে আরও বেশি সতর্কতার জন্যে দরজায় খিল দিতে গেল বিশু।

অন্ধকার ঘরে হাই তুললো সুধা। একে কি ঝুলে থাকা বলে ? শরীরের চাপে নিঃশ্বাস তপ্ত হবার মুখে অন্যমনস্কতার ভিতর ও ভাবল, আজ পর্যন্ত বিশ্বনাথের কাছে যা নিয়েছে সেই টাকায় বাড়ি-ভাড়া গুনে দিলে পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হতো না।

তৃপ্তিবালার চোখের সামনে রাস্তাটা দীর্ঘতর হলো ক্রমশ। ওই রাস্তা পেরিয়ে তিনু আসবে। তবু, এতো দেরি করার কোনো মানে হয় না। প্রকৃত উদ্বেগ বোধ করার আগে ও ভাবল, অন্তত সুধা ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনুর জন্যে চিন্তিত হবার কারণ নেই।

এই সময় সুধাকে দ্রুতগতি ঘরে ঢুকতে দেখে স্বগতোক্তির গলায় তৃপ্তিবালা উচ্চারণ করল, 'দিয়েছে ?'

সুধা হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, 'এভাবে পারবো না।'

মেয়েকে দেখতে দেখতেই পিছন ফিরে দরজাটা বন্ধ করে দিল তৃপ্তিবালা।

'দিয়েছে কি না বল আগে!'

ট্রাঙ্কের ওপর বসে দেয়ালে পিঠ দিল সুধা। পা দুটো ছড়িয়ে দিল সামনে। জিব বুলিয়ে ঠোঁট চাটলো।

'আজ পর্যন্ত কতো টাকা নিয়েছ বলো। সব বলে দেব তিনুকে—'

এগিয়ে এসে মেয়ের ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিল তৃপ্তিবালা।

'টাকাটা কোথায় ?'

'আমি দেবো না। ও আমার টাকা।'

সুধার হাত ওর গলার ওপর চেপে বসতে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে ঝটকা দিল তৃপ্তিবালা। মেঝেয় পড়ে লাথি ছোঁড়বার চেষ্টা করল সুধা। সরে গিয়ে মেয়ের হাত মুচড়ে ধরল তৃপ্তিবালা। সুধা পাশ ফিরতে বুকের ভাঁজ থেকে একটা বড়ো নোট উঁকি দিল পরিষ্কার। একশো টাকা নাকি!

'দিয়ে দে। না হলে মেরে ফেলবো—'

হাতের যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ করল সুধা। আর তখনই কড়া নড়ে উঠল দরজায়।

'তিনু ফিরেছে—।' সরে গিয়ে অভ্যস্ত গলায় বলল তৃপ্তিবালা, 'চেঁচাবি না। উঠে পড়।'

তারপর আঁচল গুছিয়ে দরজা খুলল।

'দেরি কেন ?'

'লরি পাওয়া যাবে না।' মুখ ব্যাজার করল তিনকড়ি, 'মাঝখান থেকে এক গাদা ঝামেলায় পড়তে হলো!'

তৃপ্তিবালা দেখল, তিনুর সার্টটা ফালা ফালা হয়ে গলার কাছে ঝুলছে, চুল এলোমেলো, কপালের ডানদিকে ছড়ে যাওয়ার মতো একটু দাগ। যেন কারুর সঙ্গে এইমাত্র মারামারি করে এলো।

ঝোলা ঠোঁটে বিরক্তি মিশিয়ে গোঁজ হয়ে রইল তিনকড়ি। তৃপ্তিবালার চোখে চোখ পড়ায় বলল, নন্দী শালা বদনাম করছিল। আমিও দু ঘা দিয়ে এসেছি। পুলিসের ভয় দেখালো।'

'কী হয়েছিল!'

মা ও মেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

'কী আর! যা বলে—'

তিনকড়ি অস্বস্তি বোধ করছিল। কথাটা বলা ঠিক হবে কি না ভাবল। পলকে দেখে নিল সুধাকে।

'দরদ দেখাচ্ছিল। বড়লোকের সঙ্গে মাখামাখি করে কী হবে! বোনটাকে নাকি বাজারে নামিয়েছি। সেই থেকে কথা কাটাকাটি।' একটু থেমে ঢোঁক গিলে বলল, 'বাড়াবাড়ি করতে নাকে মারলাম। ওরকম দু চারটে লাস নামাতে আমার হাত কাঁপে না। জামা টেনে ধরেছিল। বেরিয়ে দেখলাম ছিঁড়ে গেছে—'

বৃত্তান্ত শুনে হাঁক ছাড়ল তৃপ্তিবালা, কী না কী ভেবেছিল গোড়ায়। তিনুর আঘাত নিশ্চয়ই তেমন গুরুতর নয়। গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়ে বিনে পয়সার লরিটাই হাতছাড়া করল শুধু।

সুধা বোধহয় তৃপ্তিবালার মনের কথা আঁচ করতে পারল। বিব্রত তিনুর পাশে দাঁড়িয়ে উদাস গলায় বলল, 'ঠেলা গাড়িতেও তো যেতে পারে মা। কটা আর টাকা লাগবে! তিনু সঙ্গে যাক। আমরা না হয় পরে যাবো—'

পুরোহিতের হাত ঘড়ি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ট্রেনের শব্দ শুনে সর্বানন্দ মন্দিরের চাতালে এসে নিজের ছায়া দেখলেন। ছায়া ছোট হয়ে এসেছে, আকাশে সূর্যের রং সাদা, সর্বানন্দ ভাবলেন, তা হলে ট্রেনটা আজ ঠিক টাইমেই যাচ্ছে।

মন্দিরে ঘড়ি নেই, কিন্তু সর্বানন্দের নিজস্ব একটি হাতঘড়ি আছে। বছর দেড়েক আগে সুরেশ উকিলের বউ এই ঘড়িটা দিয়েছিল সর্বানন্দকে। বিলিতি ঘড়ি, তাতে দম দিতে হয় না। চামড়ার ব্যাণ্ডটা খুলে সর্বানন্দ একটা কাপড়ের ব্যাণ্ড লাগিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁর কব্জীতে বেশ মানানসই হয়েছিল।

দিন কাল পাল্টে গেছে। আগে বিলিতি ঘড়ি শুনলেই মনে হতো খুব দামী জিনিস। হঠাৎ একদিন সেটা বন্ধ হয়ে যাবার পর মুদিখানার মালিক কেষ্ট ঘোষ তাঁকে জানালো যে আসলে ওটা নাকি বেশ সস্তা দামের ঘড়ি। বিলেত কেন, কলকাতার ফুটপাথেও পঁচিশ-তিরিশ টাকায় পাওয়া যায়। ব্যাটারিতে চলে। আবার ব্যাটারি না ভরলে কিছুতেই আর চালাবার উপায় নেই। যেটাকে তিনি চামড়ার ব্যাণ্ড ভেবেছিলেন, সেটাও আসলে প্লাস্টিক, ঐ চামড়া-চামড়া নকল ভাব।

আগে শুধু দিন আর রাত্রি দিয়ে ছিল জীবনটা ভাগ করা, ঘড়িটা পাওয়ার পর সর্বানন্দের সময় দেখা খুব অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলেও বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বার করে দেখতেন, কটা বাজে। খুব মেঘলা কোনো সকালে তিনি ঘড়ি দেখেই বলে উঠতেন, ওরে বাপরে, সাড়ে আটটা বেজে গেল। ভূতাই, তুই এখনও চন্দন বাটা করলি নি? আসন সাজালি নি?

ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাবার পর সর্বানন্দের অস্বস্তি লাগে। কেষ্ট ঘোষ শহর বাজারে গেলে ব্যাটারি কিনে আনবে বলে কথা দিয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই ভুলে যায়।

সর্বানন্দ তাই টেন চলাচল দিয়ে সময় মাপবার চেষ্টা করেন।

এ গ্রামে রেল-স্টেশন নেই। লাইন গেছে অনেকটা দূরের খাল পাড় দিয়ে। এখান থেকে ট্রেনের কামরাগুলোকে মৌষের পালের মতন মনে হয়। চলন্ত ট্রেনের শব্দটাও এই দূরত্বের জন্য অনেকখানি কর্কশতা খসিয়ে বেশ সুরেলা হয়ে ওঠে। সর্বানন্দর শুনতে ভালো লাগে।

ট্রেনটা শেষ হবার পর সর্বানন্দ ডাকলেন, ভূতাই, ভূতাই, আমার চটি জোড়া এনে দে!

এই গরমে কেউ দুপুরবেলা মন্দিরের ধারে কাছে আসে না। সিমেন্ট বাঁধানো চাতালটা রুটি সেঁকা চাটুর মতন তেতে থাকে।

মায়ের গায়ে কয়েক টুকরো সোনার গয়না আছে। তাই বাইরে কোথাও যাবার সময় সর্বানন্দ মন্দিরের দরজায় তালা দিয়ে যান। কিন্তু কেষ্ট ঘোষের সৎ ভাই গজেন ঘোষের বউ সেই সকাল থেকে বসে আছে বিগ্রহের সামনে, মাথায় ঘোমটা টানা, টপ টপ করে পড়ছে চোখের জল, মুখে কোনো কথা নেই। বেশী বয়েস নয় গজেন ঘোষের, মাত্র চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে, হঠাৎ পক্ষাঘাতে তার ডান দিকটা পড়ে গেছে।

গজেন ঘোষের বউকে তো এখন উঠে যেতে বলা যায় না, তাই দরজা খোলাই রাখতে হবে। ভক্তের জন্যই মন্দির। বিপদে-আপদেই তো মানুষ ঠাকুর-দেবতার কাছে আসে।

ভূতাই এসে এক জোড়া রবারের চটি এনে রাখলো সর্বানন্দের পায়ের কাছে।

সর্বানন্দ বললেন, আমি না ফেরা পর্যন্ত কোথাও যাবি নি। তোকে বলিছিলুম না কাটারিটা দিয়ে এই অশথ গাছটা কাটতে, কোনো কাজে মন নেই ছোঁড়ার!

ভূতাইয়ের বয়েস তের-চোদ্দ বছর, একটা চারহাতি লাল গামছা সে ধুতির মতন করে পরে। ঠাকুরমশাইয়ের বকুনি গেয়েও সে চোখ পিটপিট করে আর মুচকি মুচকি হাসে।

বগলে একটা ছাতা নিয়ে সর্বানন্দ চটি ফটফটিয়ে বাগানটা পার হতে লাগলেন।

এককালে জমিদার ছিল মজুমদারেরা, তারাই প্রতিষ্ঠা করেছিল এই কালী মন্দিরের, সংলগ্ন কিছুটা জমি দেবোত্তর করা। যতদিন মজুমদারদের অবস্থার রমরমা ছিল, ততদিন এই মন্দিরেও জাঁকজমক ছিল যথেষ্ট। এখন মজুমদারদের

বসত বাড়িটাই ভেঙে পড়েছে, একালের বংশধররা পালিয়েছে কলকাতায়, একজন নাকি পুলিশে দারোগাগিরি করে।

দেবোত্তর সম্পত্তি বলেই টিঁকে আছে মন্দির সংলগ্ন বাগানটি। সর্বানন্দ নিজে গাছপালা ভালোবাসেন, তাঁর নিজের হাতের পরিচর্যায় এখানে ফোটে নানান বাহারী ফুল।

বড় স্থলপদ্মের গাছটির কাছে এসে সর্বানন্দ থমকে দাঁড়ালেন। যেন তিনি দেখতে পেলেন টুকটুকে লাল শাড়ী পরা এক কিশোরীকে। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, টানা টানা চোখ, গায়ের রং অতসী ফুলের মতন। দৃষ্টিতে গভীর বিস্ময়।

প্রথম যেদিন বিভাকে এই স্থলপদ্ম গাছটির পাশে দেখেছিলেন সর্বানন্দ, হঠাৎ যেন এক অলৌকিক শিহরণ বোধ করেছিলেন শরীরে। কখন যে মানুষের কী হয়, তা কেউ বলতে পারে না। এই মন্দিরে—বাগানে কাছাকাছি দু'পাঁচ খানা গ্রামের অনেক লোকজনই তো আসে। বিভার বয়সী মেয়েও কি আগে আসে নি? ঢের এসেছে! তবু বিভাকে দেখেই বা হঠাৎ অমন চমকে উঠেছিলেন কেন সর্বানন্দ? যেন প্রতিটি রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠেছিল। একটা জবা ফুলের গাছের পাশে কিশোরী মেয়ের সাজে মা কালীকে দেখেছিলেন না রামপ্রসাদ? ঠিক যেন সেই রকম অনুভূতি!

বিভাকে তিনি আগে দেখেননি, সে এ গ্রামের মেয়ে নয়।

তাই ওরকম নিষ্পাপ, সুন্দর মুখখানি দেখে সর্বানন্দের কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, এ বুঝি দৈব আবির্ভাব।

সে পাঁচ বছর আগেকার কথা, সেবারই এ গ্রামের জুনিয়ার হাই স্কুলটা হায়ার সেকেণ্ডারি হলো আর বর্ধমান থেকে এলো একজন নতুন হেডমাস্টার। তারই মেয়ে ঐ বিভা।

ঐ কিশোরীটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সর্বানন্দ, সেই মুগ্ধতার জন্য তিনি কষ্টও পেতে পারতেন। আজকাল ঐ বয়েসী মেয়েদের ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি থাকে না, এক ভাঙা মন্দিরের প্রৌঢ় পুরুষকে বিভা যদি হেলাফেলার চোখে দেখতো, সেটাও কিছু অস্বাভাবিক হতো না। কিন্তু মা-ই যেন বিভাকে এনে দিয়েছিলেন সর্বানন্দের কাছে। বিভা মেয়েটির স্বভাব অতি নরম ও মধুর, একালের ঠ্যাটা মেয়েদের মতন সে মুখে মুখে তর্কও করে না, ভালো কথা শুনলে বোকার মতন হেসেও ওঠে না।

ঠাকুর দেবতাদের সম্পর্কে বিভার বেশী-বেশী ভক্তিও নেই, আবার অভক্তিও নেই। সে ভালবাসে ফুল। এই বাগানের টানেই সে এখানে প্রায়ই আসে, এই ফুলের সম্পর্কেই সর্বানন্দের সঙ্গে তার ভাব।

দেখতে দেখতে কেটে গেল পাঁচ বছর।

স্থলপদ্ম গাছের সামনে দাঁড়িয়ে সর্বানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বিভা আর সেই কিশোরী মেয়েটি নেই। সে যথেষ্ট ডাগর হয়েছে। এবার সে হারিয়ে যাবে। আজ সকাল থেকেই এই কথাটা বারবার মনে পড়ছে, বিভা আর বেশিদিন এখানে থাকবে না।

বাগান থেকে বেরিয়ে সর্বানন্দ পা চালাতে লাগলেন জোরে জোরে। লম্বা ছিপছিপে শরীরটি একেবারে সোজা, মুখের চামড়াতেও বয়েসের ছাপ পড়ে নি। মাথার চুল কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে।

রাস্তাটা এত খারাপ যে গোরুর গাড়িও চলতে পারে না। মজুমদারদের আমলে এই রাস্তা দিয়ে মটোর গাড়ি আসতো। সর্বানন্দর স্পষ্ট মনে আছে, ও বাড়ির মেজোবাবু গাড়ি কেনার পর সেই গাড়ি চেপে মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। গত পনেরো-কুড়ি বছরে এই রাস্তা আর কেউ মেরামত করে নি। কেষ্ট ঘোষ বলে, রাস্তাটা যদি ভালো হতো, বুঝলেন ঠাকুরমশাই, এ মন্দিরে আরও দূর দূর থেকে অনেক ভক্ত আসতো। আমাদের মা তো একেবারে জাগ্রত!

শোনা যাচ্ছে, হলদিয়ার দিকে একটি পাকা রাস্তা এগুচ্ছে, সেটা এ গ্রামের খাল ধার দিয়ে যাবে। বাস চলার মতন রাস্তা। সে রকম একটা রাস্তা হলে এ গ্রামের গুরুত্ব বেড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরেরও। বাইরের লোক, বাসযাত্রীরা এই মন্দিরের নাম জানবে। সর্বানন্দ জপে বসে প্রায়ই সেই রাস্তাটা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাওয়ার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা জানায়।

হেডমাস্টার মশাইয়ের বাড়ি মন্দির থেকে মাত্র মিনিট সাতেকের হাঁটা পথ। বাড়ির এক পাশে একটি ছোট পাকা পুকুর, তাতে লাল শালুক ফুটেছে।

এ বাড়ির সামনেও একটি কঞ্চির বেড়া দেওয়া ছোটখাটো বাগান। এ বাগানেও সর্বানন্দের হাত আছে। মন্দিরের বাগান থেকে তিনি নানা রকম চারা এনে দিয়েছেন বিভাকে, গাছের যত্ন করতে শিখিয়েছেন। গাছে সুন্দর ফুল দেখলে অনেকেই বলে, বাঃ! কিন্তু ক'জন আর ফুল ফোটাতে জানে!

এই দুপুর রোদেও বিভা বাগানে হাঁটু গেড়ে বসে আগাছা নিড়োচ্ছে।

সেই প্রথমদিন স্থলপদ্ম গাছটির পাশে বিভাকে দেখে সর্বানন্দের যে অলৌকিক অনুভূতি হয়েছিল, আজও সেটা যায় নি। তিনি মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে রইলেন। এ মেয়ে আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতন নয়, এর মধ্যে একটা বিশেষ কিছু আছে। একটা মাধুর্যের চুম্বক।

ঘামে ভিজে গেছে বিভার মুখ, একটা গোলাপি রঙের শাড়ী পরা, আঁচলটা লুটোচ্ছে মাটিতে, সেদিকে তার খেয়ালই নেই। সে যখন চলে যাবে, তখন কে দেখবে এই বাগান? বিভার মা-বাবার এ দিকে ঝোঁক নেই। গত বছর হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে বসে আছে বিভা, শহরের হস্টেলে রেখে তাকে কলেজে পড়াবার সামর্থ নেই রবীন মাস্টারের, তাই তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

সর্বানন্দ ডাকলেন, বিভা মা!

বিভা চমকে মুখ ফেরালো।

সর্বানন্দ ছাতাটা মুড়ে নামিয়ে রেখে বললেন, একটা কাঁচি আনো তো মা, গোলাপের কয়েকটা ডাল ছেঁটে দিই। শুকনো শুকনো হয়ে গেছে, ছেঁটে দিলে তেজী হবে!

বিভা দৌড়ে ভেতরে চলে গেল কাঁচি আনতে। সর্বানন্দ বাগানের মধ্যে এসে বিভা যে-জায়গাটায় বসে ছিল, সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। খানিকটা আগে জল দেওয়া হয়েছে, মাটি ভিজে ভিজে, তাতে পড়েছে বিভার পায়ের ছাপ। ঠিক যেন মা লক্ষ্মীর পায়ের মতন।

বিভার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন তার মা। তিনি বললেন, ও ঠাকুরমশাই, এখন বাগানে বসবেন না। বাগানে বসলে তো আপনাদের হুঁস থাকে না। রান্না করে বসে আছি সেই কখন থেকে, আগে সেরে নিন।

সর্বানন্দ বললেন, আসছি, আসছি।

প্রত্যেক রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে এ বাড়িতে সর্বানন্দর বাঁধা নেমন্তন্ন। তাঁর জন্য যে আলাদা বিশেষ কিছু বন্দোবস্ত হয় তা নয়, এ বাড়িতে সাধারণ যা রান্না হয় তিনিও তাই খান। প্রথম প্রথম বিভাই তাঁকে ডেকে নিয়ে আসতো।

শাড়ীর পাড় দিয়ে বোনা দু'খানা আসন পাতা হয়েছে বারান্দায়। কিছুদিন আগেও বেশ মোটা সোটা ভারিক্কী চেহারা ছিল রবীন মাস্টারের, হঠাৎ ডায়াবিটিস ধরা পড়ার পর শরীরটা চুপসে যেতে শুরু করেছে। আগে থালা ভর্তি করে ভাত

খেতেন, এখন ডাক্তারের নির্দেশে দু'হাতার বেশী ভাত দেওয়া হয় না তাঁকে, সেটুকু ভাত শেষ হয়ে যাবার পর তিনি লোভীর মতন থালা চাটতে থাকেন।

রবীন মাস্টার বললেন, ঠাকুরমশাই, আজ বিকেলে খড়গপুরের সেই পাত্রপক্ষ দেখতে আসছে বিভাকে। এই সম্বন্ধটা যদি লেগে যায়, বড় ভালো হয়।

সর্বানন্দ বললেন, ওরা পাত্রের কুষ্ঠী পাঠিয়েছে ?

রবীন মাস্টার বললেন, না, আমার এক শালা তো এনেছে এই সম্বন্ধটা, তাকে বলেছিলুম, তা সে বললে যে পাত্রের কুষ্ঠী নেই।

সর্বানন্দ বললেন, জন্ম ছকটা পেলেও মিলিয়ে নেওয়া যেত।

—ওরা এলে জিজ্ঞেস করবো এখন। পাত্রটি বড় ভালো। এখন আমার মেয়ের যদি ভাগ্যে থাকে।

—ছেলে কী করে ?

—ওদের লেখাপড়া জানা বংশ, বুঝলেন! ছেলের কাকা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসার। ছেলেও হিস্ট্রিতে এম. এ. পাশ করে এখন হিজলি হাই স্কুলে ঢুকেছে। পরে কোনো কলেজেও চান্স পেতে পারে। রেজাল্ট ভালো। সবচেয়ে বড় কথা কী জানেন। কোনো দাবি-দাওয়া নেই। পণ তো চায়ই না, সোনাদানার ব্যাপারেও বলেছে, আপনাদের যা ইচ্ছে হয় দেবেন, না দিলেও আপত্তি নেই। ভাবুন তো, আজকালকার বাজারে বিনা পণে এম. এ. পাশ জামাই পাওয়া কি ভাগ্যে না থাকলে হয়। ওদের একটাই কথা, পাত্রের মেয়ে পছন্দ হওয়া চাই!

—বিভা মা-কে যে দেখবে তারই পছন্দ হবে। এমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে।

—দেখুন যদি আপনাদের আশীর্বাদে লেগে যায়। আমার বরাবরের ইচ্ছে শিক্ষিত পরিবারে মেয়ে দেওয়া।

বিভার মা বললেন, খড়গপুর শহরে ওদের নিজস্ব বাড়ি আছে। অবস্থা ভালো।

সর্বানন্দ চোখ তুলে দেখলেন, বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে বিভা। মুখখানা লজ্জারুণ। সে যেন মনে মনে পাত্রকে পছন্দ করে ফেলেছে এর মধ্যেই। আজ সকাল থেকেই সর্বানন্দের মনে হচ্ছিল, বিভা চলে যাবে।

রবীন মাস্টারের ইচ্ছে, পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় সর্বানন্দও

উপস্থিত থাকুন। কিন্তু সর্বানন্দ রইলেন না। ফিরে গেলেন মন্দিরে। তাঁকে সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা করতে হবে।

যাবার সময় তিনি বিভাকে বললেন, বিভা মা, লোকজন সব চলে গেলে একবার মন্দিরে এসো। আসবে ? হারুকে সঙ্গে নিয়ে এসো।

বিভা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

সর্বানন্দ মন্দিরে ফিরে এসে দেখলেন, গজেন ঘোষের বউ ঠায় বসে আছে সেই একই জায়গায়। তার দুই ছেলেমেয়ে তাকে ডাকতে এসেছে, তবু সে যাবে না।

সর্বানন্দ তাকে বললেন, বাড়ি যাও মা, মুখে কিছু দাও। আমি তোমার হয়ে মায়ের কাছে আর্জি জানাবো। ভালো হয়ে যাবে, চিন্তা করো না।

মুখে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু সর্বানন্দের কণ্ঠস্বরে বিশ্বাসের জোর নেই। গজেন ঘোষকে তিনি দেখে এসেছেন, তার ও রোগ সারার নয়। মাকে ডাকলেই যদি দুনিয়ার সকলের রোগ ভোগ সেরে যেত, তা হলে তো পৃথিবীতে এতদিনে আর পা ফেলারও জায়গা থাকতো না। মানুষের আয়ুর নিয়ন্তা হচ্ছে মহাকাল। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিনাশও চলতে থাকে সমান তালে।

ছেলেমেয়ে দুটি প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে গেল তাদের মাকে।

সর্বানন্দ ডাকলেন, ভূতাই! ভূতাই!

তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। যখন তখন সে বাজারের দিকে চলে যায়। সে মানুষজন দেখতে ভালোবাসে। অবশ্য মন্দিরের ভেতরটা সে মুছে টুছে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে।

এই মন্দিরের কালী মূর্তিটি বেশ বড়। প্রায় প্রমাণ সাইজের, পাথরের তৈরি। জমিদাররা নাকি জয়পুর থেকে আনিয়েছিলেন এই মূর্তি। জিভের ডগায় খানিকটা খাঁটি সোনার পাত, চক্ষু দুটি রুপোর। পদতলে শয়ান মহাদেবের মাথার সাপ ও ডান হাতটি ভাঙা। সে আর সারানো যায় নি। মন্দিরটারই ভেঙে গড়ার মতন অবস্থা। বছরে দু'বার বড় পুজো হয়, তখন কিছু লোকজন আসে, অন্য সময় প্রায় কিছুই রোজগার নেই।

প্রায় সন্ধে হবো-হবো সময়ে সর্বানন্দ দেখলেন বাগানে ঘুরছে দুটি অচেনা যুবক। তাদের সঙ্গে বিভার ছোট ভাই হারু।

বিভা আসে নি। হারু পাত্রপক্ষের লোকজনদের মন্দির দেখাতে এসেছে। এ গ্রামে আর কিছুই তো দেখার নেই।

সর্বানন্দ এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে। যুবক দুটির মধ্যে একজন স্বয়ং পাত্র, তার নাম মলয়কুমার মণ্ডল। হারু বললো, ঠাকুরমশাই, ইনি মলয়দা।

প্যান্ট ও শার্ট পরা বেশ সুশ্রী চেহারার যুবকটি। বিভার সঙ্গে মানাবে ভালো।

স্থলপদ্ম গাছটি থেকে সে একটি ফুল ছিঁড়েছে। পুজোর প্রয়োজনে ছাড়া এ বাগানের ফুল ছিঁড়তে দেন না কাউকে সর্বানন্দ, তিনি একটু দুঃখিত হলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। শহরের ছেলে, ওরা অত ফুলের মর্ম বোঝে না।

তিনি বললেন, এসো বাবা, এসো, মাকে দর্শন করবে এসো।

মন্দিরের চাতালের কাছে এসে মলয়কুমার জিজ্ঞেস করলেন, এই মন্দিরটা কতদিনের?

প্রাচীনত্বের একটা গৌরব থাকে, তা সর্বানন্দ জানেন। সেইজন্যই তিনি খানিকটা বাড়িয়ে বলিলেন, তা প্রায় আড়াই শো বছর হবে। আমার বাবার কাছে শুনেছি, বর্গীরা এসে এই মন্দিরে পুজো দিত।

মলয়কুমার তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললে, ইটগুলো দেখেছিস? মোটা মোটা। আগেকার ইট অনেক সরু হতো। এ মন্দিরের বয়েস ষাট-সত্তর বছরের বেশী হবে না। তাছাড়া বর্গীদের রুট এটা ছিল না।

সর্বানন্দের মুখের ওপর তাঁকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করে মলয়কুমার একটু হাসলো। তারপর সে আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি কারুর কাছ থেকে মাইনে পান, না প্রণামীর টাকাতেই সব কিছু চলে।

সর্বানন্দ বললেন, না, মাইনে আর কে দেবে। জমিদাররা তো আর নেই। ভক্তরা আসে, তারা যা দেয়, তাতেই কোনোক্রমে চলে।

মলয়কুমার আবার তার বন্ধুকে বললো, জমিদারতন্ত্র চলে গিয়ে এই সব ঠাকুর দেবতাদের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। অবশ্য ব্যবসায়ীরাও অনেক জায়গায় মন্দির টন্দির নিয়ে ফলাও ব্যবসা চালাচ্ছে। তুই দিল্লিতে বিড়লাদের মন্দির দেখেছিস?

সর্বানন্দের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বললো, এই গ্রামের লোক ছাড়া বাইরের লোকজনও আসে এই মন্দিরে? মাসে অ্যাভারেজ কতজন হবে।

সর্বানন্দ বললেন, রাস্তাটা যে অতি খারাপ। লোকজন আসতে পারে না।

হলদিয়ার দিক থেকে একটা নতুন রাস্তা হবে বলে শোনা যাচ্ছে অনেকদিন, সেটা হলে অনেকে আসবে।

মলয়কুমার বললো, আপনার মাকে ভালো করে ডাকুন, তিনি যদি রাস্তাটা তৈরি করে দেন তাড়াতাড়ি।

মন্দিরের দরজাটা ভালো করে খুলে দিয়ে সর্বানন্দ বললেন, এসো বাবা, ভেতরে এসো তোমরা।

মলয়কুমারের পায়ে ফিতে বাঁধা শূ। সে একটু ইতস্তত করে বললো, ভেতরে যেতে গেলে তো জুতো খুলতে হবে। থাক, এই তো বাইরে থেকেই দেখছি।

চাতালের নীচে, মূর্তির সোজাসুজি দাঁড়িয়ে সে ঠাট্টার সুরে বন্ধুকে বললো, জমিদার-টমিদারদের টেস্ট কত ক্রুড ছিল দেখাচ্ছিস। পাথরের মূর্তিতে সোনার জিভ লাগিয়েছে। কী হরিব্‌ল দেখাচ্ছে না! কালী ঠাকুরের জিভ তো লাল হবার কথা।

বন্ধুটির পায়ে চটি। সে খালি পায়ে ভেতরে ঢুকে একটুক্ষণ দেখেই ফিরে এসে বললে, জিভটা সোনার নয় রে। পেতল টেতল হবে মনে হচ্ছে। অনেক সময় এই সব ঠাকুর-দেবতাদের দু'সেট গয়না থাকে। এক সেট হয়তো অরিজিনাল সোনার-টোনার, আর এক সেট সিন্থির। পুরুতরা চুরি যাবার ভয়ে আসল গয়নাগুলো সরিয়ে রাখে। উৎসব-টুৎসবের দিনে পরিয়ে দেয়।

সর্বানন্দ বললেন, এটা পেতলের নয়। সোনারই।

মলয়কুমার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এই মন্দির থেকে কখনো গয়না-টয়না চুরি যায় নি?

সর্বানন্দ স্বীকার করলেন যে তাঁর আমলেই একবার চুরি হয়েছে বটে। তাঁর আগের আমলে আরও দু'বার।

মলয়কুমার হেসে বললেন, আপনার মা কালীর অভিশাপে সেই চোর মুখে রক্ত উঠে মরে নি?

তারপর হঠাৎই সে বললেন, আচ্ছা চলি নমস্কার! চলো, হারু।

সর্বানন্দ বিবর্ণ মুখে সেই অপস্রিয়মান তিন মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মলয়কুমারের প্রত্যেকটি কথার মধ্যে ঝরে পড়ছিল অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ! যেন সে ঠাস ঠাস করে চড় মেরে গেল সর্বানন্দর গালে।

সে এসেই বাগানের ফুল ছিঁড়েছে, জুতো খুলতে হবে বলে মন্দিরে ঢোকে নি, একবার প্রণামও করলো না। এই ছেলে নিয়ে চলে যাবে বিভাকে?

পরদিনই সর্বানন্দ শুনলেন, পাত্রপক্ষ পাকা কথা দিয়ে গেছে। বিভাকে খুব পছন্দ হয়েছে তাদের। আগামী মাসেই ভালো দিন আছে।

পাত্রের বাবার কাছ থেকে রবীন মাস্টার মলয়কুমারে জন্মক্ষণ ও তারিখ এবং রাশি-গণ জেনে রেখেছেন, তা দিয়ে একটি ছক বানালেন সর্বানন্দ। ভালো করে বিচার করে দেখলেন। এই পাত্রের সঙ্গে বিভার বিবাহ যোগ নেই। জোর করে এ বিয়ে দিলেও তা মঙ্গলের হবে না। পাত্র ও পাত্রী দু'জনেরই সিংহ রাশি। এ রকম বিবাহে কন্যার নিশ্চিত বৈধব্যযোগ থাকে।

রবীন মাস্টার সে সব শুনে বললেন, ঠাকুরমশাই, ওসব আর আজকাল কেউ মানে না। ছেলেটি ভালো, কোনো দাবি দাওয়া নেই। এরকম পাত্র আমি আর পাবো কোথায়? আমার যে রোগ হয়েছে, তাতে আর কদিন বাঁচবো তার ঠিক নেই, তার আগে যদি মেয়েটার বিয়ে দিয়ে যেতে পারি···

সর্বানন্দ বারবার বিভা ও মলয়কুমারের ছক মিলিয়ে দেখলেন, গণনায় কোনো ভুল নেই। এ বিয়ে হতে পারে না। রবীন মাস্টার কিন্তু সে কথা কিছুতেই বুঝতে চান না।

সর্বানন্দ আরও খবর পেলেন যে মলয়কুমার কমুনিস্ট, সে পার্টি করে। অর্থাৎ সে ঘোর নাস্তিক। বিয়ের পর সে কি তা হলে আর কখনো বিভাকে এই মন্দিরে আসতে দেবে?

না, না, সর্বানন্দ সে জন্য চিন্তিত নন। বিয়ের পর বিভা প্রবাসে চলে গেলে হয়তো আর কখনো মন্দিরে আসবে না, তা না আসুক, কিন্তু সে সুখে থাকুক, তার জীবন আনন্দময় হোক, তাই তো চান সর্বানন্দ কিন্তু এ বিবাহ যে মঙ্গলজনক হতে পারে না! বিভা দুঃখ পেলে তা তিনি কী করে সইবেন?

কিন্তু এ বিবাহ তিনি বন্ধ করবেনই বা কী করে!

সেই সন্ধেবেলার পর থেকে বিভা আর মন্দির কিংবা বাগান দেখতে আসে নি। বিয়ের কথা ঠিকঠাক হয়ে গেলে মেয়েরা যেন অতিরিক্ত লাজুক হয়ে যায়। তারা আর বাড়ি থেকে বেরোয় না। সর্বানন্দ ও-বাড়িতে গেলেও বিভার সঙ্গে কথা হয় না।

একদিন তিনি বললেন, কামিনী গাছটা লাগিয়েছিলুম, এবারে তাতে ফুল এসেছে। একবার দেখতে আসবে না, বিভা মা?

বিভা দুটি উজ্জ্বল চোখ মেলে সরল বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, কামিনী ফুল ফুটেছে? হ্যাঁ, দেখতে যাবো। কালই দুপুরে যাবো।

কিন্তু তবু বিভা এলো না। তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে মাসি-পিসির দল। তারা এখন বিভাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দিতে চায় না।

সর্বানন্দ বিয়েতে পুরুতগিরি করেন না। বিভার বিয়ের জন্য অন্য গ্রামের পুরুত ঠিক করা হয়েছে। সেই পুরুতকে সর্বানন্দ দুটি ছক দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বলুন তো, এই বিবাহ কি শুভ হতে পারে?

অন্য গ্রামের পুরোহিতটি সর্বানন্দের চেয়েও বয়েসে প্রবীণ। তিনি ছক না দেখেই বললেন, পাত্রপক্ষ পণ নেবে না শুনেছি। এই ঘোর কলিতে তার চেয়ে শুভ আর কী হতে পারে? তারপর ওদের ভাগ্যে যা আছে তা হবে।

বিভার বিয়ের দিনে দুপুরবেলার ঘুমে সর্বানন্দ এক দুঃস্বপ্ন দেখলেন।

স্থলপদ্ম গাছটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিভা। তার পরনে বৈধব্যের বেশ। কোলে একটি শিশু। সেই শিশুটি গাছের ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

ধড়মড় করে জেগে উঠলেন সর্বানন্দ। তাঁর শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

যেমন করেই হোক এই বিয়ে বন্ধ করতে হবে। সেদিন বিভার ভাবী স্বামীর ব্যবহারে মা নিশ্চয় রুষ্ট হয়েছেন। তিনিই বিভাকে বাঁচাতে পারেন এখনো।

এই ক'দিনে সর্বানন্দ অনেকবার বিভার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। আজ মাকে ভালো করে ডেকে বলতে হবে, মা, তুমি এই বিয়ে বন্ধ করে দাও। বিভা রূপসী, গুণবতী মেয়ে, তার জন্য আরও ঢের ভালো পাত্র পাওয়া যাবে এই দেশে।

কত দুপুর বিভা কাটিয়ে গেছে এই বাগানে। মন্দিরে প্রদীপ জ্বালার সলতে বিভাই পাকিয়ে দিয়েছে বরাবর। সর্বানন্দ যেদিকে তাকাচ্ছেন, সেদিকেই যেন দেখতে পাচ্ছেন বিভার মায়া ছবি। পাঁচটি বছর সে সর্বানন্দর জীবন মাধুর্যে পূর্ণ করে দিয়েছে, তিনি তার কোনো প্রতিদান দিতে পারবেন না?

অনেকদিন পর সর্বানন্দ একটা দেশী মদের বোতল খুলে কোষায় ঢাললেন খানিকটা। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি বসলেন বিগ্রহের সামনে।

গঙ্গোদকে শুদ্ধ করে সেই কারণ বারি পান করার পর তিনি দৃঢ় স্বরে বললেন, আজ তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করবেন।

ফুল-বিল্বপত্র নিবেদন করে তিনি উচ্চারণ করতে লাগলেন স্তোত্র :

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগদেবী ত্বং দেবী কমলালয়া
সর্বশক্তি স্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ ॥
ত্বমেব সূক্ষ্ম স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিনী
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি ॥
উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধস্তনুঃ ॥

তারপর তিনি গলদশ্রু নয়নে বলতে লাগলেন, মা, মা, তুমি সব পারো, তুমি বিভার জীবন থেকে অমঙ্গল দূরে সরিয়ে দাও। বিভার হাতের গাঁথা জবা ফুলের মালা তুমি তোমার গলায় পরেছো, সে চন্দন বেটে দিয়েছে, নৈবেদ্যর ফল কুটে দিয়েছে, সেই বিভা যেন দুঃখ না পায়, তুমি দ্যাখো মা। তুমি ওর বিবাহ বন্ধ করে দাও! নাস্তিকের সঙ্গে বিভার বিয়ে হবে, তুমি সহ্য করবে কেন মা? তোমার সোনার জিভ বলে ছেলেটি সেদিন বিদ্রূপ করেছিল, তুমি শোনো নি? ওরা খড়গপুর থেকে আসবে, তুমি আজ ট্রেণ চলাচল বন্ধ করে দাও মা! বিভা লগ্নভ্রষ্টা হোক, তবু তা অকাল বৈধব্যের চেয়ে ভালো। তার অন্য জায়গায় আবার বিয়ে হবে, আমি নিজে তার পাত্র খুঁজবো, কিংবা যদি বিয়ে নাও হয়, যদি সে সারাজীবন কুমারী থাকে···এই বাগানে সে নিত্য আসবে, তোমার সেবা করবে, তার সরল সুন্দর হাসিতে ঝঙ্কৃত হবে এই ভাঙা মন্দির···

সর্বানন্দ হঠাৎ শুনতে পেলেন ট্রেণের তীক্ষ্ণ হুইশল!

পাঁচটা পঁয়তিরিশের ট্রেণ ঠিক সময়ে এসে গেল? অন্যদিন ট্রেণের শব্দ শুধু শোনা যায় হুইশল দেয় না, আজ যেন সার্বনন্দের প্রার্থনার উত্তরে বিদ্রূপের হাসির মতন বেজে উঠলো ঐ হুইশল।

পাশের গ্রামে স্টেশন আছে। সেখানে নামবে বর ও বরযাত্রীরা। তারপর পাল্কিতে নিয়ে আসা হবে তাদের। সর্বানন্দ এসব কালই শুনেছেন। তিনি

বিস্ফারিত চোখে কালী মূর্তির দিকে চেয়ে রইলেন। ট্রেন ঠিক সময়ে এলো? এখনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে! পাশের গ্রামের স্টেশনে পৌঁছোবার আগেই···

বাকি কারণবারিটুকু পান করে সর্বানন্দ ভাবলেন, হলদিয়ার রাস্তাটা আজও তৈরি হলো না! যারা রাস্তা বানায়, মা কি তাদের স্বপ্নে ভয় দেখাতে পারতেন না? মলয়কুমার মণ্ডল নামে দুর্বিনীত ছেলেটি সেদিন সেই ইঙ্গিতই করে গেল। তবু মা কোনো ব্যবস্থা নিলেন না? এখনো যদি রবীন মাস্টারের মেয়ের বিয়ে বন্ধ করা যায়। সর্বানন্দ সবাইকে জানিয়ে দেবেন যে সাতকোনা গ্রামের জাগ্রত কালীর আদেশেই এই বিয়ে সাব্যস্ত হয়নি।

পাশের গ্রামের স্টেশনে যদি ট্রেণ থামে তা হলে বরযাত্রীদের পার্টি এই মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়েই কন্যাপক্ষের বাড়িতে যাবে। সর্বানন্দ ধ্যানে বসলেন। আটকাতেই হবে ওদের। তিনি নিজে বিয়ে করেন নি, সংসার করেন নি, এই মন্দিরে পড়ে আছেন এতগুলো বছর, তিনি না থাকলে এই ভাঙা মন্দিরের পুজোই বন্ধ হয়ে যেত! নিজের জন্য তিনি কিছু চান নি, সবই এই মন্দিরের জন্য। তাঁর সেই পূজাকর্মের কি এতটুকু জোর নেই?

একসময় তাঁর ঘোর ভাঙলো। সানাইয়ের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বরযাত্রীর পার্টি পৌঁছে গেল নাকি বিয়ে বাড়িতে? বাইরের রাস্তায় কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো না?

সর্বানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বাগান খোঁড়া শাবলটা তুলে নিয়ে গেলেন। তবে আজই সব শেষ হয়ে যাক। হারামজাদী, তুই শুধু পাথর? তোর কোন শক্তি নেই? একটা রাস্তা বানাতে পারিস না? চোরেরা তোর গয়না নিয়ে গেলে তাদের শাস্তি দেবার ক্ষমতাও তোর নেই? চাতালে দাঁড়িয়ে তোকে যারা অপমান করে যায়···

শাবলটা তুলে মারতে গিয়েও থেমে গেলেন সর্বানন্দ। হঠাৎ তিনি দেখলেন কালীমূর্তির চোখ দুটি যেন বেশী চকচক করছে, সোনালি জিভ বার করা ঠোঁটে এমন একটা হাসি, যা তিনি অন্য কোনোদিন দেখেননি। বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, কৌতুক করছে তাঁর সঙ্গে।

শাবলটা ফেলে দিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন সর্বানন্দ। এবার তিনি বুঝতে পেরেছেন। ঈর্ষা! বিভাকে ঈর্ষা করেছিলেন এই কালীমূর্তি। সর্বানন্দ গত পাঁচ

বছর ধরে কালীমূর্তির বদলে বিভার কথাই বেশী চিন্তা করতেন বলে বিভাকে সরিয়ে দিলেন মা কালী। পাথরের মূর্তি হলেও নারী তো!

সর্বানন্দ বললেন, ঠিক আছে, আজ থেকে আর তোকে মা বলবো না। বিভা বলে ডাকবো।

তিনি সেই পাথরের মূর্তির একটি স্তনে হাত রাখলেন। যেন অবিকল রক্ত-মাংসের মূর্তি, যেন সত্যিই বিভা।

বাইরে থেকে কে যেন ডাকলো, ঠাকুরমশাই, ঠাকুরমশাই!

সর্বানন্দ যেন সহসা সম্বিৎ ফিরে পেলেন। এসব তিনি কী করছেন, তিনি কি পাগল হয়ে গেলেন নাকি? বিভাদের বাড়ি থেকে নিশ্চয় তাঁকে কেউ ডাকতে এসেছে। বিভার বিয়ের সময় তিনি উপস্থিত থাকবেন না, তা কখনো হয়?

দরজা খুলতেই তিনি দেখলেন চাতালে দাঁড়িয়ে আছে কেষ্ট ঘোষ, তার দু' হাতে অনেকগুলো থলি। সন্ধের ট্রেনে সে-ও শহর থেকে ফিরেছে।

কেষ্ট ঘোষ বললো, ঠাকুরমশাই, আপনার হাত ঘড়িটা দ্যান তো। ব্যাটারি এনেছি। বারবার ভুলে যাই, আজ ঠিক মনে করে···

কতটুকু সামান্য একটা জিনিস। সেটা ভরে দিতেই ঘড়িটা আবার চলতে লাগলো। কেষ্ট ঘোষ কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের ঘড়িটার সঙ্গে এই ঘড়িটার সময় মিলিয়ে দিয়ে বললো, নিন, এবার দেখুন।

সর্বানন্দ ঘড়িটা কানের কাছে এনে নির্ভুল টিক টিক টিক টিক শব্দ শুনতে পেলেন। এই তো মহাকালের ধ্বনি। শুধু দিন আর রাত্রি, চন্দ্র-সূর্যের হিসেবের সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই। ঘড়িটা হাতে বেঁধে তিনি হুংকার দিয়ে ডাকলেন, ভূতাই, ভূতাই!

BIVAV

Price Rs. 10·00 | Special 38th Autumn Issue | Reg. No.
Vol. 10. No. 4 | July-Sept 87 | RN 30017/76
International Standard Serial Number ISSN 0970-1885

The west Bengal Small Industries Corporation Ltd.

(A Govt. of West Bengal Undertaking)
6A, RAJA SUBODH MULLICK SQUARE (3RD FLOOR)
CALCUTTA-13

"WBSIC Serves the Small Industries
Small Industries Serves the Nation."

West Bengal Small Industries Corporation is engaged in the promotion and development of industries in the Small Scale Sector by : (i) procuring and distributing scarce raw materials to the S.S.I. Units (ii) Providing infrastructural facilities (iii) Rendering marketing assistance to S.S.I. Units (iv) Providing financial assistance to sick Small Scale Industrial Units under the line of credit scheme of I.R.B.I. (v) Setting up industrial projects in the public sector as well as in the joint sector.

Thus the Corporation plays vital role in the industrial development, economic growth and employment generation in the State.

For details please contact P.R.O. Phone No. 27-0303